পঞ্চতন্ত্র

(প্রথম পর্ব)

উৎসর্গ

শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার

মহাশয়ার করকমলে—

লেখকের নিবেদন

এই পুস্তিকার অধিকাংশ লেখা রবিবারের 'বসুমতী' ও সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় বেরোয়। অনুজপ্রতিম শ্রীমান কানাই সরকার ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোজ বসু কেন যে এগুলো পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার জন্য আমাকে বাধ্য করলেন সে কথা সহৃদয় পাঠকেরা বিবেচনা করে দেখবেন।

মুজতবা আলী

বই কেনা

মাছি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যে-দিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময়ে উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, দু'টো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো আছে বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, 'হায়, আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো, তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।'

কথাটা যে খাঁটি, সে-কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায়। এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপসোস ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাৎ। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞানবিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক-একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।'

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব-উপন্যাসের এক-চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

চোখ বাড়াবার পন্থাটা কি? প্রথমতঃ—বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোর আরো একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, 'সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশী ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশী হয়।'

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল—আরো কত কি।

কিন্তু প্রশ্ন, এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মত সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবেই হয়ত ওমর খৈয়াম বলেছিলেন,—

Here with a loaf of bread
beneath the bough
A flask of wine, a book of
verse and thou,
Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise enow.

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশ্‌তের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহম্মদ সাহেব শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে 'আল্লামা বিল কলমি' অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই—বই par excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক—The Book.

যে-দেবকে সর্ব মঙ্গলকর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনিই তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে, তবে তারা দেবভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালী নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না। তার মুখে ঐ এক কথা 'অত কাঁচা পয়হা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব ?'

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য—কনিষ্ঠাপরিমাণ—লুকনো রয়েছে। সেইটুকু এই যে, বই কিনতে পয়সা লাগে—ব্যস্‌। এর বেশী আর কিছু নয়।

বইয়ের দাম যদি আরো কমানো যায়, তবে আরো অনেক বেশী বই বিক্রী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যদি প্রকাশককে বলা হয়, 'বইয়ের দাম কমাও', তবে সে বলে 'বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কি করে ?'

'কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাঙলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফরাসী ভাষা। এ-ভাষায় বাঙলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচ সিকে দিয়ে যে-কোন ভাল বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন ?'

'আজ্ঞে, ফরাসী প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোন ভালো বই এক ঝট্‌কায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দু'হাজার ছাপাতে গেলেই বেশী ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি ?'

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে ? প্রকাশক না ক্রেতা ? প্রকাশকের

পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। এক্সপেরিমেণ্ট করতে নারাজ—দেউলে হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয় নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মত অনেকগুলি চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত এক গাদা নূতন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে-চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে, এবং সর্বশেষে সে কেনে ক্ষ্যাপার মত, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে। এই একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা যার দরুন সকালবেলা চোখের সামনে সারে সার গোলাপী হাতী দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কি করি? আমি একাধারে producer এবং consumer—তামাকের মিকশ্চার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই consumer : আরও বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি একখানা বই produce করেছি—কেউ কেনে না বলে আমিই consumer; অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।

* * *

মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত—পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটাকয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন?'

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু ক'রে ঘাড় চুলকে বললেন, 'ভাই, বলছো ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে; আর কিছু বই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না দিয়ে। যে-মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না সেই লোকই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক-বিবর্জিত তার কারণটা কি?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, 'ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর? আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করাতে চাই। ধনীর মেহনতের ফল হ'ল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়,

জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে, ঢের উত্তম পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদের হাতে গায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না—বই পড়তে পারে না।'

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ. ই. ডি দিয়ে 'অতএব সপ্রমাণ হল জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।'

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করে। একমাত্র বাঙলা দেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ করাতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপূত হয় না। সব কিছুই তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশা হয়ে বললে, 'তবে একখানা ভাল বই দিলে হয় না?' গরবিনী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।'

যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালবাসা দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে ডাহা বেইজ্জৎ করতে চায়; তবে সে অপমান করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আপনি হয়ত মনে মনে পঞ্চাশ গুণে নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আঁদ্রে জিদে'র মেলা বন্ধুবান্ধব ছিলেন—অধিকাংশই নামকরা লেখক। জিদ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের স্তালিনীয়ারা তখন লাগল জিদের পিছনে—গালিগালাজ কটুকাটব্য করে জিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুললো। কিন্তু আশ্চর্য, জিদের লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ ক'রে সব কিছু শুনে গেলেন, জিদের হয়ে লড়লেন না। জিদের জিগরে জোর চোট লাগল—তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল। জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মূর্ছা গেল, কিন্তু সম্বিতে ফেরা মাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলাম-খানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।

যে-সব লেখক জিদের হয়ে লড়েন নি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদকে স্বাক্ষর সহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চড়িয়েছেন। জিদ শুধু জঞ্জালই বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে অট্টহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের

মধ্যিখানে জাহাজে বসে শুনতে পেয়েছিলুম—কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন—জাহাজের টাইপ-করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন ডবল দামে আপন আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েছিলেন—যত কম লোকে কেনা-কাটার খবরটা জানতে পারে ততই মঙ্গল। (বাঙলা দেশে নাকি একবার এরকম টিকি বিক্রি হয়েছিল।)

শুনতে পাই, এঁরা নাকি জিদকে কখনো ক্ষমা করেন নি।

* * *

আর কত বলবো? বাঙ্গালীর কি চেতনা হবে?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালীর জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকতো। আমার বেদনাটা সেইখানে! বাঙালী যদি হটেনটট হত, তবে কোনো দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখি নি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, 'বাঙালীর পয়সার অভাব।' বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার টিকিট কাটার 'কিউ' থেকে।

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন ব'লে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

কাইরো

কাইরো যাওয়ার জন্য আলাদা করে কাঠখড় পোড়াবার প্রয়োজন হয় না। ইয়োরোপ যাবার সময় জাহাজ সুয়েজ বন্দরে থামে। সেখানে নেবে সোজা কাইরো চলে যাবেন। এদিকে আপনার জাহাজ অতি ধীরে মন্থরে সুয়েজ খালের ভিতর দিয়ে পোর্ট সইদের দিকে রওয়ানা হবে। খালের দুদিকে বালুর পাড়

যাতে ভেঙে গিয়ে খালটাকে বন্ধ না করে দেয়, তার জন্য কড়া আইন, জাহাজ যেন গরুর গাড়ির গতিতে এগোয়। কাজেই জাহাজ সইদ বন্দর পেঁছিতে না পেঁছিতে আপনি কাইরোতে ঢুঁ মেরে ট্রেনে করে, সেই সইদ বন্দরেই পেঁছে যাবেন। সেই জাহাজেই চেপে, সেই কেবিনেই শুয়ে ইয়োরোপ চলে যাবেন—ফালতো কোনো খরচা লাগবে না।

অবশ্য তাতে করে কাইরোর মত শহরের কিছুই দেখা হয় না—আর কাইরোতে দেখবার মত জিনিস আছে বিস্তর। পিরামিড দেখা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই, এইটুকু যা সান্ত্বনা। জাহাজের অনেকেই আপনাকে বললেন, ঘণ্টা দশকের জন্য কাইরোতে ওরকমধারা ঢুঁ মেরে বিশেষ কোন লভ্য নেই। আমারও সেই মত; কিন্তু তবু যে যেতে বলছি তার কারণ যদি আপনার পছন্দ হয়ে যায়, তবে হয়ত বিলেত থেকে ফেরার মুখে ফের কাইরোতে নেবে দু'চার সপ্তাহ কাটিয়ে আসতে পারেন। ইয়োরোপে তো দেখবেন কুল্লে এক ইয়োরোপীয় সভ্যতা (ফরাসী, জর্মন, ইংরেজ যত তফাৎই থাক না কেন, তবু তো তারা আপোসে একটা সভ্যতাই গড়ে তুলেছে), আর দেখেছেন ভারতীয় সভ্যতা—তার উপর যদি আরেক তৃতীয় সভ্যতার সঙ্গে মোকাবেলা হয়ে যায়, তবে তাতে নিশ্চয়ই বিস্তর লভ্য।

আমার লেগেছিল কাইরো দেখতে পাক্কা একটি বছর! অতদিন আপনি থাকবেন না সে আমি জানি। আপনার অতটা সময় লাগবে না—সে কথাও জানি। কারণ আমি কাটিয়েছিলুম প্রথম ছ'টি মাস শুধু আড্ডা মেরে মেরে—বাড়ির ছাতের উপর থেকে পিরামিড স্পষ্ট দেখা যায়, ট্রামে করে হুশ করে সেখানে যেতে কোনোই বাধা নেই, পূর্ণিমায় আবার ইস্পিশল সার্ভিস, তৎসত্ত্বেও ছ'টি মাস কেটে গেল এ-কাফে ও-কাফে করে করে, পিরামিড দেখার ফুরসৎ আর হয়ে ওঠে না। বন্ধুরা কেউ জিজ্ঞেস করলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতুম, 'সবই ললাটঙ্ক লিখন। কলকাতায় দশ বছর কাঠিয়ে "গঙ্গাস্তান" যখন হয়ে উঠেনি, তখন বাবা-পিরামিড দর্শন কি আমার কপালে আছে?' (আসল কারণটা চুপে চুপে বলি;—এক গাদা পাথর দেখায় যে কি তত্ত্ব তা আমি পিরামিড দেখার আগে এবং পরে কোনো অবস্থাতেই ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারি নি)।

সে কথা থাক; সভ্যতা, পিরামিড এ-সব জিনিস নিয়ে অন্য জায়গায় পাণ্ডিত্য ফলাব। 'বসুমতী'র পাঠকরা এতদিনে আমাকে বিলক্ষণ চিনে গিয়েছেন, আমার মুখে পাণ্ডিত্যের কথা শুনলে ঠা-ঠা করে হেসে উঠবেন। তাই সেই আড্ডাতেই ফিরে যাই।

আমি ভালোবাসি হেদো, হাতিবাগান, শ্যামবাজার। ও-সব জায়গায় তাজমহল নেই, পিরামিড নেই। তাতে আমার বিন্দুমাত্র খেদও নেই। আমি ভালোবাসি আমার পাড়ার চায়ের দোকানটি। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা হাজিরা দিই, পাড়ার পটলা, হাবুল আসে, সবাই মিলে বিড়ি ফুঁকে গুষ্ঠীসুখ অনুভব করি আর উজির-নাজির মারি। আমার যা কিছু জ্ঞান-গম্যি তা ঐ আড্ডারই ঝড়তি-পড়তি মাল কুড়িয়ে নিয়ে।

তাই যখন কপালের গদিশে কাইরোতে বাসা বাঁধতে হল, তখন আড্ডাভাবে

তিনদিনেই আমার নাভিশ্বাস উপস্থিত হল। ছন্নের মত শহরময় ঘুরে বেড়াই আর পটলা-হাবলুর বসন্ত রেস্টুরেন্টের জন্য সাহারার উষ্ণ নিশ্বাসের সঙ্গে আপন দীর্ঘ নিশ্বাস মেশাই। এমন সময় সদ্‌গুরুর কৃপায় একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম—পাড়ার কফিখানাতে রোজই দেখতে পাই গোটা পাঁচেক লোক বসন্ত রেস্টুরেন্টরই মত চেঁচামেচি কাজিয়া-ঝগড়া করে আর এন্তার কফি খায়, বিস্তর সিগারেট পোড়ায়।

দিন তিনেক জিনিসটা লক্ষ্য করলুম, কখনো কফিখানায় বসে, কখনো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। নূতন শহরের সব কিছুই গোড়ার দিকে সুর-রিয়ালিস্টিক ছবির মতো এলোপাতাড়ি ধরনের মনে হয়? অর্থ খাড়া হতে হতে কয়েকদিন কেটে যায়। যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম তখন আমেজ করলুম, আমাদের বসন্ত রেস্টুরেন্টের আড্ডা যখন গুরুচণ্ডাল সক্কলের জন্যই অবারিতদ্বার, তখন এরাই বা আমাকে ব্রাত্য করে রাখবে কেন? হিম্মৎ করে তাদের টেবিলের পাশে গিয়ে বসলুম আর করুণ নয়নে তাদের দিকে মাঝে মাঝে তাকালুম। শকুন্তলার হরিণও বুঝি ওরকমধারা তাকাতে পারত না।

দাওয়াই ধরলো। এক ছোকরা এসে অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় নিল এবং জানালো তাদের আড্ডায় বিস্তর সীট ভেকেন্ট, আমি যদি ইত্যাদি। আমাকে তখন আর পায় কে? ভাঙা ফরাসী, টুটাফুটা আরবী, পিজ্‌ন ইংরিজী সবকিছু জড়িয়ে-মড়িয়ে দু'মিনিটের ভিতরেই তাঁদের সবাইকে বসন্ত রেস্টুরেন্টে নেমন্তন্ন করলুম পটলা-হাবলুর ঠিকানা দিলুম, বসন্ত যে ভেজাল তেল আর পচা হাঁসের ডিম দিয়ে খাসা মামলেট বানায় তার বর্ণনা দিতেও ভুললুম না।

কিন্তু কোথায় লাগে আমাদের আড্ডা কাইরোর আড্ডার কাছে? বাঙালী-আড্ডার সব কটা সুখ কাইরোর আড্ডাতে তো আছেই; তার উপর আরেকটা মস্ত সুবিধার কথা এই বেলা বলি, যার জন্য এতক্ষণ ধরে ভূমিকা দিলুম।

দুনিয়ার যত ফেরিওলা কাইরোর কাফেতে চক্কর মেরে যায়। টুথব্রাশ, সাবান, মোজা, আরশি, চিরুনি, নোটবক, পেন্সিল, তালাচাবি, ফাউন্টেন পেন, ঘড়ি—হেন বস্তু নেই যা ফেরিওলা নিয়ে আসে না! আমি জানি, আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু ধর্মসাক্ষী, দর্জি পর্যন্ত বস্তা বস্তা কাপড় মুটের ঘাড়ে চাপিয়ে কাফের ভিতর চক্কর মেরে যায়। কাইরোর লোক দোকানে যেতে ভালোবাসে না। তাতে নাকি সময় নষ্ট হয়, আর দোকানী একা পেয়ে আপনাকে ঠকাবেও নিশ্চয়। আড্ডাতে বন্ধু-বান্ধব রয়েছেন। পাঁচজনে মিলে বরং ফেরিওয়ালাকে ঘায়েল করার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

একপ্রস্ত সুট বানাবার বাসনা ছিল। আড্ডাতে সেটা সবিনয় নিবেদন করলুম। পাশ দিয়ে দর্জি যাচ্ছিল—ডাক দিতে সবাই 'হাঁ হাঁ, করো কি করো কি!' বলে বাধা দিলেন! 'ও ব্যাটা সুট বানাবার কি জানে? প্লাস্তিরাস আসুক। গ্রীক বটে, ঠকাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু আমরাও তো পাঁচজন আছি। ও কাপড় আনে ঠকিয়ে, কাস্টম না দিয়ে। আমরাও ওকে ঠকাতে পারলে টাকায় আট আনা লাভ। ঠকলে দু' আনা লাভ। অথবা কুইট্‌স।' তারপর আড্ডা

আমায় বুঝিয়ে বলল, যে সুট বানাতে চায় সে যেন বর। তার কথা কওয়া ভালো দেখায় না। সে কনেপক্ষের প্যাঁচে পাড় বানচাল হয়ে যাবে, গয়নাগুলো যাচাই না করে নিয়ে ফেলে আখেরে পস্তাবে।

প্লাস্তিরাস এল। তারপর বাপরে বাপ! সে কী অসম্ভব দরদস্তুর, বকাবকি, —শেষটায় হাতাহাতির উপক্রম। আড্ডা বলে, 'ব্যাটা তুমি দুনিয়া ঠকিয়ে খাও, তোমাকে পুলিসে দেব।' প্লাস্তিরাস বলে, 'ও দামে সুট বানালে আমাকে আপন পাতলুন বন্ধক দিয়ে কাচ্চা-বাচ্চার জন্য আণ্ডারুটি কিনতে হবে।'

পাক্কা তিনঘণ্টা লড়াই চলেছিল। এর ভিতর প্লাস্তিরাস তিনবার রাগ করে কাপড়ের বস্তা নিয়ে চলে গেল, তিনবার ফিরে এল। আড্ডাও দল বাড়াবার জন্য কাফের ছোকরাকে পাঠিয়ে আমাদের গ্রীক সভ্য পাউলুসকে ডেকে আনিয়েছ। তখন লাগল গ্রীকে গ্রীকে লড়াই। সুড-এটেন্ নিয়ে হিটলার চেম্বারলেনে এর চেয়ে বেশী দর-কষাকষি নিশ্চয়ই হয় নি। যখন রফারফি হল তখন রাত এগারোটা। আমি বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়েছিলুম—আড্ডা তাতে আপত্তি জানান নি, বরের উপস্থিতি অপরিহার্য নয়। কাফের ছোকরা আমাকে বিছানা থেকে টেনে নিয়ে গেল। মাপ দেওয়া হল। তিন দিন বাদে পয়লা ট্রায়েল —অবশ্য কাফেতেই।

তিন দিন বাদে আড্ডা ফুল স্ট্রেন্থে হাজির। আমি কাফের পিছনের কামরায় গিয়ে নূতন সুট পরে বেরিয়ে এলুম। সর্বত্র চকের দাগ আর তাঁতী-বাড়ির মত আমার সর্বাঙ্গ থেকে সুতো ঝুলছে। সুটের চেহারা দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মার লাগাও ব্যাটা প্লাস্তিরাসকে; এ কি সুট বানিয়েছে না মৌলবী সাহেবের জোব্বা কেটেছে?' ও কি পাতলুম না চিমনির চোঙা? প্লাস্তিরাস দর্জি না হাজাম? ইত্যাদি সর্বপ্রকারের কটুকাটব্য। প্লাস্তিরাসও হেঁকে বলল, সে স্বয়ং বাদশার সুট বানায়। সবাই বললে, 'কোন্ বাদশা? সাহারার?'

তারপর এ বলে আস্তিন কাটো, ও বলে কলার ছাঁটো। কেউ বলে পাতলুন নামাও, কেউ বলে কোট তোলো। প্লাস্তিরাসও পয়লা নম্বরের ঘড়েল—সকলের কথায় কান দেয় আবার কারো কথায় কান দেয়ও না, অর্থাৎ যা ভালো বোঝে তাই করে।

এই করে করে কাফেতে আড্ডা জমানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ট্রায়েল পেরলুম। সুট তৈরী হল। আমি সেইটে পরে বরের মত লাজুক হাসি হেসে সবাইকে সেলাম করলুম। সুট দীর্ঘজীবী হোক বলে সবাই আশীর্বাদ করলেন। কাফের মালিক পর্যন্ত আমাদের পরবে শামিল হল। আমি সব্বাইকে একপ্রস্থ কফি খাওয়ালুম। সে-সুট পরে আজও যখন ফার্পোতে যাই গুণীরা তারিফ করেন।

পুলিনবিহারী

ছেলেবেলায় যে-রকম গলাজল ঠেলে ঠেলে খাল পেরতুম, ঠিক সেইরকম পূর্বের হাওয়া ঠেলে ঠেলে সমুদ্রপারে পেঁছিতে হল।

অন্য দিন সমুদ্র থেকে থেকে এক-একখানা করে ঢেউ পাঠায়। সে অনেক দূর থেকে পাঁয়তারা কষে কষে দড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে কোমর বেঁধে শেষটায় পাড়ে এসে আছাড় খায়। আজ বিশাল আয়োজন। একসঙ্গে অনেকগুলো পালোয়ান; একজনের পিছনে আরেকজন পাঁয়তারা কষে কষে আসছে। তারপর পাড়ে এসে হুটোপুটি—দোস্ত-দুশমনের সনাক্ত হওয়ার গোলমালে আপসে হানাহানি। শেষটায় কোলাকুলিতে মিলে গিয়ে ছোট ছোট দ'য়ে জমে যাওয়া।

সমস্ত আকাশ জুড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া রঙিন মেঘ—এলোমেলো, যেন আর্টিস্টের পেলেটে, এলোপাতাড়ি হেথা হোথায় এবড়ো-থেবড়ো রঙ। কিন্তু তবু সব-সুদ্ধ মিলে গিয়ে যেন কেমন একটা সামঞ্জস্য রয়েছে—মনে হয় না অদলবদল করলে কিছু ফেরফার হবে।

বসেছিলুম জলের আর জেলেপাড়ার মাঝখানে। পিছনে নারকেল বন—তাতে আগুন লাগিয়ে সূর্য প্রচণ্ড মহিমায় অস্ত গেলেন—গরবিনীর সতীদাহ। সমুদ্রের গর্জন আর ঢেউয়ে-ভেসে-আসা-পোনা-মাছ-লুব্ধ কাকের কর্কশ চিৎকার, নারকেল গাছের উস্কোখুস্কো মাথার অবিশ্রান্ত আছাড় খাওয়া—অশান্তির চরম আয়োজন।

তাই বোধ করি একটি জেলে-ডিঙিও জলে নামে নি। লম্বা সারি বেঁধে কাৎ হয়ে পড়ে আছে ডাঙ্গায়, যেন, ডিসেকশান টেবিলের সারি সারি মড়া। সমস্ত তীরে মাত্র দু'টি জেলে সুতো ফেলে গভীর ধৈর্যে মাছ ধরার চেষ্টাতে আছে। জোয়ারের জোর টোপ ধুয়ে নিয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে, নূতন টোপ সাজতে হয়—তবু তাদের ধৈর্য অসীম। বাদবাকি ছেলেবুড়ো বালুপাড়ে বসে আছে—এত মেহন্নত করে লাভ নগণ্য।

অন্ধকার নামল অতি ধীরে ধীরে। পাটরাণী তো চিতেয় উঠলেন লাল টকটকে হয়ে। আকাশ সিঁদুর মুছলেন অতি অনিচ্ছায়—এমেঘে ওমেঘে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে। সক্কলের শেষ পান্না জল লালে-নীলে মেশা বেগুনি ঝিলিকটুকু মুছে ফেলে আস্তে আস্তে শ্যামলা সবুজ হলেন।

কোনদিন আবার রঙের রাজা মাত্র তিনটি রঙ নিয়ে খেলায় বসেন। সমুদ্র আর পূবের আকাশকে দেন কালো-নীল, পশ্চিম আকাশকে একটুখানি গোলাপী আর মাথার উপর বাকী সমস্ত আকাশ পায় ফিকে ফিরোজা। যতক্ষণ না কালো পরদায় সব কিছু ঢাকা পড়ে যায়, ততক্ষণ শুধু এই তিন রঙের ফিকে ঘন'র খেলা। তাতে কতই না কারচুপি। এদিকে কালো-নীল যত ঘনিয়ে ঘনিয়ে নীলের রেশ কমাতে লাগল, ওদিকে তেমনি গোলাপী ফিকে হতে হতে শিরিষ রঙের আমেজ নিতে আরম্ভ করল। মাঝখানের আকাশ ফিরোজাতে শ্বেত-চন্দনের প্রলেপ লাগিয়েই যাচ্ছে। এ যেন তিন স্বর নিয়ে খেলা। আর

তবলাও ঠিক বাঁধা। পশ্চিমের আকাশ যদি দ্রুত লয়ে রঙ বদলান তবে পুবও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাল রাখেন। আর সমুদ্রের গর্জনে যেন তানপুরোর আমেজ।

সমে এসে যখন পুব-পশ্চিম মিলে গেল অন্ধকারে, তখন তানপুরোর রেশটুকুমাত্র রইল সাগরপারে। মশালচি এসে আসমানের ফরাসে এখানে-ওখানে তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে গেল। এবার রাত্রির মুশায়েরা (কবিসঙ্গম) বসবে। নারকেল গাছ মাথা দোলাবে, ঝিঁঝিঁ নূপুর বাজিয়ে নাচবে, পুবের বাতাস সভার সর্বাঙ্গে গোলাপজল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে যাবে। তারপর দূর সাগরের ওপারে লাল মদের ভাঁড় থেকে মাতাল চাঁদ উঠবেন ধীরে ধীরে গা টেনে টেনে, একটুখানি কাৎ হয়ে। মোসাহেবদের মুখে হাসি ফুটবে—অন্ধকারে যারা গা-ঢাকা দিয়ে বসেছিল, তাদের সবাইকে তখন চেনা যাবে।

* * *

সমুদ্রপারে, নীল গম্বুজের তলে, বিশ্ব-সংসারের ঠিক মাঝখানে যখন বসি তখন মনে হয়, যেন সার্কাসের গোল তাঁবুর মাঝখানে আমাকে কে যেন বসিয়ে দিয়েছে আর চতুর্দিকে গ্যালারিতে লাল হলদে সোনালি মেঘের পাল অপেক্ষা করছে আমি কখন বাঁদর-নাচ আরম্ভ করব।

ভারি অস্বস্তি বোধ হয়।

এই সব রঙচঙা মেঘের দল অত্যন্ত অভদ্র চার-আনী দর্শক।

হঠাৎ একজন যেন হেসে হেসে লাল হয়ে ফেটে পড়ার যোগাড় করে পাশের আরেক চার-আনীকে কি বলে। সেও তখন লাল হয়ে উঠে তার পাশের জনকে সে কথা বলে—দেখলে দেখতে সমস্ত তাঁবুর সবাই লাল হয়ে ওঠে। যেদিকে তাকাই সেদিকেই হাসির লুটোপুটি।

লুকোবার জায়গা নেই।

বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলুম বিরক্ত হয়ে।

কিন্তু তবু সেই মাঝখানেই। তবু যেন তার চার-আনীর দলকে সঙ্গে নিয়ে আমারই চতুর্দিকে ঠিক তেমনি ঘিরে দাঁড়াতে চায়।

বিশ্বসংসার আমাকে বাঁদর-নাচ নাচিয়ে ছাড়বে না!

* * *

দু'জোড়া কপোত-কপোতী নিত্যি নিত্যি দেখতে পাই। একে অন্যকে পেয়েই তারা খুশী। সে খুশী তাদের বসাতে, চলাতে, তাদের হাত-পা নাড়া-চাড়াতে যেন উপচে পড়ে। এক জোড়া সমুদ্রের পারে পারে পা-চারী করে—ছেলেটা যেমন ছ'ফুট ঢ্যাঙা, মেয়েটিও তেমনি পাঁচ ফুটের কমতি। ছেলেটার কর্ম, মেয়েটার দুই জুতো এক ফিতেতে বেঁধে কড়ে আঙুলে ঝুলিয়ে দোলাতে দোলাতে লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলা; মেয়েটা-শুধু পায়ে ভিজে বালির উপর দিয়ে চড়ুই পাখীর মত লাফ দিয়ে দিয়ে নেচে যায়—কেউ তাড়া করে এলে লাফ দিয়ে এক পাশে সরে যায়, চলে গেলে বেঁকে গিয়ে জলের দিকে এগোয়। খাটো করে পরা ফ্রক, পা দু'টি সুডৌল ঘন শ্যামবর্ণ। কথাবার্তা

কখনো কইতে শুনি নি—একে অন্যের দিকে তাকায় পর্যন্ত না। এগুতে এগুতে তারা আড়ায়ার পর্যন্ত চলে যায়, তবু দূর থেকেও তাদের চেনা যায়—ঢ্যাঙা আর বেঁটে। ঢ্যাঙা নাক-বরাবর সোজা চলেছে, মেয়েটি এঁকে-বেঁকে।

আরেক জোড়া সমস্তক্ষণ বসে থাকে ডাঙায়-তোলা একটা নৌকোর আড়ালে কুণ্ডলী-পাকানো জালের বস্তায় হেলান দিয়ে। সমুদ্রের দিকে তাকায় না, পিছনের সূর্যাস্তও জালের বস্তায় ঢাকা পড়ে। সমস্তক্ষণ গুজুর গুজুর। কখনো খুব পাশাপাশি ঘেঁষে বসে, ছেলেটা মেয়েটির কোলে হাত রেখে, কখনো দেখি মেয়েটির হাত ছেলেটির কোমর জড়িয়ে। বেড়ায় না, ডাইনে-বাঁয়ে তাকায় না। রাত ঘনিয়ে এলে একই সাইকেলে চড়ে উত্তর দিকে চলে যায়।

* * *

দূর থেকে রোষে-ক্রোধে তর্জন-গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সিন্ধুপারে লুটিয়ে পড়ে অবশেষে এ কী বিগলিত আত্মনিবেদন।

তাণ্ডবের ডমরু বাজিয়ে, ছিন্নমস্তার আত্মঘাতে নিজেকে বারে বারে দ্বিখণ্ডিত করে, পাড়ে এসে অবশেষে লক্ষ কিঙ্কিণীর এ কী মৃদু শান্ত নূপুর-গুঞ্জরণ!

সূর্যোদয়ের লোহিতোজ্জ্বল রক্ত-টিপ, দ্বিপ্রহরের অতি ঘন নীলাম্বরী, সন্ধ্যার গৈরিক পট্টবাস, সর্বশেষে অন্ধকারে সর্বস্ব ত্যাগ করে কার অভিসারে সিন্ধুপারে মৃদুপদসঞ্চারণ!!

আহারাদি—

যে লোক উদ্ভিদতত্ত্ব জানে না, সে দেশী-বিদেশী যে-কোন গাছ দেখলেই মনে করে, এও বুঝি এক সম্পূর্ণ নূতন গাছ। তখন নূতন গাছের সঙ্গে তার চেনা কোনো গাছের কিছুটা মিল সে যদি দেখতে পায় তবে অবাক হয়ে ভাবে, এই চেনা-অচেনায় মেশানো গাছের কি অন্ত নেই। কিন্তু শুনেছি, উদ্ভিদবিদ্যা নাকি পৃথিবীর বেবাক গাছকে এমন কতকগুলো শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলেছে যে, নূতন কোনো গাছ দেখলে তাকে নাকি কোনো একটা শ্রেণীতে ফেলে নামকরণ পর্যন্ত করা যায়। আশ্চর্য নয়, কারণ ধ্বনির বেলা তো তাই দেখতে পাচ্ছি। ইংরিজী শুনে মনে হয় যে, এই বিকট ভাষার স্বর-ব্যঞ্জনের বুঝি অন্ত নেই। কিন্তু ডেনিয়েল জোন্স এবং পূর্বাচার্যগণ এমনি উত্তম শ্রেণীবিভাগ করে ফেলেছেন যে, আজ আমরা বাপঠাকুরদার চেয়ে বহু কম মেহন্নতে ইংরিজী উচ্চারণ শিখতে পারি।

আহারাদির বেলাও তাই। আপনার হয়ত কোনো কাবুলীওয়ালার সঙ্গে মিতালি হল। সে আপনাকে দাওয়াত করে খাওয়াল। প্রথমটায় আপনি হয়ত ভেবেছিলেন যে, হাতুড়ি বাটালি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। গিয়ে দেখেন, খেতে দিল তোফা পোলাও আর খাসা মুরগীর ঝোল। তবে ঠিক জাকারিয়া স্ট্রীটের মত রান্না নয়, কলকাতাবাসী পশ্চিমা মুসলমানরা যে রকম রান্না করে ঠিক

সে-রকম নয়। কেমন যেন একটুখানি আলাদা, কিন্তু খেতে উমদা।

অথবা মনে করুন আপনাকে প্যারিসের কোনো রেস্তোরাঁয় আপনার ভারতীয় বন্ধু 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ' খেতে দিলেন। হয়ত আপনি ইয়োরোপে এসেছেন মাত্র কয়েকমাস হল—নানা প্রকার যাবনিক খাদ্য খেয়ে খেয়ে আপনার পিত্তি (উভয়ার্থে) চটে আছে। তখন সেই 'গুলাশ' দেখে আপনি উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করবেন। সেই রাত্রেই আপনি গিন্নীকে চিঠি লিখলেন, 'বহুকাল পরে মাংসের ঝোল খেয়ে বিমলানন্দ উপভোগ করলুম।' কারণ 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ' আর সাদা-মাটা মাংসের ঝোলে কোনো তফাৎ নেই।

আর আপনার বন্ধু যদি ন'সিকে গুণী হন এবং সেই গুলাশের সঙ্গে খেতে দেন 'ইতালিয়ান রিসোত্তো', তাহলে আপনাকে হাতী দিয়ে বেঁধেও সেই রেস্তোরাঁ থেকে বের করা যাবে না। ইয়োরোপের বাকী ক'টা দিন আপনি সেই রেস্তোরাঁর টেবিল বেড়ালছানার মত আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে চাইবেন। কারণ বহুকাল যাবনিক আহারাদির পর মাংসের ঝোল আর রুটি মুখরোচক বটে, কি তার সঙ্গে কি পোলাও আর মাংসের ঝোলের তুলনা হয়? ঘড়েল পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে ধরে ফেলেছেন যে, 'ইতালিয়ান রিসোত্তো' মানে পোলাও, তবে ঠিক, ভারতীয় পোলাও নয়। কোপ্তা-পোলাওয়ের কোপ্তাগুলোকে যদি ছোট্ট ছোট্ট টুকরো করে পোলাওয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে তাই হবে রিসোত্তো।

অথবা মনে করুন, দেশে ফেরার সময় আপনি একদিনের তরে কাইরোতে ঢুঁ মেরে এলেন। কিছু কঠিন কর্ম নয়। পোর্ট সইদে জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে কাইরো, সেখানে ঘণ্টা বারো কাটিয়ে মোটরে করে সুয়েজ বন্দরে পেঁছে ফের সেই জাহাজই ধরা যায়—কারণ জাহাজ সুয়েজ খাল পেরোয় অতি ধীরে ধীরে।

কাইরোতে খেলেন মিশরী রান্না। চাক্তি চাক্তি মাংস খেতে দিল, মধ্যিখানে ছ্যাঁদা। দাঁতের তলায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে বটে, কিন্তু সোওয়াদ খাসা। খাচ্ছেন আর ভাবছেন বস্তুটা কি, কিন্তু কোন হদিস পাচ্ছেন না। হঠাৎ মনে পড়ে যাবে, খেয়েছি বটে আমজাদিয়ায় এইরকম ধারা জিনিস—শিককাবাব তার নাম। তবে মশলা দেবার বেলা কঞ্জুসী করেছে বলে ঠিক শিককাবারের সুখটা পেলেন না।

এতক্ষণে আপনার শাস্ত্রাধিকার হল। এই যে মশলার তত্ত্বটা আবিষ্কার করতে পেরেছেন, এরই খেই ধরে আপনি রান্নার শ্রেণী বিভাগ নিজেই করে ফেলতে পারবেন।

পৃথিবীতে কুল্লে দুই রকমে রান্না হয়। মশলাযুক্ত এবং মশলাবর্জিত। মশলা জন্মে প্রধানতঃ ভারতবর্ষে, জাভায়, মালয়ে। ইউরোপে মশলা হয় না। তাই ইউরোপীয় রান্না সাধারণতঃ মশলাবর্জিত।

এবার ঈষৎ ইতিহাসের প্রয়োজন। তুর্ক পাঠানরা যখন এদেশে আসে তখন পশ্চিম এবং উত্তর ভারত নিরামিষ খেত। তুর্ক পাঠানরা মাংস খেত বটে, কিন্তু সে রান্নায় মশলা থাকত না। তুর্ক-পাঠান—মোগলরা যে রকম ভারতবর্ষের অলংকার কারুকার্যের সঙ্গে তুর্কিস্থানী ইরানী স্থাপত্য মিলিয়ে তাজমহল

বানালো, ঠিক সেইরকম ভারতীয় মশলার সঙ্গে তাদের মাংস রান্নার কায়দা মিলিয়ে এক অপূর্ব রান্নার সৃষ্টি করল। আপনারা তাজমহল দেখে 'আহা' আহা' করেন, আমি করি না। কারণ তাজমহল চিবিয়ে খাওয়া যায় না। আর খাস মোগলাই রান্না পেলেই আমি খাই এবং খেয়ে 'জিন্দাবাদ বাবুর আকবর' বলি—যদিও তাঁরা বহুকাল হল এ-জিন্দেগীর খাওয়াদাওয়া শেষ করে চলে গিয়েছেন।

এই 'মোগলাই' রান্না ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের তাবৎ মাংস-খেকোদের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। (বাঙালী আর দ্রাবিড়ের কথা আলাদা ; এরা মাংস খায় কম, আর খাস মোগল-পাঠানের সংস্পর্শে এসেছে তারও কম। পিরালী ঠাকুরবাড়ি ব্যত্যয়, তাঁরা মোগলের সঙ্গে খানিকটা মিশেছিলেন বলে তাঁদের রান্নায় বেশ মোগলাই খুশবাই পাওয়া যায়)। এমন কি মোগলের দুশমন রাজপুত মারাঠারা পর্যন্ত মোগলাই খেতে আরম্ভ করল। এখনো রাজপুতানা, বরোদা, কোল্হাপুর রাজ্যের সরকারী অতিথিশালায় উঠলে বাবুর্চি প্রথম দিনই শুধায় 'মোগলাই' না নিরামিষ খাবেন। আমার উপদেশ—মোগলাইটাই খাবেন—তাতে করে পরজন্মে অজ-শিশু হয়ে জন্মালেও আপত্তি নেই।

মোগল-পাঠানরা এই রান্না আফগানিস্থান-তুর্কীস্থানে প্রচলিত করল। আস্তে আস্তে সেই রান্নাই তাবৎ মধ্যপ্রাচ্য ছেয়ে ফেলল। তবে যত পশ্চিম পানে যাবেন, ততই মশলার মেকদার কমে আসবে। অর্থনীতিতে নিশ্চয়ই পড়েছেন, উৎপত্তিস্থল থেকে কোন বস্তু যত দূরে যাবে ততই তার দাম বেড়ে যায়। আফগানিস্থানের রান্নায় যে হলুদ (কাবুলীরা বলে 'জরদ্ চোপ' অর্থাৎ হলদে কাঠ) পাবেন, ইস্তাম্বুল পর্যন্ত সে হলুদ পেঁছিয় নি।

তুর্করা বল্কান জয় করে, হাঙ্গেরি পেরিয়ে ভিয়েনার দরজায় হানা দেয়। হাঙ্গেরিতে মোগলাই মাংসের ঝোল 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশে' পরিবর্তিত হল এবং মিশরী এবং তুর্কদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভেনিসের কারবারীরা 'মিন্সট-মীটে'র পোলাও বা রিসোত্তো বানাতে শিখল। গ্রীস সেদিন পর্যন্ত তুর্কীর তাঁবেতে ছিল, তাই গ্রীসের পোশাকী রান্না আজও চোগা-চাপকান পরে থাকে।

পৃথিবীতে দ্বিতীয় উচ্চাঙ্গের রান্না হয় প্যারিসে কিন্তু মশলা অতি কম, যদিও ইংরিজী রান্নার চেয়ে ঢের ঢের বেশী। এককালে তামাম ইয়োরোপ ফ্রান্সের নকল করত, তাই বল্কান গ্রীসেও প্যারিসী রান্না পাবেন। গ্রীস উভয় রান্নার সঙ্গমস্থল। বাকি জীবনটা যদি উত্তম আহারাদি করে কাটাতে চান, তবে আস্তানা গাড়ুন গ্রীসে (দেশটা বেজায় সস্তা)। লঞ্চ, ডিনার, সাপার খাবেন ফরাসী মোগলাই এবং ঘরোয়া গ্রীক কায়দায়। ভুঁড়ি কমাবার কোমরবন্দ্ সঙ্গে নিয়ে যাবেন—গ্রীসে এ জিনিসের বড্ড বেশী চাহিদা বলে বস্তুটা বেজায় আক্রা।

সুশীল পাঠক, স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আপনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। আপনার মনে আঁকুবাকু প্রশ্ন, রান্না-জগতে বাঙালীর অবদান কি ?

আছে, আছে। মাছ, ছানা এবং বাঙালী বিধবার নিরামিষ রান্না।

Uttarpara Jaikrishna Public L

কিন্তু তার আগে তো চীনা রান্নার বয়ান দিতে হয়। মোগলাই, ফরাসী এবং চীনা এই ত্রিমূর্তির বর্ণনা না করে আমি 'প্রাদেশিক সংকীর্ণতা'র প্রশ্রয় দিতে চাইনে।

আরেকদিন হবে। বৈদ্যরাজ বলেছেন, দীর্ঘজীবী হয়ে যদি বহুকাল ধরে উদরমার্গের সাধনা করতে চাও, তবে বীজমন্ত্র হচ্ছে 'জীর্ণে ভোজনং'। অর্থাৎ হজম না করা পর্যন্ত পুনরায় আহারে বসবে না। তাও যদি না মানেন, তবে চটে গিয়ে সুকুমার রায়ের ভাষায় বলব (দোষটা তাঁর, কটু বাক্যটা তিনিই কয়েছেন)—

এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা
খাও তবে কচু পোড়া, খাও তবে ঘণ্টা ॥

নেতাজী

আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের মত মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করা অন্ধের হস্তী-দর্শনের ন্যায়। তৎসত্ত্বেও যে আমরা সুভাষচন্দ্রের জীবনী দর্শনে প্রবৃত্ত হয়েছি তার প্রধান কারণ, আমাদের মত অর্বাচীন লেখকেরা যখন মহাপুরুষকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্য ঐ একমাত্র পন্থাই খোলা পায়, তখন তার শ্রদ্ধাবেগ তাকে অন্ধত্বের চরমে পৌঁছিয়ে দেয়—শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্য তখন আমাদের চেয়ে সহস্রগুণে উত্তম লেখককেও বাচাল করে তোলে।

দ্বিতীয় কারণ, এক চীনা গুণী জনৈক ইংরেজকে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বুঝিয়ে বলছিলেন, 'সরোবরে জল বিস্তর কিন্তু আমার পাত্র ক্ষুদ্র। জল তাতে ওঠে অতি সামান্য। কিন্তু আমার শোক নেই—মাই কাপ্ ইজ্ স্মল—বাট আই ড্রিংক অফতেনার (My cup is small but I drink oftener)।'

আমাদের পাত্র ছোট, কিন্তু যদি সুভাষ-সরোবর থেকে আমরা সে পাত্র ঘন ঘন ভরে নিই তাহলে শেষ পর্যন্ত সরোবর নিঃশেষ হোক আর নাই হোক, আমাদের তৃষ্ণা নিবৃত্তি নিশ্চয়ই হবে। আমার পাত্রে উঠেছে দুই গণ্ডূষ জল, অথবা বলব, আমি অন্ধ, হাত দিয়ে ফেলেছি সৌভাগ্যক্রমে দুটি দাঁতেরই উপর। অবশ্য সব অন্ধই ভাবে, সেই সবচেয়ে মহামূল্যবান স্থলে হাত দিয়ে ফেলেছে, কাজেই এ-অন্ধের অভিমত আত্মম্ভরিতাপ্রসূতও হতে পারে।

প্রথম, বর্মায় সুভাষচন্দ্র কি কৌশলে হিন্দু-মুসলমান-শিখকে এক করতে পেরেছিলেন? এবং শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষে ফেরার পরও এঁদের অধিকাংশ অখণ্ডবাহিনীরূপে আত্মপরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। আমরা জানি, সুভাষচন্দ্রের সাইগন আসার বহুপূর্বে রাসবিহারী বসু অনেক চেষ্টা করেও কোনো আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলতে পারেন নি। অথচ রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের তুলনায় জাপানীদের কাছে অনেক বেশী পরিচিত ছিলেন—জাপান-ফের্তা ভারতীয়দের মুখে শুনেছি রাসবিহারী বসুকে জিজ্ঞাসা না করে জাপান সরকার কখনো কোনো ভারতীয়কে জাপানে থাকবার ছাড়পত্র মঞ্জুর করত না।

একদিকে যেমন দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র 'আজাদ হিন্দ' নামটি অনায়াসে সর্বজনপ্রিয় করে তুললেন, অন্যদিকে দেখি, কৃতজ্ঞ মুসলমানেরা তাঁকে 'নেতাজী' নাম দিয়ে হৃদয়ে তুলে নিয়েছে—'কাইদ-ই-আকবর' বা ঐ জাতীয় কোনো দুরূহ আরবী খেতাব তাঁকে দেবার প্রয়োজন তারা বোধ করে নি। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, তখন এ-দেশে হিন্দী-উর্দু সমস্যা কংগ্রেসকে প্রায়ই বিচলিত করত, অথচ দেখি সুভাষচন্দ্রকে এ সমস্যা একবারের তরেও কাতর করতে পারে নি। বেতারে আমি সুভাষচন্দ্রের প্রায় সব বক্তৃতাই শুনেছি এবং প্রতিবারই বিস্ময় মেনেছি হিন্দী-উর্দুর অতীত এ ভাষা নেতাজী শিখলেন কি করে? নেতাজী তো শব্দতাত্ত্বিক ছিলেন না, ভাষার কলাকৌশল আয়ত্ত করবার মত অজস্র সময়ও তো তাঁর ছিল না। এ-রহস্যের একমাত্র সমাধান এই যে, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি যে মহাত্মার থাকে, দেশকে সত্যই যিনি প্রাণ মন সর্বচৈতন্য সর্বানুভূতি দিয়ে ভালোবাসেন, সাম্প্রদায়িক কলহের বহু ঊর্ধ্বে নির্দ্বন্দ্ব পুণ্যলোকে যিনি অহরহ বিরাজ করেন, যে মহাপুরুষ দেশের অখণ্ড সত্যরূপ ঋষির মত দর্শন করেছেন, বাক্যব্রহ্ম তাঁর ওষ্ঠাগ্রে বিরাজ করেন। তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেন, সে-ভাষা সত্যের ভাষা, ন্যায়ের ভাষা, প্রেমের ভাষা। সে-ভাষা শুদ্ধ হিন্দী অপেক্ষাও বিশুদ্ধ হিন্দী, শুদ্ধ উর্দু অপেক্ষাও বিশুদ্ধ উর্দু। সে-ভাষা তাঁর নিজস্ব ভাষা। এই ভাষাই মহাত্মাজীর আদর্শ ভাষা ছিল।

নিজের মনকে বহুবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি, সুভাষচন্দ্র না হয় সর্বদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উড্ডীয়মান ছিলেন, কিন্তু সাধারণ সৈন্যকে তিনি কি করে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত করলেন? যে উত্তর শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছি, সেটা ঠিক কি না জানি না; আমার মনে হয়, সুভাষচন্দ্র শুদ্ধ মাত্র সাম্প্রদায়িকতা দূর করার জন্য কখনো কোমর বেঁধে আসরে নামেন নি। আমার মনে হয়, সুভাষচন্দ্র এমন এক বৃহত্তর জাজ্বল্যমান আদর্শ জনগণের সম্মুখে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন, এবং তার চেয়েও বড় কথা, এমন এক সর্বজনগ্রহণীয় বীরজনকাম্য পন্থা দেখাতে পেরেছিলেন যে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিখ সকলেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র বলছেন, 'আগুন লেগেছে, চল আগুন নেভাই, এই আমার হাতে জল। তোমরাও জল নিয়ে এসো।' সুভাষচন্দ্র কিন্তু এ কথা বলছেন না, 'আগুন নেভাতে হলে হিন্দু-মুসলমানকে প্রথম এক হতে হবে, তারপর আগুন নেভাতে হবে। এস প্রথমে মিটিং করি, প্যাক্ট বানাই, শিলমোহর লাগাই, তারপর স্বরাজ।'

বৃহত্তর আদর্শের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করেছে,—তা সে ব্যক্তিগত স্বার্থই হোক আর সাম্প্রদায়িক স্বার্থই হোক—এ তো কিছু অভূতপূর্ব জিনিস নয়। স্বীকার করি এ জিনিস বিরল। তাই এ রকম আদর্শ দেদীপ্যমান করতে পারেন অতি অল্প লোকই, তাই সুভাষচন্দ্রের মত নেতা বিরল।

দ্বিতীয় যে গজদন্ত আমি অনুভব করতে পেরেছি, সেটি এই :—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি তিনজন নেতা স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করে

দেশোদ্ধারের জন্য মার্কিন-ইংরেজের শত্রুপক্ষকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম জেরুজালেমের গ্র্যান্ডমুফতী এবং দ্বিতীয় ইরাকের আবদুর রশীদ। এঁদের দুজনই আপন আপন দেশের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের নেতাজী। তিনি ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান নেতা ছিলেন না।

তিনজনই কপর্দকহীন, তিনজনই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন আপন আপন যশ এবং চরিত্রবল। প্রথম দুজনের স্বজাতি ছিল উত্তর আফ্রিকায়, অথচ শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এঁদের কেউই কোনো সৈন্যবাহিনী গঠন করে তুনিসিয়া আলজেরিয়ায় ইংরেজের সঙ্গে লড়তে পারলেন না; শুধু তাই নয়, জর্মন রমেল যখন উত্তর আফ্রিকায় বিজয় অভিযানে বেরুলেন, তখন এঁদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবারও প্রয়োজন তিনি অনুভব করলেন না। এঁদের কেউই জর্মন সরকারকে আপন ব্যক্তিত্ব দিয়ে অভিভূত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁদের গতি হল আর পাঁচজনের মত ইতালী থেকে বেতারযোগে আরবীতে বক্তৃতা দিয়ে 'প্রোপাগ্যান্ডা' করার।

অথচ, পশ্য, পশ্য সুভাষচন্দ্র কি অলৌকিক কর্ম সমাধান করলেন। স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণ করে, ইংরেজের 'গর্ব ভারতীয় সৈন্যদের' এক করে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। বর্মা-মালয়ের হাজার হাজার ভারতবাসী সর্বস্ব তাঁর হাতে তুলে দিল, স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রাণ দেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

আমরা জানি, জাপান চেয়েছিল সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সৈন্যগণ যেন জাপানী ঝান্ডার নীচে দাঁড়িয়ে লড়েন (মুফতী এবং আবদুর রশীদ জর্মনীকে সে সুযোগ দিতেও বাধ্য করাতে পারেন নি)। সুভাষচন্দ্র কবুল জবাব দিয়ে বলেছিলেন, "আমি আজাদ হিন্দ ও তার ফৌজের নেতা। আমার রাষ্ট্র নির্বাসনে বটে, কিন্তু সে-রাষ্ট্র স্বাধীন এবং সার্বভৌম! যদি চাও, তবে সে রাষ্ট্রকে স্বীকার করার গৌরব তোমরা অর্জন করতে পারো। যদি ইচ্ছা হয়, তবে অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থ দিতে পারো—এক স্বাধীন রাষ্ট্র যে রকম অন্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে মিত্রভাবে ধার দেয়, কিন্তু আমি কোনো ভিক্ষা চাই না এবং আমার সৈন্যগণ 'আজাদ হিন্দ' ভিন্ন অন্য কোনো রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে যুদ্ধ করবে না।"

এই ইন্দ্রজাল কি করে সম্ভব হল? সুভাষচন্দ্রের আত্মাভিমান যেমন তাঁকে বাঁচিয়েছিল জাপানের বশ্যতা না করা থেকে, তেমনি তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে জাপান তাঁর কথামত চলতে বাধ্য হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আরো কত গুণ, কত কূটবুদ্ধি, কত দুঃসাহস, কত নির্বিকার ধৈর্য, কত চরিত্রবলের প্রয়োজন হয়েছিল, আমাদের মত সাধারণ লোক কি তার কল্পনাও করতে পারে।

কপর্দকহীন, সামর্থ্যসম্বলহীন সুভাষচন্দ্র টোকিয়োতে একা দাঁড়িয়ে—প্রথম দেখি এই ছবি। তারপর দেখি, সেই সুভাষচন্দ্র নেতাজীরূপে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়িয়ে, ভারতেরই এক কোণে।

যতই বিশ্লেষণ করি না কেন, এই দুই ছবির মাঝখানের পর্যায়গুলো ইন্দ্রজাল

—ভানুমতীই থেকে যায়। এ যুগে না জন্মে এ কাহিনী ইতিহাসে পড়লে কখনই বিশ্বাস করতুম না।

"জিন্দাবাদ নেতাজী"।

রোগক্ষয়—শিক্ষালাভ

মানুষ যেমন বিষের ধুঁয়ো এটম বম বানিয়ে তার আপন ভাইকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে মারতে শিখেছে—ঠিক তেমনি এমন মানুষেরও অভাব নেই যাঁরা মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য সমস্ত কল্পনাশক্তি, সর্বশেষ রক্তবিন্দু ক্ষয় করতে প্রস্তুত আছেন। কেন জানিনে, আজ হঠাৎ, এঁদেরই একজনের কথা মনে পড়লো। এই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের নাম মসিয়ো লুই ভোতিয়ে।

আমি তখন জিনীভায়। এক অচেনা ভদ্রলোক এসে আমার সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করলেন, লেজাঁয় তাঁর যক্ষ্মারোগীর সানাটরিয়ামটি আমি যদি দেখতে যাই তবে তিনি অত্যন্ত খুশী হবেন। ফ্রান্স, জর্মনি, সুইটজারল্যাণ্ডে বিস্তর সানাটরিয়া দেখেছি, সর্বত্রই সব গুণীর মুখে একই কথা, 'যক্ষ্মার বিশেষ কোনো চিকিৎসা নেই, তবে রোগী যদি মনস্থির করে ফেলে যে, যমকে চোখের জলে নাকের জলে না করা পর্যন্ত সে মরবে না, অর্থাৎ বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে হিম্মৎ নামক অস্ত্রখানি দিয়ে তার সঙ্গে লড়াই দেবেই দেবে, তবে হয়ত, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই সে বীরকে বাঁচাবার একটা চেষ্টা করাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই।'

আমি ডক্টর ভোতিয়েকে এ-কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি ভারী খুশী হলেন। বললেন, 'আপনি যখন এ তত্ত্বটা জানেন তখন আপনারই বিশেষ করে লেজাঁতে আসা উচিত।' তবু আমার যেতে ইচ্ছা করছিল না; কারণ যক্ষ্মার হাসপাতাল দেখা কিছুমাত্র আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। কিন্তু ভোতিয়ে সেই শ্রেণীর লোক যাঁরা খানিকটে হেসে, খানিকটে যুক্তিতর্ক দিয়ে, খানিকটে অনুনয়-বিনয় করে গররাজি লোককে নিমরাজি নিজের পায়ে পটিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারেন। আমি খানিকটে ধস্তাধস্তি করেছিলুম, কিন্তু তখন যদি জানতুম যে ভোতিয়ে মুস্‌সোলীন এবং লয়েড জর্জের কাছ থেকে আপন হাসপাতালের জন্য টাকা বাগাতে সমর্থ হয়েছেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপত্তি না করে সুবোধ ছেলেটির মত সুড়সুড় করে লেজাঁ চলে যেতুম।

লেজাঁ যেতে হয় চেন-রেলওয়ে ধরে। এমনই ভয়ংকর খাড়া পাহাড়ের উপর যক্ষ্মা সানাটরিয়ামগুলো বানানো হয়েছে যে সাধারণ ট্রেন, এমন কি মোটরও সেখানে পেঁছিতে পারে না।

হোটেল আছে; কিন্তু যখন নিতান্ত এসেই গিয়েছি তখন সানাটরিয়ামের ভিতর থাকলেই তো দেখতে পাবো বেশী।

মসিয়ো ভোতিয়ে, মাদাম, এমন কি বাচ্চা দুটো পর্যন্ত আমাকে দিল-খোলা অভ্যর্থনা জানালেন। বাচ্চা দুটোর বয়স ছয় আর আট। এদের জন্ম হয়েছে

এই সানাটরিয়ামেই ! তারা সুস্থ। শ'খানেক যক্ষ্মারোগীর সঙ্গে তারা খায়-দায় খেলাধুলা গল্পগুজব করে—বাপ-মা'র তাতে কোনো ভয় নেই। আমিই তাহলে ডরাব কেন ?

মসিয়ো ভোতিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, যক্ষ্মা রোগটা ছেলেছোকরাদেরই হয় বেশি। বরং এ রোগটার সবচেয়ে বড় ডেরা খাটানো রয়েছে কলেজে কলেজে। কলেজের ছোকরারা এ রোগে মরেও সবচেয়ে বেশী। আপেক্ষাকৃত বয়স্ক রোগী কিংবা নিতান্ত বাচ্চাকে বাঁচানো অনেক সহজ।

'তার প্রধান,—প্রধান কেন, একমাত্র কারণ, যক্ষ্মা হলেই তাদের পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়। তারা তখন ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখে। ভাবে, পড়াশোনা যদি নাই করতে পারলুম তবে দু'পাঁচ বৎসর পরে সেরে গিয়েই বা করব কি ? খাবো কি ? সংসারই বা পাতবো কি দিয়ে ?

'তাই তারা রোগের সঙ্গে লড়বার আর কোনো প্রয়োজন দেখতে পায় না, সব হিম্মৎ হারিয়ে ফেলে, এগিয়ে মৃত্যুর হাতে আপন জানটি ভেট দেয়।'

মসিয়ো ভোতিয়ে বললেন, 'যবে থেকে আমি যক্ষ্মা রোগ নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছি তখন থেকেই আমি কাজে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে, অবসর সময়ে অহরহ ভেবেছি এর কোনো প্রতিকার করা যায় কিনা ? শেষ পর্যন্ত আমি যে প্রতিকার আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি তারই ভিতরে আজ আপনি আমি বসে কথা বলছি—তার নাম 'সানাটরিয়া ইউনিভের্সিতের', অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় আরোগ্যায়তন'।

'এখানে শুদ্ধমাত্র কলেজের ছেলেমেয়েদের নেওয়া হয়। এবং জিনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের বন্দোবস্ত যেন আমাদের রোগীদের টার্ম হিসেবে নেওয়া হয় অর্থাৎ এরা জিনীভায় ক্লাস না করে ক্লাস করছে এই সানাটরিয়ামে। এরা এখানেই পড়াশোনা করে, সুইট্জারল্যাণ্ডের সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপকরা এখানে এসে মাঝে মাঝে লেকচার দিয়ে যান, তাছাড়া যক্ষ্মাবৈরী বহু নিমন্ত্রিত রবাহূত গুণী এখানে এসে দু'দশ দিন থেকে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় নানাপ্রকারে সাহায্য করে যান।

'বুঝতেই পারছেন, যে-সব বিষয় নিলে ভয়ঙ্কর বেশী খাটতে হয়, সেগুলোর ব্যবস্থা এখানে নেই। তাই নিয়ে ছেলেমেয়েরাও বেশী কান্নাকাটি করে না, তারা জানে, সে ধরনের পড়াশোনা করলে তাদের শরীর কখনো সারবে না। তারা খুশি, কোনো কিছু একটা নিয়ে পাশ দিতে পারলেই ; কাজেই বিজ্ঞানের ছেলে দর্শন নিতে আপত্তি করে না, ইঞ্জিনিয়ারিঙের ছেলে ইতিহাস উৎসাহের সঙ্গেই পড়ে।

'অবশ্য স্বাথ্যের অবস্থার উপর পড়াশোনার মেকদার নির্ভর করে। আমাদের সব সময় কড়া নজর, কেউ যেন বড্ড বেশী না খাটে। কিছুদিন থাকার পর রোগীরাও তত্ত্বটা বুঝে ফেলে, আর নূতন রোগীদের ধমক দিয়ে ব্যাপারটা তাদের কাছে জলের মত তরল করে দেয়। আমাকে তো আজকাল

এ-নিয়ে বিলকুল মাথা ঘামাতে হয় না। ওদের চিকিৎসার দিকে এখন আমি আরো বেশী সময় দিতে পারি।'

একটুখানি চোখ টিপে মুচকি হেসে বললেন, 'পড়াশোনা বিশেষ হয় না, সে তো বুঝতেই পারছেন। তা নাই বা হল। ছেলেমেয়েরা সাহস তো পায় বেঁচে থাকবার, সেইটেই হল আসল কথা। জিনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ও আমার কলটা বেশ বুঝতে পেরেছেন, আমিই তাদের খোলাখুলি বলে রেখেছি. এখানে মধ্যযামিনীর তৈল ক্ষয় নিষিদ্ধ, বেশী পড়াশোনা এখানে হতেই পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা তো আর হৃদয়হীন পাষাণ নন ; এখান থেকে যারা পরীক্ষা দেয়, তাদের প্রতি তাঁরা সদয়, আর যারা সেরে উঠে বাকী টার্মগুলো জিনীভায় কাটায় তাদের প্রতিও মোলায়েম ব্যবহার করেন।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কিন্তু টাকা পাই কোথায়? অঢেল টাকার দরকার। আমি পনেরো বছর ধরে তামাম ইয়োরোপ চষে বেড়াচ্ছি টাকার জন্য। মুস্‌সোলীনি, লয়েড জর্জ থেকে আরম্ভ করে যেখানে যে আমাকে সামান্যতম সাহায্য করতে পারে তারই দরজায় হ্যাট পেতে ভিক্ষা মেঙেছি।

'এখন আমার ইচ্ছা এ-প্রতিষ্ঠানটিকে ইণ্টারনেশলাল—সার্বজনীন সার্বভৌমিক করার। ভারতবর্ষ থেকে যদি রোগী ছাত্র আসে তবে তার জন্য যেন এখানে আমি ব্যবস্থা করতে পারি, সেও যেন নিরাময় হয়, সঙ্গে সঙ্গে জিনীভা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নিয়ে ফিরতে পারে। আপনাদের দেশে তো রাজা মহারাজদের অনেক টাকা— দানখয়রাতও তাঁরা করেন শুনেছি।'

আমি মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, 'এককালে রাজ-রাজড়ারা বিস্তর দান-ধ্যান করতেন এ-কথা সত্যি, আজকালও যে একেবারেই নেই সে-কথা আমি বলব না। আপনি যদি স্বয়ং ভারতবর্ষে আসেন তবে একটা চেষ্টা দিয়ে দেখতে পারি। আমার দ্বারা যোগসূত্র স্থাপনের যেটুকু সামান্য সাহায্য সম্ভবপর—'

ডক্টর ভোতিয়ে আমার দু'খানা হাত চেপে ধরে নীরবে আমার চোখের দিকে সকৃতজ্ঞ নয়নে তাকিয়ে রইলেন।

আমি দেশে ফিরে এলুম! তারপর লেগে গেল ১৯৩৯-এর লড়াই। সুইট্‌জারল্যাণ্ড ছোট্ট দেশ। সীমান্ত রক্ষার জন্য ভোতিয়ের মত ডাক্তারকে উর্দি পরে ব্যারাকে ঢুকতে হল—অবশ্য ডাক্তারের উর্দি। কিন্তু তাঁর এ-দেশে আসাটা আর হয়ে উঠল না।

* * *

মসিয়ো লুই ভোতিয়ে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের লেজাঁ নামক স্থানে যে 'আরোগ্যায়তন বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেখানে যক্ষ্মা সারানোর সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শেখানোর অভিনব সমন্বয় বহু সুইট্‌জারল্যাণ্ডবাসীর হৃদয়মন আকৃষ্ট করেছে। তাঁরা অকৃপণ হস্তে এ-প্রতিষ্ঠানে অর্থদান করেছেন এবং তাঁদেরও ইচ্ছা এ-প্রতিষ্ঠানটি ক্রমে ক্রমে বিশ্বজনের সম্পদ হয়ে উঠুক। কিন্তু উপস্থিত জাতীয়তাবাদ নামে যে বর্বরতা পৃথিবীকে শতধা বিভক্ত করে

দিচ্ছে, তার সামনে মসিয়ো ভোতিয়ে নিরুপায়। তাই আমার বিশ্বাস, যতদিন সুইট্জারল্যাণ্ডে বিশ্বকল্যাণের জন্য সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা না হয়, ততদিন এ-দেশে আমাদেরও চুপ করে বসে থাকা অনুচিত হবে। লেজাঁতে যে প্রতিষ্ঠান সম্ভবপর হয়েছে, এদেশেই বা তা হবে না কেন? বরঞ্চ এদেশে তার প্রয়োজন অনেক বেশী; কারণ এদেশের ছাত্র-সমাজে যক্ষ্মারোগের যে প্রসার তার সঙ্গে অন্য কোন দেশেরই তুলনা হয় না। অস্মদ্দেশীয় যক্ষ্মাবৈরী সজ্জন সম্প্রদায় আশা করি কথাটা ভেবে দেখবেন।

কিন্তু এ-হেন গুরুতর বিষয় নিয়ে মাদৃশ অর্বাচীন জনের অত্যধিক বাগাড়ম্বর অশোভনীয়। আমার উচিত, যোগাযোগের ফলে আমার যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছে সেইটে পাঁচজনকে শুনিয়ে দেওয়া। তারপর কে কি করল না করল তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

লেজাঁয় যক্ষ্মারোগের জন্য কি চিকিৎসা করা হয়, সে সম্বন্ধে সালঙ্কার বিবৃতি দেবার প্রয়োজন নেই। দক্ষিণ ভারতের মদনপল্লীর 'আরোগ্য-বরমে' যে-সব ব্যবস্থা আছে, সেগুলো তো আছেই তার উপর লেজাঁ এবং ডাভোসের অন্যান্য মামুলী সানাটরিয়াতে যক্ষ্মারোগ বাবদে যে-সব গবেষণা অষ্টপ্রহর করা হচ্ছে, তার ফলও মসিয়ো ভোতিয়ে অহরহ পাচ্ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান। এবং তার এক প্রধান অঙ্গ নানা দেশের নানা গুণীকে লেজাঁতে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করা। তার জন্য ভোতিয়ের প্রতিষ্ঠানে একটি চমৎকার লেকচার থিয়েটার আছে। অন্যান্য সানাটরিয়াতে এ রকম হলের প্রয়োজন হয় না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি লেজাঁ পেঁছিবার ঠিক কয়েকদিন আগে দু-তিনজন বড় বড় পণ্ডিতের গুরু গুরু ভাষণের গুরুভোজনের ফলে ছেলেমেয়েরা ঈষৎ কাতর হয়ে পড়েছিল! তাই বোধ করি, মসিয়ো ভোতিয়ে একটা জব্বর রকমের জোলাপের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মসিয়ো ভোতিয়ে আমাকে সোজাসুজি বললেন, 'আপনি একটা লেকচার দিন। জর্মন কিংবা ফ্রেঞ্চ, যে-কোনো ভাষায়!'

আমি বললুম, 'আপনি যদিও জাতে সুইস, আপনার মাতৃভাষা ফরাসী এবং আপনি ফরাসী ঐতিহ্যে গড়ে-ওঠা বিদগ্ধজন। কাজেই আপনিও নেপোলিয়নের মত 'অসম্ভব' কথাটায় বিশ্বাস করেন না এবং তাই আপনার পক্ষে এ অনুরোধ করাটা 'অসম্ভব' নয়; আমি কিন্তু ফরাসী নয়, আমি 'অসম্ভব' কথাটা জানি এবং মানি। আমার পক্ষে বক্তৃতা দেওয়া অসম্ভব।'

এগারো বৎসর হয়ে গিয়েছে, সম্পূর্ণ কথোপকথনটা আমার আজ আর মনে নেই। তবে চোখ বন্ধ করলে যে ছবিটি এখনো মনের ভিতর দেখতে পাই, তাতে আছে—এক বিরাট ফ্রাঙ্কেনস্টাইন যেন আমার দিকে দু'বাহু বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে আর আমি ক্রমেই পিছু হটে হটে শেষটায় দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আর পিছু হটবার জায়গা নেই। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দু'হাত আমার গলা টিপে ধরেছে। হাত দুখানি বলছে,

'এতগুলো রোগীকে আপনি নিরাশ করবেন ?'

আমি অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিলুম,

'পড়েছি যবনের হাতে
খানা খেতে হবে সাথে।'

* * *

ঝট্‌পট্‌ ইশ্‌তিহার বেরিয়ে গেল 'ভারতীয় অমুক কাল সন্ধ্যায় লেজাঁর 'সানতরিয়াঁ ইউনিভের্সিতের সুইসে' একখানা ভাষণ দেবেন। বিষয়……। লেজাঁর তাবৎ সানাতরিয়াঁর অধিবাসিবৃন্দকে সাদর নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে।' অর্থাৎ ভোতিয়ে সাহেবের প্রতিষ্ঠানের পাঁচজন তো আসবেনই, অন্যান্য সানাতরিয়াঁর আরো বহু দুশ্‌মনকে ডাকা হয়েছে আমার মুখোশ খসাবার জন্য—কিন্তু ধর্ম সাক্ষী, আমি অনেক মুখোশ পরেছি বটে, পাণ্ডিত্যের মুখোশ কখনো পরি নি।

ভোতিয়ে বললেন, 'চলুন, হলটার ব্যবস্থা কি রকম হল দেখবেন।'

লোকটা নিশ্চয়ই স্যাডিস্ট। এই যে সামনে পুজো আসছে, আমরা তো কখনো বলির মোষটাকে হাড়িকাঠ দেখিয়ে চ্যাটাস্‌ চ্যাটাস্‌ করে ঠোঁট চাটিনে।

গিয়ে দেখি মধ্যিখানে বেশ খানিকটে জায়গা ফাঁকা রেখে চতুর্দিকে চেয়ার বেঞ্চি পাতা হয়েছে। তবে কি আমাকে ওখানে ফেলে জবাই করা হবে—আমার ছট্‌ফটানির জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে ? কি হবে বৃথা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ? গর্দিশ, গর্দিশ, সবই কপালের গর্দিশ।

ভোতিয়ে ব্যবস্থাটা দেখে চ্যাটাস্‌ চ্যাটাস্‌ করলেন, অদৃশ্য সাবানে হাত দুটো কচলালেন। বুঝলুম, আমার অনুমান ভুল নয়। জবাইটা জব্‌বর ধরনেরই হবে।

ফ্রম থর্ন টু থর্ন অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় ভোতিয়ে আমাকে সেই হলে নিয়ে ঢোকালেন।

দেখি ফাঁকা জায়গাটা ভরে গিয়েছে বিস্তর হুইল চেয়ারে। যে-সব রোগীর পায়ের হাড়ে যক্ষ্মা অথবা যাদের নড়াচড়া করা বারণ, তাদের আনা হয়েছে হুইল চেয়ারে করে। জন দুই শুয়ে আছে লম্বা লম্বা কোঁচ সোফায়। পরে জানলুম, যারা নিতান্তই খাট ছাড়তে পারে না তাদের জন্য ঘরে ঘরে 'ইয়ার ফোনে'র ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একজন দেখি হুইল চেয়ারে বসে পাইপ টানছে। তখন আমার গর্দানে ঘি মালিস করা হচ্ছে—অর্থাৎ কে যেন যা-তা আবোল-তাবোল বকে আমার পরিচয় দিচ্ছে। ভোতিয়ে আমার পাশে বসে—পাছে আমি শেষ মুহূর্তে পালাবার চেষ্টা করি। কানে কানে জিজ্ঞেস করলুম, 'পাইপ সিগরেট খাওয়া যক্ষ্মারোগীদের বারণ নয় ?' ভোতিয়ে বললেন, 'ভিতরে তামাক না থাকলে নিশ্চয়ই বারণ নয়'। আমি বললুম, 'অর্থাৎ ?' অর্থাৎ বেচারীর যক্ষ্মা হওয়ার পূর্বে সে দিনরাত পাইপ টানত! অভ্যাসটা সম্পূর্ণ ছাড়তে পারে নি বলে এখন খালি-পাইপ কামড়ায়। ধুঁয়ো বেরুচ্ছে না বলে দাঁত কিড়িমিড়ি খায়, আর হরেদরে প্রতি মাসে গোটা সাতেক ভাঙে। কিন্তু ছেলেটা পাইপ বাবদে জউরি। "ব্রায়ার" ছাড়া

অন্য কোনো পাইপ চিবোতে রাজী হয় না।'

আপনি ভাবছেন, শ্রোতারা যক্ষ্মারোগী, তাই তাদের বিবর্ণ বিশীর্ণ মুখচোখ। আদপেই না। আপেলের মত লাল গাল প্রায় সব্বায়ের, চোখে মুখে উৎসাহ আর উত্তেজনা। যার দিকে তাকাই সে-ই যেন আমায় হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে নিচ্ছে, সবাই যেন বলছে, 'কি ভয় তোমার ; এত দূর দেশ থেকে এসেছো, যা-ই বলো না কেন আমরা কান পেতে শুনবো।'

তবু আমি মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করলুম আমাকে ত্রাণ করার জন্য।

তারপর কি হল ?

তারপর কি হল ? ভয়ে আমার হাত-পা পেটের ভিতর সেঁধিয়ে গিয়েছে ; আর আজ যদি আপনাদেব কাছে স্বীকারও করি যে তারা বক্তৃতা-শেষে আমার দিকে পচা ডিম আর পচা টমাটো ছুঁড়েছিল, তাহলেও আপনাদের চারখানা হাত গজাবে না।

আমি কি বলেছিলুম ?

সে বকবকানি আপনারা তো প্রতি হপ্তায় শোনেন। নূতন করে বলে আর কি লাভ ?

ইস্কিলাস— শেলি—স্পিটলার

বিদ্রোহী মানুষকে সমাজের কড়া বাঁধন মেনে নেবার জন্য গ্রীক নাট্যকার ইস্কিলাস যে নাটকখানি লেখেন তার নাম প্রমিথিয়ুস বাউন্ড—শৃঙ্খলবদ্ধ প্রমিথিয়ুস। ইস্কিলাস ইচ্ছে করেই নাটকের পাত্র-পাত্রী দেবসমাজ থেকে বেছে নিয়েছিলেন। ভাবখানা অনেকটা এই :—খুদ দেবতারাই যখন নিয়ম কানুন না মেনে চলতে পারেন না তখন তুমি আমি কোন্ ছার। নাটকের মূল গল্প হচ্ছে : প্রমিথিয়ুস দেবতাদের পরম যত্নে লুকিয়ে-রাখা সাত-রাজার-ধন-মাণিক অগ্নি জিনিসটি চুরি করে মানুষের হাতে তুলে ধরেন, তাই দিয়ে মানব-সভ্যতা গড়ে ওঠে। দেবরাজ জুপিটার ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে প্রমিথিয়ুসকে পাহাড়ের গায়ে পেরেক পুঁতে বেঁধে রাখলেন, শকুনি দিয়ে বুকের কলিজা, চোখের পাতা খাওয়ালেন, যাতে করে প্রমিথিয়ুস আপন পাপ স্বীকার করে সোজা রাস্তায় চলেন। প্রমিথিয়ুস সে নিপীড়ন সহ্য না করতে পেরে শেষটায় হার মানলেন। জুপিটার খুশি, ইস্কিলাস আরো বেশী খুশী—স্বর্গরাজ্যে ধর্মরাজ্যে পরিণত হল।

আমাদের কবিগুরু রামায়ণে এরকম কোনো ধর্মনীতি প্রচার করতে চেয়েছিলেন কি না জানিনে কিন্তু সেখানেও রাবণকে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয়েছিল।

তারপর প্রায় দু'হাজার বছর কেটে গেল। দেবতাদের হুমকির ভয়ে কি গ্রীস, কি ভারতবর্ষ কেউই প্রমিথিয়ুসের মত তাঁদের সামনে মাথা খাড়া করে দাঁড়াতে সাহস পেল না। কিন্তু তবু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, এই দু'হাজার বৎসর ধরে যাদের বুকের কলিজা, চোখের পাতা খাওয়ানো হল,

তারা কি সব সময়ই ভিতরে বাইরে দু'দিকেই আপন 'পাপ' স্বীকার করে নিয়েছিল? তাদের ভিতর কি এমন কেউ ছিল না যে বাইরে ক্ষমা চেয়েছে হয়ত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মরেছে যে দেবতার অনুশাসনই চিরন্তন ধর্ম নয়ঃ যেখানে নিপীড়ন দিয়ে ক্ষমা-ভিক্ষা বের করতে হয় সেখানে নিশ্চয়ই কোনো দুর্বলতা, কোনো ত্রুটি লুকানো রয়েছে।

এই কথাটি জোর গলায় বলবার মত সাহস প্রথম দেখালেন ইংরেজ কবি শেলি। তখনকার দিনে রূঢ়ার্থে ভগবান বলতে যা বোঝাত শেলি সে পুরুষকে অস্বীকার করলেন, আর সেই ভগবানের নামে গড়া তখনকার দিনের সমাজের আইন-কানুন ভাঙতে কসুর করলেন না। ভগবানের পুলিসমেন অর্থাৎ পাদ্রী পুরুতরা তখন শেলির পিছনে জুপিটারের মতনই শকুনি লাগিয়ে দিলেঃ শেলির অনেকখানি কলিজা খাওয়ানো হয়, শেলি অসহ্য যন্ত্রণায় বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করলেন, শেলিরও চোখের পাতার অনেকখানি শকুনির পেটে গিয়েছিল। কিন্তু তবু শেলি হার মানেন নি।

এবং সেই না-মানা অজরামর রূপ নিয়ে বেরল তাঁর নাট্যকাব্য 'প্রমিথিয়ুস আনবাউন্ড'—মুক্ত প্রমিথিয়ুস। শুনেছি, এক জাপানী চিত্রকর নাকি তাঁর বুকের জখমের রক্ত দিয়ে তুলি ভিজিয়ে ভিজিয়ে ছবি আঁকতেন বলে তাঁর ছবি সমস্ত জাপানের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। হয়ত রূপক, হয়ত সত্য; কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, শেলির প্রমিথিয়ুস নাট্য বুকের রক্ত দিয়ে আঁকা। অত্যাচার-জর্জরিত মানবাত্মার তীক্ষ্ণতম চিৎকার, ধর্ম-প্রতিষ্ঠান সমাজবিধির বিরুদ্ধে মানবের গভীরতম হুঙ্কার এ কাব্যে যে রূপ, যে রস পেয়েছে তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত দ্বিতীয় কাব্য তো সহজে খুঁজে পাইনে।

(আর পাঁচজন হয়ত স্বীকার করবেন না, কিন্তু আমার মনে হয় মধুসূদনের রাবণ চরিত্রে যেন আমি খানিকটা সেই সুর শুনতে পাই। কিন্তু হিন্দু সমাজ তো মধুসূদনের উপর কোনো অত্যাচার করে নি—তাঁর তুলনায় হিন্দু ঈশ্বর-চন্দ্রকে তো অনেক বেশী কটুবাক্য শুনতে হয়েছে। তখনকার দিনের কলকাতার বিদগ্ধ ইতর কোনো সমাজই তো মধুসূদনের পিছনে শকুনির পাল চালিয়ে দেয় নি। তবু হয়তো হৃদ্যতার অভাব দেখতে পেয়েছিলেন এবং হয়তো মনে মনে আপন সনাতন ধর্ম বর্জন সম্বন্ধে ঈষৎ বিবেকদংশনে কাতর হয়েছিলেন। তাই বোধ হয় তিনি অন্য চরিত্র না নিয়ে রাবণকে বেছে নিয়েছিলেন, অর্থাৎ রাবণের যে গোড়ার দিকে খানিকটা দোষ আছে একথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাই হয়ত প্রমিথিয়ুস ও রাবণ এক পাত্র নয়। শেলির প্রমিথিয়ুস বলে, আমি কোন দোষ করিনি। মধুসূদনের রাবণ বলে, 'একবার দোষ করেছিলুম বলেই কি আমাকে বিনষ্ট করার জন্য দেবনরবানর সবাই একজোট হয়ে সর্ব ধর্ম সর্ব ক্ষাত্রনীতি বিসর্জন দেবে?')

তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধর্মের বাঁধন ঢিলে হয়ে গেল, এমন কি বড় বড় শহরে সমাজের তিরস্কারও গাড়িঘোড়ার শব্দের নীচে চাপা পড়ে গেল। প্যারিস তো এমন জায়গায় গিয়ে পেঁছিল যে, সেখানে যে শুধু সমস্ত পৃথিবীর

মুক্তিকামী নর-নারী সম্মিলিত হল তাই নয়, আধা-পাগল বদ্ধপাগল এমন সব চিৎকার কলাবৎকে প্যারিস সয়ে নিল যাঁরা আপন দেশে থাকলে আর কিছু না হোক অন্ততঃ পাগলা গারদের ভিতরে জীবনের বেশীর ভাগ কাটাতেন।

কিন্তু এ সব মুক্তির বদলে মানুষ তখন আরেক দেবতার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। অর্থের এবং সঙ্ঘের অত্যাচার।

না খেয়ে মানুষ যে পূর্বে কখনো মরে নি একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এবারে কলকারখানার জোরে, মানুষের পয়সা কামাবার হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে যে প্রতিষ্ঠান যে সঙ্ঘ গড়ে উঠল তার অত্যাচার দেশ-বিদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল। লুণ্ঠন যে আগে ছিল না তা নয়, কিন্তু এখন সাম্রাজ্যবাদের নামে যে শোষণ আরম্ভ হল তার শেষ নেই। চেঙ্গিস নাদির আট্টিলা আসত দু'দিনের তরে; কিন্তু এখন যে পাদ্রী কামান রাজপুরুষ বণিক পুলিস আসতে লাগল তার আর অন্ত নেই। তাদের শোষণ দিনযামিনী, সায়ং প্রাতঃ, শিশির বসন্ত, যুগ যুগ ধরে। জমিদার ব্যারন যে সুন্দরী ধরে নিয়ে যেত সে তো অজানা নয়। কিন্তু এখন বড় বড় দোকানের চাকরিতে তরুণীদের আর নিস্তার নেই। বড় সায়েবদের বিলাস লালসায় যে নারীমেধ যজ্ঞ জ্বলে তার ইন্ধন অষ্টপ্রহর দেদীপ্যমান রাখবার জন্য আর কোনো তরুণীর বসনভূষণ বাঁচিয়ে রাখবার উপায় নেই।

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহাকাব্য রচনা করলেন সুইট্জারল্যান্ডের মহাপুরুষ কার্ল স্পিটলার। সে কাব্যের নাম প্রমেটয়েস উন্ট এপিমেটয়েস (Prometheus und Epimetheus)। এ কাব্যের সঙ্গে তুলনা দিতে পারি এমন আর কোনো কাব্য আমার জানা নেই। গুরুগম্ভীর গদ্যচ্ছন্দে লেখা সে কাব্য, পদ্যের সর্বোচ্চ শিখরে জ্যোতিষ্মান ভাস্করের ন্যায় সে গদ্য। এ গদ্য ছন্দ পাই উপনিষদ, বাইবেল এবং কুরানে। এবং উপনিষদ, বাইবেল, কুরানের অনুবাদ যে-রকম অসম্ভব, এ কাব্যের অনুবাদও মানুষের সাধ্যের বাইরে। এ-কাব্য রচনা করে স্পিটলার নোবেল প্রাইজ পান, তৎসত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এ-কাব্যের অনুবাদ হয় নি।

স্পিটলার যে অত্যাচার অবিচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রমিথিয়ুসের কণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, সে অত্যাচার ইতিমধ্যে আরও রুদ্ররূপ ধারণ করেছে। কলকাতা বুকের উপরই তার নব নব তাণ্ডব আমরা দেখতে পাচ্ছি। মানুষের গড় দুর্ভিক্ষ, দৈনন্দিন অনশন, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দৈন্যের দায়ে দেহ বিক্রয়, নিরপরাধের উপর গুলিবর্ষণ, সাম্প্রদায়িক বর্বরতা, মানুষের প্রাণ নিয়ে বিবেকহীন রাজনৈতিকদের ছিনিমিনি খেলা, অরক্ষণীয়ার অন্ধকার ভবিষ্যৎ, অর্থের জোরে সমাজের বুকের উপরে বসে অন্নাভাবে মৃত্যুভয়েকাতর পিতামাতার সম্মুখে তাদের কুলকামিনীর সর্বনাশ, ভ্রূণহত্যা—সবই তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু কই সে বাঙালী স্পিটলার ??

মোপাসাঁ—চেখফ্—রবীন্দ্রনাথ

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অদ্ভুত যোগাযোগের ফলে অনেক তথ্য ও অনেক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। শুনেছি র‍্যোন্‌টগেনের রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কার, ফ্যারাডের বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কার এ রকম যোগাযোগের ফল। সাহিত্যে এ রকম ধারা বড় একটা হয় না। শুধু ছোট গল্পের বেলা তাই হয়েছে। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, র‍্যোন্‌ট্‌গেন ও ফ্যারাডে যদি বহু বৎসর ধরে আপন আপন জ্ঞানচর্চায় নিবিষ্ট না থাকতেন, তাহলে যে-সব যোগাযোগের ফলে রঞ্জনরশ্মি ও বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কার হল সে সব যোগাযোগ বন্ধ্যাই থেকে যেত। ছোট গল্পের বেলাও তাই—মোপাসাঁ যদি সাহিত্য সাধনায় পূর্বের থেকেই নিযুক্ত না থাকতেন, তবে ফ্লবেরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হত।

ফ্লবের যে কি অদ্ভুত সুন্দর ফরাসী লিখে গিয়েছেন, তার বর্ণনা দিতে পারেন শুধু ফ্লবেরই। ভলতেরের পরেই ফ্লবেরের নাম করতে হয় এবং এঁদের মাঝখানের যে-কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক পেলেও বাংলা ভাষা বর্তে যাবে। আর ফ্লবেরের আশা শিকেয় তুলে রাখাই ভালো, তাঁর মত লেখক জন্মাবার পূর্বে এদেশের গঙ্গায় বিস্তর চড়া পড়ে যাবে। তার কারণ এ নয় যে আমাদের দেশে শক্তিমান লেখকের অভাব, বেদনাটা সেখানে নয়, আসল বেদনা হচ্ছে আমাদের লেখকেরা খাটতে রাজী নন। ফ্লবেরের লেখা পড়ার সময় বোঝাই যায় না তার পিছনে কি অসম্ভব পরিশ্রম রয়েছে, কারণ সে পরিশ্রমের উপরে ফ্লবেরকে আরো পরিশ্রম করতে হয়েছে গোড়ার পরিশ্রমটা ঢাকবার জন্য। ভলতেরের সরল স্বচ্ছ শৈলীর প্রশংসা করলে তিনি নাকি করুণ হাসি হেসে বলতেন, 'ফরাসী জাতটা কি আর জানে তাদের কষ্ট বাঁচাবার জন্য আমি নিজে কতটা কষ্ট স্বীকার করি?' ফ্লবের এ কথাটা বললে মানাতো আরো বেশী—তিনি তো শেষটায় সে পরিশ্রম সইতে না পেরে লেখাই ছেড়ে দিলেন।

ধুয়ে মুছে কেচে ইস্ত্রি করে পাট না করা পর্যন্ত ফ্লবের ভাষাকে রেহাই দিতেন না। তাই যখন শাগরেদ মোপাসাঁর ভিতর ফ্লবের গুণের সন্ধান পেলেন তখন মোপাসাঁর লেখার উপর নির্মম র‍্যাঁদা চালাতে আরম্ভ করলেন। আর কী সব অদ্ভুত ফরমায়েশ—দশ লাইনে করুণ বর্ণনা লেখো, পনেরো লাইনে বীররস বাৎলাও, এটা ছিঁড়ে ফেলে দাও, ওটা ছাপিয়ো না—অর্থাৎ ফ্লবের শাগরেদ মোপাসাঁকে ধুয়ে মুছে কেচে তৈরি করে প্রায় পকেটস্থ করে ফেলেছেন, এমন সময় তাঁর ডাক পড়লো সেই লোক থেকে যেখানে রসসৃষ্টি করা যায় বিনা পরিশ্রমে—স্বর্গলোকে পরিশ্রম নেই বলেই মর্তলোকের সৃষ্টি হয়েছিল এ-কথা বাইবেলে লেখা আছে।

এই তালিমের ফলেই ছোট গল্পের সৃষ্টি? মোপাসাঁর পূর্বের লেখকরা কি বর্ণনা, কি চরিত্র-বিশ্লেষণ, কি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সব কিছুই লিখতেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। ছোট গল্প লিখতে হলে যে বাকসংযম দরকার, বিস্তর কথা

অল্প কথায় প্রকাশ করবার যে কেরামতির প্রয়োজন, প্রকাণ্ড আলোটার চতুর্দিক কালো কাপড়ে ঢেকে তার সামনের দিকে পুরু কাঁচ লাগালে যে রশ্মির তীব্রতা বাড়ে সেই জ্ঞান মোপাসাঁর পূর্বে কারো ছিল না, অথবা তাই নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কেউ অনুভব করেন নি। সর্বাঙ্গ বেনারসীতে ঢেকে মুখ থেকে শুধু ঘোমটা সরিয়ে ফিক করে এক ঝলক হেসে সুন্দরী চলে গেল—মোপাসাঁর পূর্বে ফরাসীরা যেন এ-অভিজ্ঞতার কল্পনাই করতে পারেন নি। তাঁদের কায়দাটা কি ছিল সে কথা ফেনিয়ে বলার সাহস আমার নেই—কলকাতা এ সব বাবদে প্যারিসের মত 'উদার' নয়।

এ সব নিছক যোগাযোগের কথা। মোপাসাঁর আপন কৃতিত্ব তবে কোন্‌খানে? গল্পটাকে বিশেষ এক জায়গায় এনে অকস্মাৎ ছেড়ে দেওয়া, এবং সেই অকস্মাৎ ছেড়ে দেওয়াটাই গল্পের সম্পূর্ণতাকে প্রকাশ করল—ইংরিজিতে যাকে বলে 'ক্লাইমেক্‌স্'—এইখানে মোপাসাঁর বিশেষত্ব। মোপাসাঁর পূর্বের ঔপন্যাসিকেরা তাবৎ নায়ক নায়িকাদের জন্য এতটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত না করে উপন্যাস বন্ধ করতেন না। নটে গাছটি তাঁরা এমনি কায়দায় মুড়তেন যে, পাঠকের মনে আর কোনো সন্দেহ থাকত না যে এদের জীবনে আর কিছু ঘটতে পারে না, এরা এখন থেকে 'পুত্র কন্যা লাভ করতঃ পরমানন্দে জীবন যাপন করিল' অথবা 'অনুতাপের তুষানলে তিলে তিলে দগ্ধ হইতে লাগিল'।

ক্লাইমেক্‌স্ আবিষ্কার মোপাসাঁর একান্ত নিজস্ব।

মোপাসাঁর পর বিস্তর লেখক এন্তার ছোট গল্প লিখেছেন, কেউ কেউ মোপাসাঁর চেয়েও ভালো লিখেছেন; কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সব গল্পই মোপাসাঁর ছাঁচে ঢেলে গড়া। মোপাসাঁ যে কাঠামোটি গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই কাঠামোটিতে কোন ফেরফার করার সাহস কারোরই হল না।

চেখফ্‌ই (Chekhov, Tschehoff ইত্যাদি নানা বানানে নামটি লেখা হয়, কিন্তু উচ্চারণ 'চেখফ্') প্রথম এই কাঠামোতে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে ক্লাইমেক্‌স্ বাদ দিয়েও সরেস ছোট গল্প লেখা যায়। শুধু তাই নয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খুব কম ঘটনাই এ রকম ধারা 'বুমস্‌-প্যাঙ' করে সশব্দে ক্লাইমেক্‌সে এসে অরকেস্ট্রা শেষ করে। চেখফের অনেক গল্প ক্লাইমেক্‌সে শেষ হয় সত্য; কিন্তু সেটা গল্পের নিজস্ব প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সব গল্পই যদি পাঠক ক্লাইমেক্‌সের প্রত্যাশা করে করে পড়ে, তবে সেগুলো একঘেয়ে হয়ে যেতে বাধ্য সব কবিতাই তো আর সনেট নয় যে শেষের দুই ছত্রে কবিতার সারাংশ জোর গলায় বলে দেওয়া হবে। তাই চেখফের বহু ক্লাইমেক্‌স্-বর্জিত গল্পের ভারকেন্দ্র এমন ভাবে সমস্ত গল্পে ভাগ করে করে দেওয়া হয়েছে যে, পাঠক রসিয়ে রসিয়ে নিশ্চিন্ত মনে গল্পগুলো পড়তে পারে—ক্লাইমেক্‌সের আচমকা ইলেকট্রিক শকের জন্য নাক কান খাড়া করে থাকতে হয় না।

আর ভাষার দিক দিয়ে চেখফ্ মোপাসাঁকেও ছাড়িয়ে যান। যান। টলস্টয় ফ্লবেরের চেয়ে অনেক বড় স্রষ্টা এবং চেখফ্ যদিও টলস্টয়ের শিষ্য নন তবু তিনি বহু বৎসর ধরে টলস্টয়ের সাহচর্য ও উপদেশ পেয়েছিলেন। টলস্টয় স্বয়ং

গর্কির চেয়ে চেখফ্‌কে পছন্দ করতেন বেশী—তিনি নাকি একবার গর্কিকে বলেছিলেন, চেখফ্‌ মেয়ে হলে তিনি তাঁর কাছে নিশ্চয়ই বিয়ের প্রস্তাব পাড়তেন।

রবীন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের গল্পগুলি বড় ঢিলে। প্রমাণ করা কঠিন, কিন্তু আমার মনে হয়, এই ঢিলে ভাব তাঁর প্রথম কাটাল মোপাসাঁর গল্পের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর। তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্পে মোপাসাঁরই মত ঠাস বুনুনি দেখতে পাওয়া যায়, আর কাঠামোটাও হরেদরে মোপাসাঁর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত লেখক আপন বৈশিষ্ট্য বর্জন করে লিখবেন—তা সে কাঁচা লেখাই হোক আর পাকা লেখাই হোক—সে কথা অনায়াসে অস্বীকার করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গল্প মোপাসাঁ চেখফ্‌ দুজনের গল্পকেই হার মানায় তার গীতিরস দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পটি কেমন যেন সঙ্গীতের কোনো এক রাগে বাঁধা। এখানে সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল রয়েছে। মৃৎশকটিকা, শকুন্তলা, রত্নাবলী নাটক গ্রীক কাঠামাতে ফেলা যায় সত্য; কিন্তু এগুলিতে যে গীতিরস রয়েছে, গ্রীক নাটকে তো নেই—তাই আমরা সংস্কৃত নাটকে যে আনন্দ পাই, গ্রীক নাটকে সেটি পাই নে।

রবীন্দ্রনাথ বিশেষ বয়সে শেলি, কীটসের প্রভাবে পড়েছিলেন সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য, রবীন্দ্রনাথ সে প্রভাব একদিন সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। গল্পের বেলাতেও রবীন্দ্রনাথ একদিন মোপাসাঁর প্রভাব ঝেড়ে ফেলে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকের গল্পগুলিতে কি যেন এক অনির্বচনীয়ের প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। 'মিস্টিক' কথাটাকে সব কিছুই ঢাকা পড়ে যায় বলে শব্দটা ব্যবহার করতে বাধো বাধো ঠেকে; কিন্তু মানব-চরিত্রের আলো-অন্ধকারের আবছায়া আঁকুবাঁকু, মানব-চরিত্রের যে দিক দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চোখে পড়ে না, মানুষকে যে সব সময় তার বাক্য আর আচরণ দিয়েই চেনা যায় না মানুষের সেই দুর্জ্ঞেয় অন্তঃস্তল রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছিলেন আধা-আলোরই ভাষা এবং ভঙ্গী দিয়ে প্রকাশ করতে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ একা, মোপাসাঁ চেখফের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র সেখানে সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্য

বাঙলা সাহিত্যের মত অদ্ভুত এবং বেতালা সাহিত্য পৃথিবীতে কমই আছে। রবীন্দ্রনাথ গান আর কবিতা দিয়ে যে বাঙলা গীতিসাহিত্য রচে গিয়েছেন তার কাছে এসে দাঁড়াতে পারে, এমন গীতিসাহিত্য পৃথিবীতে আর নেই বললেও চলে। মেঘদূতের মত গীতিকাব্য পৃথিবীতে নেই—রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান অনেক স্থলে কালিদাসের মেঘদূতকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিকাব্য দিয়ে বাঙলা সাহিত্যকে যেন একসঙ্গে তেইশটা ডবল প্রমোশন পাইয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পও বিশ্বসাহিত্যের যে-কোন কথাসাহিত্যের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারে। আরো বিস্তার অতুলনীয় সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের কলম দিয়ে বেরিয়েছে, তার উল্লেখ এখানে অবান্তর।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৃষ্টিকার। তাঁর পক্ষে অন্য লেখকের রচনা অনুবাদ করবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এমন কি এ-কথা বললে ভুল বলা হবে না, যেটুকু অনুবাদ তিনি করেছেন তাতে সময় নষ্ট হয়েছে মাত্র। কদম-ফুলের কেশর ছাড়িয়ে লাটু বানিয়ে ছেলেরা জিনিসটাকে কাজে লাগায় বটে, তবু নিষ্কর্মা কদম-ফুলেরই দাম বেশী।

অনুবাদ-চর্চা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশী সময় নষ্ট করেন নি বলেই বোধ করি বাঙলা সাহিত্য অনুবাদের দিক দিয়ে এত হীন। তাই বলছিলুম বাঙলা সাহিত্য বেতালা সাহিত্য ; গীতিকাব্যে যেন যে পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডময় উড়ে বেড়ায় আর অনুবাদ সাহিত্যের বেলা সে যেন এদো কুয়োর ভেতরে খাবি খায়।

অথচ ঊনবিংশ শতকে শেষের দিকে বাঙলা ভাষায় যে অনুবাদ সাহিত্যের রচনা দানা বাঁধতে আরম্ভ করে, তার তুলনায় আজকের দিনে তাকিয়ে দেখি সে দানা দিয়ে মিঠাই মণ্ডা তো হ'লই না, তলানির চিনিটুকু দিয়ে আজ যেন সাহিত্য-সভায় পানসে শরবৎ বিলানো হচ্ছে। গীতিকাব্যে যে সাহিত্য তেইশটে ডবল প্রমোশন পেয়েছিল, অনুবাদে সেই সাহিত্যকেই বাহান্নটা ডিগ্রেডেশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ করতে হলে বিদেশী ভাষা জানার প্রয়োজন। আজকের দিনে কলকাতা শহরে শুধু ফরাসী বই বিক্রয়ের জন্য দোকান হয়েছে—সত্তর বৎসর আগে ছিল না।—তবু আমাদের অনুবাদ-সাহিত্যে যেটুকু শরবৎ আজ বিলোনো হচ্ছে তার আগাগোড়া ইংরিজী থেকে।

অথচ ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ফরাসী সাহিত্যের উত্তম রস-সৃষ্টি বাঙলায় অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। বিংশ শতকেও তিনি এই কর্মে লিপ্ত এবং মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি একাজে ক্ষান্ত দেন নি। ঠিক স্মরণ নেই, তবে খুব সম্ভব লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের বিরাট মারাঠী গীতার অনুবাদই তাঁর শেষ দান।

আশ্চর্য বোধ হয় যে, বাঙালী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভুলে গিয়েছে। সংস্কৃত থেকে তিনি যে সব নাটক অনুবাদ করেছিলেন সেগুলোর কথা আজ থাক। উপস্থিত পিয়ের লোতির একখানা বইয়ের কথা স্মরণ করছি।

পিয়ের লোতির মত লেখক পৃথিবীতে কমই জন্মেছেন। শুদ্ধমাত্র শব্দের জোরে, সম্পূর্ণ অজানা, অদেখা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা গড়ে তোলা যে কি কঠিন কর্ম, তা শুধু তাঁরাই বুঝতে পারবেন, যাঁরা কখনো এ-চেষ্টায় দণ্ডমাত্র কালক্ষেপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করার মত দুর্মতি কোনো বাঙালীর হওয়ার কথা নয়, তাই বলতে আপত্তি নেই যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর অদেখা বা অল্প-দেখা জিনিস নিয়ে কাব্য সৃষ্টি করাটা পছন্দ করতেন

না। সাধারণ বাঙালীর সঙ্গে পাহাড় এবং সমুদ্রের পরিচয় অতি কম—তাই বোধ করি রবীন্দ্রনাথ এ দু'টো জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন যতদূর সম্ভব কম। শীতপ্রধান দেশের পাতা-ঝরা হেমন্ত ঋতু, শুভ্র মল্লিকা বর্ষণের মত বরফ-পাত যে কি দর্শনীয় বস্তু, সিনেমা থেকেও তার খানিকটে আন্দাজ করা যায়, – রবীন্দ্রনাথ এসব দেখেছেন, উপভোগ করেছেন বহুবার ; কিন্তু কোথাও তার বর্ণনা করেছেন বলে তো মনে পড়ে না।

পিয়ের লোতির বৈশিষ্ট্য এইখানেই। তিনি জাপান, তুর্কী, আইসল্যাণ্ড এবং আরও নানাদেশের যে সব ছবি ফরাসী ভাষায় এঁকে দিয়ে গিয়েছেন, সে-সব পড়ে মনে হয় ভাষার সঙ্গীত, বর্ণ, গন্ধ একসঙ্গে মিলে গিয়ে কি করে এই-রূপ রসবস্তু নির্মাণ হতে পারে! মনে হয়, একসঙ্গে যেন পঞ্চেন্দ্রিয় রস গ্রহণ করছে, মনে হয় কারো কলম যদি নিতান্ত অরসিক জনকে দেশ-কাল-পাত্র ভোলাতে সক্ষম হয়, তবে সে কলম পিয়ের লোতির।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লোতি যে বইখানা লিখেছেন তার নাম 'ল্যাঁদ, সাঁজাংলে'। অর্থাৎ 'ভারতবর্ষ, কিন্তু ইংরেজকে বাদ দিয়ে।' অর্থাৎ তিনি ভারতবর্ষের ছবি আঁকতে বসেছেন কিন্তু মনস্থির করে ফেলেছেন যে, এ-দেশের ইংরেজদের সম্বন্ধে তিনি কিছু বলবেন না।

স্বীকার করি, ইংরেজ-বর্জিত-ভারত' ('বসুমতী' কর্তৃক প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য)। 'ল্যাঁদ, সাঁজাংলে'র ঠিক অনুবাদ নয়, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের অনুবাদশশাঙ্কে ঐ একটি মাত্র কলঙ্ক। বাদবাকী পুস্তকখানা অনুবাদ-সাহিত্যে যে কি আশ্চর্য কুতুব-মিনার, তার বর্ণনা দিতে হলে লোতির কলমের প্রয়োজন।

ত্রিবাঙ্কুরে লোতি ভারতীয় সঙ্গীত শুনে বিস্ময়ের উচ্ছ্বাসে সে-সঙ্গীতের বর্ণনাতে কত না স্বর কত না ধ্বনি মিশিয়ে দিয়েছেন ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা সে-স্বর সে ধ্বনি অবিকল বাজিয়ে চলেছে। মাদ্রাজে লোতি ভরত-নাট্যম দেখে ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে মানবহৃদয়ের যত প্রকারের আশা-নৈরাশ্য, ঘৃণা-ক্রোধ, আকুলি-বিকুলি সম্ভব হতে পারে, সব ক'টি প্রকাশ করেছেন কখনো গম্ভীর মেঘমন্দ্রে, কখনো মধুর বীণাঝঙ্কারে, কখনো শব্দ সমন্বয়ের চটুল নৃত্যে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা-বীণা যেন প্রতি মন্দ্র, প্রতি ঝঙ্কার, প্রতি ব্যঞ্জনা ঠিক সেই সুরে রসসৃষ্টি করেছে। ইলোরার স্থাপত্য-ভাস্কর্য লোতিকে বিহ্বল ভয়াতুর করে ফেলেছে, অনির্বচনীয় চিরন্তন সত্তার রসস্বরূপে স্বপ্রকাশ দেখিয়ে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখনী লোতির বিহ্বল ভয়ার্ত হৃদয়ের প্রতি কম্পন প্রতি স্পন্দন ধরে নিয়ে যেন বীণাযন্ত্রের চিকণ কাজের সঙ্গে মৃদঙ্গের নিপুণ বোল মিশিয়ে দিয়েছে।

এরূপ অদ্ভুত সঙ্গত দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের মজলিসে যে অনুবাদ-সাহিত্য আরম্ভ হয়েছিল, আজ তার সমাপ্তি দেখতে পাচ্ছি সস্তা, রগরগে ইংরিজী উপন্যাসের অনুবাদে। খেমটা আর 'ফিলমি গানের' সঙ্গে তার মিতালি ॥

'কলচর'

'পরশুরামে'র কেদার চাটুজ্যেকে বাঘা তাড়া করেছে, ভূত ভয় দেখিয়েছে, হনুমান দাঁত খিচিয়েছে, পুলিস কোর্টের উকীল জেরা করেছে, তবু তিনি ভয় পান নি কিন্তু শেষটায় এক আমেরিকান মেমসায়েবের পাল্লায় পড়ে হিমসিম খেয়ে যান। কেদার চাটুজ্যের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাকে সবিনয় বলতে হবে তাঁর তুলনায় আমি দেশভ্রমণ করেছি অনেক বেশী, কাজেই আমাকে ভয় দেখিয়েছে আরো অনেক বেশী ভূত, অদ্ভুত, নাৎসী, কম্যুনিস্ট, মিশনারী, কলাবৎ, সম্পাদক, দারোয়ান ইত্যাদি কিন্তু তবু যদি তামা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে শপথ কাটতে হয়, তবে বলব আমি সবচেয়ে বেশী ভয় পেয়েছি 'কলচরে'র সামনে।

বাঙলা দেশে 'কলচর' আছে কিনা জানিনে ; যদি বা থাকে তবে আমি নিজে বাঙালী বলে সে জিনিস এড়িয়ে যাবার অন্ধিসন্ধি জানি। কিন্তু বিদেশ-বিভূঁইয়ে হঠাৎ বেমক্কা এ জিনিসের মুখোমুখি হয়ে পড়লে যে কী দারুণ নাভিশ্বাস ওঠে তার বর্ণনা দেবার মত ভাষা এবং শৈলী আমার পেটে নেই।

পশ্চিম ভারতে একবার এই 'কলচর' অথবা 'কলচরড্' সমাজের পাল্লায় পড়েছিলুম। তার মর্মন্তুদ কাহিনী নিবেদন করছি।

এক যুবতীর সঙ্গে কোনো এক চায়ের মজলিসে আলাপ হল। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। সুন্দরী রমণী। প্রত্যাখ্যান করি কি প্রকারে ? তখন যদি জানতুম তিনি আমাকে বাঙালী অতএব 'কলচরড্' ঠাউরে নিমন্ত্রণ করেছেন তাহলে ধর্ম সাক্ষী আমি কেটে পড়তুম। কারণ, আমি 'কলচরড্' নই এবং পূর্বেই বলেছি ও-জিনিসটাকে আমি বড্ড ডরাই।

সুন্দরী মোটর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই বাড়ি খুঁজে বের করার মেহন্নত থেকে রেহাই পেলুম। গাড়ি এসে এক বিপুলায়তন বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বাড়ি বলা হয়ত ভুল হল। সংস্কৃতে খুব সম্ভব এই বস্তুকেই 'প্রাসাদ' বলে।

কিন্তু সে কী অদ্ভুত বিভীষিকা। সাঁচীর স্তূপ, অজন্তার প্রবেশদ্বার, অশোকের স্তম্ভ, মাদুরার মণ্ডপ, তাজের জালির কাজ, জামি মসজিদের আরাবেস্ক্ ভারতবর্ষের তাবৎ সৌন্দর্য সেখানে যেন এক বিরাট তাণ্ডব নৃত্য লাগিয়েছে। যে ফিরিস্তিটা দিলুম সেটা পূর্ণাবয়ব কি না জানি নে এবং এসব স্থাপত্য কলার মর্ম এ অধম জানে না সেটাও সে সবিনয় স্বীকার করে নিচ্ছে। আমি সাহিত্য নিয়ে ঈষৎ নাড়াচাড়া করি, কারণ ঐ একমাত্র জিনিসই মাস্টার অধ্যাপকেরা আমাকে স্কুল-কলেজে ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে কিছুটা শিখিয়েছেন। সাহিত্যের দৃষ্টিবিন্দু দিয়ে তাই যদি সে-প্রাসাদের বর্ণনা দিই তবে বলতে হবে, আমি যেন এক কবিতার সামনে দাঁড়ালুম যার প্রথম লাইন চর্যাপদী, দ্বিতীয় লাইন চণ্ডীদাসী, তৃতীয় লাইন মাইকেলী, চতুর্থ লাইন রঙ্গলালী, পঞ্চম লাইন ঠাকুরী এবং শেষ লাইন নজরুলী। জানি, আজ যদি কেউ এই সব ক'জন মহাজনের শৈলী এবং ভাষা আয়ত্ত ক'রে কাব্য সৃষ্টি করতে

পারেন তবে তিনি কি কালিদাস, কি সেক্সপীয়র, কি গ্যোটে সর্ব যুগের সর্ব কবিরাজকে ছাড়িয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু আমি যে বিভীষিকার সামনে দাঁড়ালুম সে তো তা নয়। এ যেন কেউ কাঁচি দিয়ে নানান কবির লেখা নিয়ে হেথা থেকে দু'ছত্র হোথা থেকে তিন পংক্তি কেটে গঁদ দিয়ে জুড়ে দিয়ে বলছে, 'পশ্য, পশ্য, কী অপূর্ব কবিতা ; এ-কবিতা মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ যে-কোনো কবির লেখাকে হার মানায় কারণ এ-কবিতা দুনিয়ার তাবৎ কবির বারোয়ারী চাঁদা দিয়ে গড়া। বাঁদর হারালেও এখানে খুঁজে পাবে।'

তখনও পালাবার পথ ছিল, কিন্তু সুন্দরীর—যাক্‌গে। না পালাবার অন্য আরেকটা কারণও মজুদ ছিল। এ বিভীষিকা দেখে গাঙ্গুলী মশাই অথবা ক্রামরিশ বীবী পালাবেন, কিন্তু আমি তো 'কলচরড্' নই আমি পালাব কেন ?

ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি লিফ্‌টের সামনে। অপূর্ব সে খাঁচা। এতদিন বাদে আজ আর মনে নেই কোন্ কোন্ শৈলীর ঘুষোঘুষিতে (কোলাকুলিতে নয়) সে লিফ্‌টের চারখানা কাঠের পাট নির্মিত ছিল। প্রত্যেক পাটে অতি সূক্ষ্ম নাজুক, মোলায়েম দারুশিল্প। জয়পুরের মিনা যেন সূক্ষ্মতায় তার কাছে হার মানে।

ভিতরে ঢুকলুম। তখন লক্ষ্য করলুম লিফ্‌টবয় দরজাখানা বন্ধ করল অতিশয় সন্তর্পণে—পাছে কাঠের চিকন কাজে কোনো জখম হয়। কিন্তু ফল হল এই যে লিফ্‌ট আর উড্ডীয়মান হতে চায় না। বয় ধীরে ধীরে চাপ বাড়ায় কিন্তু লিফ্‌ট নড়তে চায় না। তারপর হুস করে বলা নেই কওয়া নেই, লিফ্‌ট উপরের দিক চলল, পক্ষীরাজের বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে হঠাৎ জিন লাগালে সে যে-রকম ধারা আচমকা লম্ফ দিয়ে ওঠে।

তারপর দোতলায় নামবার কথা—লিফ্‌ট সেখানে থামে না। থামলো গিয়ে আচম্বিতে দোতলা আর তেতলার মাঝখানে।

একে ত গাঁয়ের ছেলে, বয়স হওয়ার পর শহরে এসে প্রথম লিফ্‌ট দেখেছি এবং তখনকার দিনে ধুতিকুর্তা পরা থাকলে লিফ্‌ট চড়তে দিত না বলে এ ফাঁড়া থেকে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছি, তার উপর জানি দড়াম করে দরজা বন্ধ না করলে ভালো লিফ্‌টও নড়তে চায় না এবং তার উপর দেখি এই ছোকরা চাকরি যাবার ভয়ে দরজার উপর জোর লাগাতেও রাজী হয় না। এই 'কলচরড্' লিফ্‌টটাকে জখম চোটের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমার প্রাণটা বলি দিতে হবে নাকি ?

আমি তখন হন্যে হয়ে উঠেছি। ধমক দিয়ে বললুম, 'দরজা জোরে বন্ধ করো।'

সে করে না। এই মাগ্‌গীর বাজারে প্রাণের চেয়ে চাকরি বড়। প্রাণ জিনিসটা জন্মে জন্মে বিনা খরচে, বিনা মেহনতে পাওয়া যায় ; কিন্তু চাকরির জন্য বিস্তর বেদরদ বেইজ্জতী সইতে হয়।

আমি আর কি করি ? ধাক্কা দিয়ে ছোঁড়াটাকে পথ থেকে সরিয়ে দরজায় দিলুম বিপুল এক ধাক্কা। হুস করে লিফ্‌ট উঠে গেল তেতলায়। আমি দরজা

খুলে নাবতে যাচ্ছি, বয় চেঁচিয়ে বললো, 'আপনি যাবেন দোতলায়, তেতলায় নয়।' আমি বললুম, 'তুমি যাও চুলোয়।' ছোকরা বাঙলা বোঝে না।

তেতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে নামলুম দোতলায়।

ততক্ষণে লিফ্‌টের ধড়াধড় শব্দ শুনে সুন্দরীর ভাই-বেরাদর দু'একজন সিঁড়ির কাছে জমায়েত হয়ে গিয়েছেন। আমি ছোকরার চাকরি বাঁচাবার জন্য নিজের অপরাধ স্বীকার করলুম। ওঁরা যে-রকম ভাবে আমার দিকে তাকালেন তাতে মনে হল আমি যেন তাজমহলের উপর এটম বম মেরেছি অথবা ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের গলা কেটে ফেলেছি।

'কলচরড্' নই, তাই বলতে পারব না, 'কলচর' দেশ-কাল-পাত্র মেনে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয় কি না। কিন্তু লিফ্‌টের ভিতরকার 'কলচর'কে সম্মান দেখাতে গিয়ে আমি প্রাণটা দিতে রাজী নই। তাই বলছিলুম, আমি 'কলচর' জিনিসটাকে ডরাই।

বর্ষা

কাইরোতে বছরে ক' ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে এতদিন বাদে সে কথা আমার আর স্মরণ নেই। আধা হতে পারে সিকিও হতে পারে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মেঘমুক্ত নীল আকাশ দেখে দেখে আমার তো প্রথমটায় মনে হয়েছিল, এদেশে বুঝি আদপেই বৃষ্টিপাত হয় না। আর গাছপালার কী দুরবস্থা, পাতাগুলোর কী অদ্ভুত চেহারা! সাহারার ধুলো উড়ে এসে চেপে বসেছে পাতাগুলোর গায়ে—সিন্দবাদের কাঁধে যে রকম পাগলা বুড়ো চেপে বসেছিল—সে ধুলা সরানো দুদশটা হৌজের কর্ম নয়। কাফেতে বসে বুলভারের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রায়ই ভাবতুম, এদের কপালে কি কোন প্রকারের মুক্তিস্নান নেই?

সুদানের একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সে বললে, তার দেশে নাকি ষাট বছরের পর একদিন হঠাৎ কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি নেবেছিল। মেয়েরা, কাচ্চাবাচ্চারা, এমন কি গোটা কয়েক জোয়ান মদ্দরা পর্যন্ত হাউমাউ করে কান্নাকাটি জুড়েছিল, 'আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে আমাদের ঘাড়ে ভেঙে পড়লো গো। আমরা যাব কোথায়? কিয়ামতের (মহাপ্রলয়ের) দিন এসে গেছে। সব পাপের তওবা (ক্ষমা-ভিক্ষা) মাঙবার সময় পেলুম না, সবাইকে যেতে হবে নরকে।' গাঁও-বুড়োরা নাকি তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'এতে ভয় পাবার কিছু নেই। আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে না। এ যা নাবছে সে জিনিস জল। এর নাম মৎর্ (অর্থাৎ বৃষ্টি)।' সুদানী ছেলেটি আমায় বুঝিয়ে বললে, 'আরবী ভাষায় মৎর্ (বৃষ্টি) শব্দ আছে; কারণ আরব দেশে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়, কিন্তু সুদানে যে-আরবী ভাষা প্রচলিত সে-ভাষায় মৎর্ শব্দ কখনো ব্যবহৃত হয় নি বলে সে শব্দটি সুদানী মেয়েছেলেদের সম্পূর্ণ

অজানা।

সুদানে যাই হোক। কিন্তু একদিন যখন হঠাৎ কাইরোতে বৃষ্টি নাবল আমি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে কাফে ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। বিরহী যক্ষ যেরকম দুই বাহু প্রসারিত করে উত্তরের বাতাস আলিঙ্গন করেছিল ; আমি ঠিক সেইরকম 'ঝড় নেমে আয়' বেসুরা বেতালা করে গাইলুম আর আমার জোব্বাজাব্বা যে ভিজে কাঁই হল, সে কথা বলাই বাহুল্য।

বৃষ্টি না থামার পূর্বেই ফিরে এলুম পাড়ার কাফেতে। সবাইকে বোঝাবো, বাঙলা দেশে কি রকম অদ্ভুত বর্ষা নামে, তার কি অপূর্ব জৌলুস। দেখি, আড্ডার সদস্যরা কেউ আধভেজা, কেউ ছ'আনা, কেউ দু' আনা। আমাকে দেখা মাত্র সবাই তো মারমার করে তেড়ে এল। আরে, বুঝিয়েই বলো না, কি ব্যাপার, চটছো কেন ?

সবাই এক সঙ্গে কথা কয়। কি মুশকিল! ভাবখানা অনেকটা ;—এই ড্যাম নুইসেন্স বৃষ্টির প্রশংসা আমি বাস্কেল ইণ্ডিয়ান কেন এতদিন ধরে করে আসছি ? আর দ্যাট্ পোয়েট টেগোর, যার নামে আমি অজ্ঞান, সে-ই বা এই বৃষ্টির নামে এত কবিতা লিখল কেন ? সুট বরবাদ হয়ে গিয়েছে, হিম লেগে কেউ হাঁচ্ছে, কেউ কাঁদছে, কেউ বা পিছলে-পড়ে হাত ভেঙে ফেলেছে। আর সব চেয়ে মারাত্মক খবর, পাউলুসের বান্ধবী বৃষ্টির জন্য আসতে পারে নি বলে পাউলুস মর্মাহত হয়ে পটাসিয়াম সায়ানাইডের সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছে।

মহা মুশকিলে পড়লুম। জুৎসই কি উত্তর দিই। মৃৎশকটিকায় বসন্তসেনা বৃষ্টিতে ভিজে যখন চারুদত্তের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন যে কাব্য সৃষ্টি হয়েছিল, তার বর্ণনা এদের সামনে এই বেমক্কায় পেশ করলে এরা আমাকে খুন করবে ; মেঘদূতের বয়ান, জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুরম্বরং' এদের সামনে গাইতে গেলে এরা আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। তাই ভাবলুম, কার্ল মার্কসের স্মরণ নেওয়াই প্রশস্ত। অর্থনৈতিক কারণ দেখালে এরা হয়ত মোলায়েম হবে। বললুম, 'বৃষ্টি না হলে গাছপালা, গম-ধান গজাবে কি প্রকারে ?'

সবাই আমার দিকে এমন ভাবে তাকালে যেন আমি বেহেড মাতাল অথবা বদ্ধ উন্মাদ। মিশরে পাগলা উটের কামড় খেয়ে বহু লোক মতিচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে এরা পাগলকে কি ভাবে শায়েস্তা করতে হয় সে কথা বিলক্ষণ জানে। রমজান বললো, 'কাইরো শহরের ভিতর কি যবগম ফলে যে এখানে বৃষ্টির প্রয়োজন ? যবগম ফলে গ্রামাঞ্চলে। সেখানে বৃষ্টি হোক না, কে বারণ করছে। কিন্তু শহরের ভিতরে কেন ?'

শরিফ মুহম্মদ বললো, 'সেখানেই বা বৃষ্টি হবে কেন ? আমাদের গম-ধান ফলে নাইলের জলে। এই যে বৃষ্টি কখন আসে কখন আসে না তার তো কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। এর উপর নির্ভর করলে মিশরীদের আর বাঁচতে হত না। আমি কি উত্তর দেব ভাবছি, এমন সময় গ্রীক সদস্য পাউলুস ফিরে এসে ঝুপ করে একটা চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রেখে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে আরম্ভ করল। আমার সঙ্গে তর্কাতর্কির কথা সবাই ভুলে গিয়ে পাউলুসের চতুর্দিকে

ঘিরে দাঁড়ালো।

কি হয়েছে, কি ব্যাপার ?

অনেক ঝুলোঝুলির পর পাউলুস মাথা না তুলেই ফুঁপিয়ে যা বললো তার অর্থ, মেঘ আর বৃষ্টিতে তার বান্ধবীর বিরহবেদনা তাকে কাবু করে ফেলেছে। এ যন্ত্রণা সে সইতে পারবে না। পটাসিয়াম সায়ানাইড রেশনড হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর অন্য কোনো প্রশস্ত পন্থা আড্ডা যদি তাকে না বাৎলায় তবে—ইত্যাদি।

আমাকে তখন আর পায় কে ? হুঙ্কার দিয়ে বললুম, 'ওরে মূর্খের দল, জীবনের সব চেয়ে বড় সত্য বিরহ। আর বিরহ কারে কয়, সে-কথা কি করে জানবি মেঘ না জমলে, বৃষ্টি না ঝরলে ? আর শেষ তত্ত্বকথা কবিতা কি করে ওৎরাবে বিরহবেদনা যদি মানুষকে পাগল করে না তোলে ?

* * *

আজও ভাবি, আমাদের পদাবলী, জয়দেব, কালিদাস শূদ্রক যে বিরহ-বর্ণনা রেখে গিয়েছেন তার সঙ্গে তো অন্য কোন সাহিত্যের বিরহবর্ণনার তুলনা হয় না। তার একমাত্র কারণ আমাদের বর্ষা।

জিন্দাবাদ হিন্দুস্থানী বর্ষা ! !

প্যারিস

জর্মন ভাষায় একটি গান আছে :

"In Paris, in Paris, sind die
Maedels so suess
Wenn sie fiuestern "Monsieur,
ich bin Dein,—"

অর্থাৎ :

প্যারিসের মেয়েগুলো কি মিষ্টি !
যখন তারা কানের কাছে গুনগুনিয়ে বলে,
'মসিয়ো আমি তোমারি।'
সবাই হেসে হেসে তাকায়, সবাই কথা বলবার
সময় 'তুমি' বলে ডাকে
আর কানে কানে বলে, 'তোমায় ছেড়ে
আর কারো কাছে যাব না।'
কিন্তু হায়, শুধু তোমাকেই না, আরো
পাঁচজনকে তারা ঐ রকমধারাই বলে !

ইংরেজীতে বলে, 'কেরীং কোল টু নিউ কাসল', হিন্দীতে বলে 'বরেলীমে

বাঁস লে জানা' (বেরলীতে নাকি প্রচুর বাঁশ জন্মে), রাশানে বলে, 'তুলা শহরে সামোভার নিয়ে যাওয়া' (সেখানে নাকি পৃথিবীর বেশীর ভাগ সামোভার তৈরী হয়), গুজরাতীতে বলে, 'ভরা কলসী নিয়ে নদীতে যাওয়া' এবং ফরাসীতে বলে, 'প্যারিসে আপন স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া !'

ফরাসী প্রবাদটিই মুখরোচক। কিন্তু প্রশ্ন, সত্যই কি প্যারিস-সুন্দরীরা বড্ডই দিলদরিয়া ? উপরের গানটাতে তো খানিকটে হদিস পাওয়া গেল। তবু কেন তামাম ইয়োরোপবাসীর সুখস্বপ্ন অন্ততঃ একবারের মত প্যারিসে যাওয়া ? এমন কি যে জর্মন ফরাসী জাতটাকে দু'চোখের দুশমন বলে জানে, সেও ফরাসীনীর নাম শুনলে বে-এক্তেয়ার হয়ে পড়ে। হিন্দুর কাশী দর্শনাভিলাষ ইসলমানের মক্কা গমন তার কাছে নস্যি।

এ অধম ছেলেবেলায় এক ভশ্চায্যি বামুনের খপ্পরে পড়েছিল। তিনি তার মাথায় তখনই গবেষণার পোকা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই প্যারিসে নেবেই ভাবলুম, 'সত্য কোন্ হিরণ্ময় পাত্রে লুক্কায়িত আছেন, তার গবেষণা করতে হবে' এবং তার নির্যাস আজ আপনাদের কাছে নিবেদন করব। এ-নির্যাস বানাতে আমাকে বিস্তর কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে।

প্রথমতঃ, প্যারিসের মেয়েরা সুন্দরী বটে। ইংরেজ মেয়ে বড্ড ব্যাটামুখো, জর্মন মেয়েরা ভোঁতা, ইতালিয়ান মেয়েরা অনেকটা ভারতবাসীর মত (তাদের জন্য ইয়োরোপে আসার কি প্রয়োজন ?) আর বলকান মেয়েদের প্রেমিকরা হরবকতই মারমুখো হয়ে আছে (প্রাণটা তো বাঁচিয়ে চলতে হবে)। তার উপর আরো একটা কারণ রয়েছে—ফরাসী মেয়ে সত্যি জামা-কাপড় পরার কায়দা জানে —অল্প পয়সায়—অর্থাৎ তাদের রুচি উত্তম।

তা না হয় হল। কিন্তু সুন্দরীরাই যে সব সময় চিত্তাকর্ষণ করেন তা তো নয়। যে-সব দেশে কোর্টশিপ করে বিয়ে হয়, সে-সব দেশে দেখেছি, মেলা সুন্দরীর বর জোটে নি আর এন্তার সাদামাটা মেয়ে খাপসুরৎ বর নিয়ে শহরময় দাবড়ে বেড়াচ্ছে।

তবে কি মানুষ প্রেমে পড়ার বেলা সুন্দরী খোঁজে, বিয়ে করার সময় অন্য বস্তু ? তবে কি প্রেম আর বিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শিরঃপীড়া ? হবেও বা।

তবে একথা অস্বীকার করার যো নেই, ফরাসী মেয়েরা আর পাঁচটা দেশের মেয়েদের তুলনায় ঢের বেশী বিদগ্ধা। গান বোঝে, সাহিত্য নিয়ে নাড়াচড়া করে, নাচতে জানে, ওয়াইনে বানচাল হয় না, অপ্রিয় সত্য এড়িয়ে চলে, পলিটিকস্ নিয়ে মাথা ঘামায় কম এবং জাত-ফাত, সাদা কালো, দেশী-বিদেশী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংস্কার বিবর্জিত। ভালো লেগেছে তাই, হামেশাই দেখতে পাবেন, দেবকন্যার মত সুন্দরী ফরাসীনী যমদূতের মত বিকট হাবশীর সঙ্গে সগর্বে সদম্ভে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন, নাচে খাসা, গান গায় তোফা, ছবি দেখলেই বলতে পারে কোন্ নম্বরী, আর ডাক্তারি পড়ে বলে এর ব্যাণ্ডেজ ওর ইন্‌জেকশন্ হামেশাই বিন্‌ফিতে করে দেয়।

জর্মন মেয়ে বিদেশীকে প্রচুর খাতির-যত্ন করে, প্রেমে পড়ে ফরাসীনীর

চেয়েও বেশী, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আপনি চিরদিনই তার কাছে 'আউসল্যাণ্ডার' (আউটল্যাণ্ডার) বা 'বিদেশীই থেকে যাবেন—কিন্তু ফরাসীনীর মনে অন্য ভাগাভাগি। তার কাছে পৃথিবীতে দুই রকম লোক আছে—কলচরড্ আর অনকলচরড্। ফরাসী, বিদেশী এই দুই স্পৃশ্য অস্পৃশ্য বাদ-বিচার তার মনে কখনো ঢোকে না।

আপনি দিব্য ফরাসী বলছেন, ফ্রাঁস আপনি পড়েন, রোদাঁকে ভক্তি করেন, শোপাঁর রস চাখতে জানেন, বর্দো বর্গেণ্ডি সম্বন্ধে ওকীবহাল, ব্যস, তবেই হল। কোনো ইংরেজ বন্ধুকে যদি আপনি ফরাসীনীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় সসম্ভ্রমে ভারতীয় কায়দায় বলেন, 'ইনি অক্সাফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট,' তবে ফরাসীনী অত্যন্ত গম্ভীর মুখে শুধাবে, 'কোন্ সব্জেক্টে মহাশয়? টেনিস না ক্রিকেট?' ফরাসীনীর বিশ্বাস, অক্সফোর্ডে মাত্র ঐ দুই কর্মই হয়। ভাগ্যিস প্যারিসীনী জানে না, ভারতবর্ষে কিছুই হয় না—কাজেই আপনাকে এ রকম ধারা প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞেস করবে না।

কিন্তু ফরাসীনীর সব চেয়ে বড় গুণ—সে ভণ্ডামি করতে জানে না। আর সব শহরে যা হয়, প্যারিসেও তাই হয়, কিন্তু ফ্রান্সের লোক ঢেকে চেপে রাখবার চেষ্টা করে না। যদি কোনো জিনিস চেপে যায়, তবে সেটা দুষ্টিকটু রুচিবিরুদ্ধ বলে – নিজেকে ধর্মপ্রাণ, নীতিবাগীশ বলে প্রচার করার জন্য নয়।

অর্থাৎ ফরাসীনীর কাছে টেস্ট্ বা রসবোধ মরাল্ বা নীতিবোধের চেয়ে বহুৎ বেশী বরণীয়।

আজব শহর কলকেতা

আজব শহর কলকেতা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। বুড়ো হতে চললুম তবু তার প্রমাণ পেলুম কমই। তাই নিয়ে একখানা প্রামাণিক প্রবন্ধ লিখব ভাবছি এমন সময় নামল জোর বৃষ্টি। সমীরণে পথ হারানোর বেদনা বেজে উঠল কারণ যদিও পথ হারাই নি তবু সমস্যাটা একই! ছাতা নেই, বর্ষাতি নেই, ট্রামে চড়বার মত তাগদও আর নেই—বাস মাথায় থাকুক,—ট্যাক্সি চড়তে বুক কচ কচ করে; কাজেই বাড়ি ফেরার চিন্তার বেদনাটা 'পথহারানো'র মতই হল। এমন সময় সপ্রমাণ হয়ে গেল 'কলকেতা আজব শহর'—সামনে দেখি বড় বড় হরফে লেখা 'ফ্রেঞ্চ বুক শপ'!

খেয়েছে! নিশ্চয়ই কোনো ফরাসী পথ হারিয়ে কলকাতায় এসে পড়েছে আর যে দুটি পয়সা ট্যাকে আছে তাই খোয়াবার জন্য ফরাসী বইয়ের দোকান খুলেছে। বাঙালী প্রকাশকরা বলেন, 'শুধু ভালো বই ছাপিয়ে পয়সা কামানো যায় না, রদ্দি উপন্যাসও গাদা গাদা ছাড়তে হয়।' কথাটা যদি সত্যি হয় তবে শুধু ফরাসী বই বেচে এ দোকানে মুনাফা করবে কি প্রকারে? তাই আন্দাজ করলুম, এই 'ফ্রেঞ্চ বুক শপ' বোধ হয় হাতীর দাঁতের মত—শুধু দেখবার জন্য,

চিবোবার জন্য দাঁত রয়েছে লুকোনো অর্থাৎ দোকানের নাম বাইরে যদিও 'ফ্রেঞ্চ বুক শপ,' ভিতরে গিয়ে পাবো অন্য মাল—'খুশবাই', 'সাঁঝের পীর,' 'লোধ্রেণু', 'ওষ্ঠ-রাগ'।

সেই ভরসায় ঢুকলুম। বৃষ্টিটাও জোরে নেমেছে। নাঃ। আজব শহর কলকেতাই বটে। শুধু ফরাসী বই বেচেই লোকটা পয়সা কামাতে চায়। গাদা গাদা হলদে আর সাদা মলাটওলা এন্তার ফরাসী বই, কিছু সাজানো-গোছানো, কিছু যত্রতত্র ছড়ানো। ফরাসী দোকানদার কলকাতায় এসে বাঙালী হয়ে গিয়েছে। বাঙালী দোকানদারেরই মত বইগুলো সাজিয়েছে টাইপ রাইটারের হরফ সাজানোর মত করে। অর্থাৎ সিজিলটা যার জানা আছে সে চোখ বন্ধ করেই ইচ্ছেমত বই বের করে নিতে পারবে, যে জানে না তার কোমর ভেঙে তিন টুকরো হয়ে যাবে।

ফুটফুটে এক মেমসাহেব এসে ইতিমধ্যে ফরাসী হাসি হেসে দাঁড়িয়েছেন। পরশুরামের কেদার চাটুজ্যেকে আমি মুরুব্বি মানি। তারই ভাষায় বললুম, সেলাম মেমসাহেব।' মেমসাহেব ফরাসীতে বললেন, 'আপনার আনন্দ কিসে?' —অর্থাৎ 'কি চাই?' মেরেছে। ফরাসী ভাষা কবে সেই প্রথম যৌবনে বলেছি সে কথাই স্মরণ নেই – গোটা ভাষাটার কথা বাদ দিন।

জর্মন ভাষায় একটি প্রেমের গান আছে Dein Mund sagt "Nein" Aber Deine Augen sagen "Ja". অর্থাৎ, তোমার মুখ বলছে 'না, নো', কিন্তু তোমার চোখ দু'টি বলছে 'হাঁ হাঁ'।

কিন্তু ফরাসী জর্মনির দুশমন। জর্মন যা করে ফরাসী তার ঠিক উল্টো করাটাই জাত্যভিমানের কৈবল্যানন্দ বলে ধরে নিয়েছে। তাই মেমসাহেব যতই মুখে 'ইয়েস ইয়েস' বলেন ততই দেখি তাঁর চোখে স্পষ্ট লেখা রয়েছে 'না' 'নো' —অর্থাৎ মেমসাহেব আমার ইংরেজী বুঝতে পারছেন না। মহা মুশ্কিল।

হঠাৎ কখন ফরাসী রাজদূত মসিয়ো ফ্রাঁসোয়া পঁসে'র নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে বোধ হয় কিছুটা ফরাসী বেরিয়ে পড়েছিল, আর যাবে কোথা, মেমসাহেব আদেশ দিলেন, 'মসিয়ো, ফরাসীতে কথা বললেই পারেন।'

বাঙালীর জাত্যভিমানে বড্ডই আঘাত লাগলো স্বীকার করতে যে যদিও ফরাসী ভাষাটা কেঁদেকুকিয়ে পড়ে নিতে পারি, বলতে গেলে আমার অবস্থা ডডনং হয়ে দাঁড়ায়। ভাবলুম, দুগ্গা বলে ঝুলে পড়ি। এ মেমসাহেব যদি কলকাতার বুকের উপর বসে বাঙলা (এমন কি ইংরিজীও) না বলতে পারে তবে আমি ফ্রান্স থেকে হাজারো মাইল দূরে দাঁড়িয়ে টুটিফুটি ফরাসী বললে এমন কোন্ বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

দশ বছরের পুরোনো মর্চে ধরা, জাম-পড়া, ছাতি-মাথা ফরাসী তানপুরোটার তার বেঁধে বরজলালের মত ইমনকল্যাণ সুর ধরলুম। এবং কী আনন্দ, কী আনন্দ, মেমসাহেবও বুড়ো রাজা প্রতাপ রায়ের মত। আমার ফরাসী শুনে কখনো 'আহাহা বাহাবা বাহাবা' বলেন, কখনো, 'গলা ছাড়িয়া গান গাহো' বলেন। এই হল ফরাসী জাতটার গুণ। হাজারো দোষের মধ্যে একটা কিছু

ভালো দেখতে পেলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

আমাকে আর পায় কে?

আপনাদের আশীর্বাদে তার শ্রীগুরুর কৃপায় তখন ব্যাকরণকে গঙ্গাযাত্রায় বসিয়ে উচ্চারণের মাথায় ঘোল ঢেলে চালালুম আমার ধেনো মার্কা ফরাসী শ্যাম্পেন। মেমসাহেব খুশ। আম্মো তর।

অতি সযত্নে তিনি আমার বইয়ের ফর্দ টুকে নিলেন, বই আসা মাত্র আমায় খবর দেবেন সে ভরসাও দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সাত সমুদ্র তেরো নদীর এপারে বিদেশীর সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা কইতে পাওয়ার আনন্দে সুখ-দুঃখের দু'চারটা কথাও বলে ফেললেন। মাত্র তিন মাস হল এদেশে এসেছেন, তাই ইংরিজী যথেষ্ট জানেন না, তবে কাজ চালিয়ে নিতে পারেন, বইয়ের দোকান তাঁর নয়, এক বান্ধবীর, তার অনুপস্থিতিতে শুদ্ধমাত্র ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার কামনায় দোকানে বসেছেন।

তুলসীদাস বলেছেন—'পৃথিবীর কি অদ্ভুত রীতি। শুঁড়ি দোকানে জেঁকে বসে থাকে আর দুনিয়ার লোক তার দোকানে গিয়ে মদ কেনে। ওদিকে দেখ, দুধওয়ালাকে ঘরে ঘরে ধন্না দিয়ে দুধ বেচতে হয়।'

বুঝলুম কথা সত্যি। এতদিন পৃথিবীর লোক প্যারিসে জড়ো হত ফরাসী বেচবার জন্য।

সে কথা থাক্। ইতিমধ্যে একটি বাঙ্গাল ছোকরা দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, 'কনার্শিয়াল আর্ট সম্বন্ধে কোন বই আছে কিনা?' আমার মনে বড় আনন্দ হল। বাঙালী তাহলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। ফরাসী ভাষায় কমার্শিয়াল আর্টের বই খুঁজছে।

ততক্ষণে আমি একটা খাসা বই পেয়ে গিয়েছি। ন্যুরনবর্গের মোকদ্দমায় যেসব দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গিয়েছিল, তাই দিয়ে গড়া হিটলার চরিত্রবর্ণন। হিটলার সম্বন্ধে তাঁর দুশমন ফরাসীরা কি ভাবে তার পরিচয় বইখানাতে আছে। এ বইখানার পরিচয় আপনাদের দেব বলে লেখাটা শুরু করেছিলুম, কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা শেষ হতে না হতেই ভোরের কাক কা-কা করে আমার স্মরণ করিয়ে দিলে, কলম 'ফুরিয়ে গিয়েছে'। আরেক দিন হবে।

কিসের সন্ধানে

হটেনটট্‌দের কথা আলাদা। শিক্ষালাভের জন্য তারা যেখানে খুশি যেতে পারে। একথা তাদের ভাবতে হয় না, 'যে-শিক্ষা লাভ করতে যাচ্ছি সেটা আবার দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খাবে তো?' কারণ কোনো প্রকারের ঐতিহ্যের কণামাত্র বালাই তাদের নেই।

ইংরেজ শাসনের ফলে আমরা প্রায় হটেন্‌টটের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছিলুম।

আর কয়েকটি বৎসর মাত্র ইংরেজ এদেশে থাকলে আমরা একে অন্যকে কাঁচা খেয়ে ফেলতে আরম্ভ করতুম।

ইংরেজ গিয়েছে। তাই এখন প্রশ্ন উঠেছে আমরা বিদ্যালাভ করতে যাব কোন্ দেশে? এতদিন এ প্রশ্ন কেউ শুধাতো না। টাকা থাকলেই ছোকরারা ছুটতো হয় অক্সফোর্ডের দিকে নয় কেমব্রিজের পানে। সেখানে সীট না পেলে লণ্ডন কিংবা এডিনবরা।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। এই ভারতবর্ষে একদিন বিদ্যাশিক্ষার এমনি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল যে, গান্ধার, কম্বোজ, বল্হীক, তীব্বত, শ্যাম, চীন থেকে বিদ্যার্থী শ্রমণ এদেশে আসত সত্যজ্ঞান লাভ করার জন্য। এবং বিংশ শতকে দেখলুম, এই এই ভারতবর্ষের লোকেই ধেয়ে চলেছে ইংলণ্ডের দিকে 'বিদ্যালাভে'র জন্য। ভারতীয় ঐতিহ্য তখন তার দুরবস্থার চরমে পৌঁছেছে।

রাধার দুরবস্থা যখন চরমে পৌঁছেছিল, তখন যমুনার জল উজান বয়েছিল, একথা তাহলে মিথ্যা নয়।

কিন্তু আমাদের ছেলেরা যে ইংলণ্ডের পানে উজান স্রোতের মতো বয়ে চলেছিল, সেটা তো আর রাতারাতি বন্ধ করে দেওয়া যায় না—পরাধীনতা-মুর্গীটার গলা কাটা যাওয়ার পরও সে খানিকদূর পর্যন্ত ছুটে যায় তারপর ধপ করে মাটিতে পড়ে। তাই এই বেলা জমাখরচ নিয়ে নেওয়া ভালো, ভারতীয় ছেলে ইয়োরোপে পেত কি, যেত কিসের আশায়?

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করার সময় বলেছিলেন, ইয়োরোপকে আমরা চিনলুম ইংলণ্ডের ভিতর দিয়ে—তাই আমাদের প্রায় সকলেরই বিশ্বাস ইংলণ্ড আর ইয়োরোপ একই জিনিস। ইংলণ্ডের অনেক গুণ আছে সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না, কিন্তু ইয়োরোপীয় বৈদগ্ধ্যভাণ্ডারে যে ইংলণ্ড তেমন কিছু হীরে-মানিক জমা দিতে পারে নি, সে কথাও সত্য। ইয়োরোপীয় বৈদগ্ধ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুতুবমিনার বলতে যাঁদের নাম মনে আসে—মাইকেল এঞ্জেলো, রদাঁ, রাফায়েল, সেজান, বেটোফেন, ভাগনার, গ্যোটে, টলস্টয়, দেকার্ত, কাণ্ট, পাসত্যোর, আইনস্টাইন ইংলণ্ডে জন্মায় নি। তাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীতে যেন ফ্রান্স, জর্মনি, ইটালী, রুশ থেকে গুণীজ্ঞানীরা এসে এদেশে ছেলেমেয়েদের সামনে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেন।

রবীন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন বহু গুণী শান্তিনিকেতনে এসেছেন, বহু ছাত্র তাঁদের কাছ থেকে নানা প্রকারের বিদ্যা আহরণ করেছে, কিন্তু আজ শান্তিনিকেতনে সে-মেলা আর বসে না। তবু আমার বিশ্বাস, বাঙালী যদি আত্মবিশ্বাস না হারায় তবে এই শান্তিনিকেতনেই—দিল্লী, এলাহাবাদ, আমেদাবাদে নয়—এই শান্তিনিকেতনের পঞ্চবটীর তলায়ই একদিন পঞ্চমহাদেশ সম্মিলিত হবে। আমাদের দেখতে হবে, এই পঞ্চবটী যেন ততদিন শুকিয়ে না যায়।

ভারতীয় ছেলে যে ইংলণ্ডে পড়াশোনা করতে যেত তার কারণ এই নয় যে, তাদের সবাই ধরে নিয়েছিল ইংলণ্ডই ইয়োরোপের প্রতীক—তারা ধরে নেয় নি

যে, ইয়োরোপ থেকে যা কিছু শেখবার মত আছে তার তাবৎ সম্পদ অক্সফোর্ড কেমব্রিজেই পাওয়া যায়। এদের ভিতর অনেক ছেলেই জানতো, শিল্পকলার জন্য ফ্রান্স, এবং বিজ্ঞানদর্শনের জন্য জর্মনিতেই গঙ্গোদক পাওয়া যায়—অভাব-বশতঃ তারা যে তখন কূপোদকের সন্ধানে যেতো তাও নয়। তার একমাত্র কারণ চাকরি দেবার বেলা ইংরেজ এ জলেরই কদর দেখাতো বেশী। (এতে আশ্চর্য হবার মত কিছু নেই ; আয়ানও চাইতেন না যে রাধা যমুনার জল আনতে যান, পাছে কৃষ্ণের সঙ্গে সেখানে তাঁর দেখা হয়ে যায়—ইংরেজও চাইত না যে, ফ্রান্স জর্মনি গিয়ে আমরা সভ্য ইয়োরোপকে চিনে ফেলি। আয়ান ইংরেজ দু'-জনেই তাই কূপোদক-সম্প্রদায়ের মুখপাত্র)।

জানি, আমার পাঠক মাত্রই টিপ্পনি কাটবেন আমি বড্ড বেশী প্রাদেশিক কিন্তু তাই বলে তো আর ডাহা মিথ্যা কথা বলতে পারি নে। নিবেদন করতে বাধ্য হচ্ছি যে, ইংলেণ্ড বর্জন করে তবু যে কয়টি ছেলে প্যারিস, বার্লিন, মুনিক, ভিয়েনায় জ্ঞানের সন্ধানে যেত তাদের অধিকাংশই বাঙালী।

আশা করি একথা কেউ বলবেন না যে বাঙালীর ট্যাঁকে এত বেশী কড়ি জমে গিয়েছিল যে, সেগুলো ওড়াবার তালে সে প্যারিস যেত, জর্মন ঘুরত। বরঞ্চ বাঙালীর বদনাম সে চাকরির সন্ধানে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে। এক অখ্যাতনামা বাঙালী কবি চাকরির বাঁচানো সম্পর্কে আপিস ধাবমান বাঙালী কেরানীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

ভরা পেটে ছুটতে মানা ? চিবিয়ে খাওয়া
স্বাস্থ্যকর ?
চাকরি আগে বাঁচাই দাদা, প্রাণ বাঁচানো
সে তারপর।

যে অন্নের জন্য বাঙালী কেরানীগিরি করে সেই অন্ন পর্যন্ত বাঙালী কেরানী ধীরে-সুস্থে খেয়ে আপিস যেতে পারে না। এত বড় প্যারাডক্স, এত বড় স্বার্থত্যাগ বাঙ্গালা দেশের বাইরে আপনি পাবেন না।

আমি বলি—আর আপনার কথায় কান দেব না—বাঙালীরই ঈষৎ রসবোধ ছিল, তাই সে প্যারিস যেত।

প্যারিসে একপ্রকারের হতভাগা চিত্রকরের দল আছে—এদের নাম পেভমেণ্ট আর্টিস্ট। এরা আবার দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এদের ভিতর যারা কিঞ্চিৎ খানদানি তারা আপন ছবি ফুটপাথের রেলিঙের উপর ঝুলিয়ে রেখে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আপনি যদি কোনো ছবি সম্বন্ধে কিছু জানতে চান তবে সে পরম উৎসাহে আপনাকে বাৎলে দেবে ছবিটার তাৎপর্য কি। আপনি যদি সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ দেখান তবে সে তার তাবৎ ছবির ঠিকুজি-কুলজি, নাড়ী-নক্ষত্র সব কিছু গড় গড় করে বলে যাবে, আর যদিস্যাৎ আপনি একখানা ছবি কিনে ফেলেন—এ জাতীয় অলৌকিক ঘটনা অতিশয় রাঙা শুক্কুরবার ছাড়া কখনো দৃষ্টিগোচর হয় না—তবে সে আপনাকে 'ও রিভোয়া' জানাবার সময় কানে কানে বলে দেবে, 'এ ছবি কিনে আপনি ভুল করেন নি,

মসিয়ো—এ ছবি দেখিবার জন্য তামাম পৃথিবী একদিন আপনার দোরের গোড়ায় ধন্না দেবে।'

অবশ্য ততদিন সে উপোস করে। শেষটায় সে-দিন না দেখেই সে মরে—শীতে এবং ক্ষুধায়।

এদের চেয়েও হতভাগা চিত্রকর আছে। তাদের রঙ আর ক্যানভাস কেনবার পয়সা পর্যন্ত নেই। তাই তারা রঙিন খড়ি দিয়ে ফুটপাথের একপাশে ছবি এঁকে রাখে। প্যারিসের ফুটপাথে বারোমাস পুজোর ভিড়—তাই এদের ছবি আঁকতে হয় অপেক্ষাকৃত নির্জন ফুটপাথে। সেখানে পয়সা পাবার আশাও তাই কম।

এসব ছবি তো আর কেউ বাড়ি নিয়ে যেতে পারে না, তাই ছবি দেখে খুশী হয়ে কেউ যদি চিত্রকরের হ্যাটের ভিতর—বলতে ভুলে গিয়েছিলুম হ্যাটটা ছবির একপাশে চিৎ করে পাতা থাকে—দু'টি পয়সা ফেলে দেয় তবে সেটা ভিক্ষে দেওয়ার মতই হ'ল। এ শ্রেণীর চিত্রকররা অবিশ্যি বলে, 'পয়সাটা ভিক্ষে নয়, পিকচার গ্যালারির দর্শনী। দর্শনী দিয়েছে বলে কি তোমাকে গ্যালারির ছবি বাড়ি নিয়ে যেতে দেয়?' হক্ কথা।

এদের যদি বেশী পয়সা দিয়ে বলেন, 'ঐ ছবিটা তুমি আমাকে ক্যানভাস আর রঙ কিনে ভালো করে এঁকে দাও', তবে সে পয়সাটা সীনের জলে ফেলারই সমান। এ শ্রেণীর চিত্রকরের সঙ্গে বোতলবাসিনীর বড্ড বেশী দহরম-মহরম।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলে মন উদাস হয়ে গিয়েছিল। তাই বেড়াতে বেরিয়েছি আর দেশের কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি ফুটপাথের উপর অলৌকিক দৃশ্য। পদ্মানদীর গোটা কয়েক ছবি রঙিন খড়ি দিয়ে আঁকা। ছবিগুলো ভালো না মন্দ সেকথা আমি এক লহমার তরেও ভাবলুম না। বিদেশ-বিভূঁইয়ে দেশের লোক পেলে সে পকেটমার না শঙ্করাচার্য, সেকথা কেউ শুধায় না।

বৃষ্টি নামলেই ছবিগুলো ধুয়ে মুছে যাবে। আর্টিস্টের দিকে তাকালুম। শতচ্ছিন্ন কোট পাতলুন। হাতে বেয়ালা। বাঙালী।

আমাকে দেখে তার মুখের ভাব কণামাত্র বদলালো না। বেয়ালাখানা কানের কাছে তুলে ধরে ভাটিয়ালি বাজাতে আরম্ভ করল।

হাড্ডিসার মুখ, ঠোঁট দুটো অনবরত কাঁপছে, চোখ দুটিতে কোনো প্রকারের জ্যোতির বিন্দুমাত্র আভাস নেই, একমাথা উস্কোখুস্কো চুল, কিন্তু সব ছাড়িয়ে চোখে পড়ে তার কপালখানা। এবং সে কপাল দেখে স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে, এরকম 'কপালী' মানুষ বিদেশ-বিভূঁইয়ে ভিক্ষে মাঙছে কেন?

তাকে পাশের কাফেতে টেনে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে বিস্তর বেগ পেতে হয়েছিল। আমার কোনো কথার উত্তর দেয় না, আমার চেয়ে দেড় মাথা উঁচু বলে তার দৃষ্টি আমার মাথার উপর দিয়ে কোথায় কোন্ দূরান্তে গিয়ে ঠেকেছে তার সন্ধান নেই। একবার হাত ধরে বললুম, 'চলুন, এক কাপ কফি খাবেন';

ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে ফেলল।

আমি নিরাশ হয়ে চলে যাচ্ছি দেখে হঠাৎ হ্যাটটা তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল। পাশের কাফেতে বসে আমি শুধালুম, 'কফি? চা?' মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো। আমি মনে মনে বুঝতে পেরেছিলুম সে কি চায়; কিন্তু সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হবার জন্য চা কফির প্রস্তাব পেড়েছিলুম। শেষটায় শুধালুম, 'তবে কি খাবেন?'

একটি কথা বললো 'আবসাঁৎ।'

দুনিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক মাদক দ্রব্য! শতকরা আশীভাগ তাতে এলকহল। এ মদ মানুষ তিন চার বৎসরের বেশী খেতে পারে না। তারই ভিতরে হয় আত্মহত্যা করে, নয় পাগল হয়ে যায়, না হয় এলকহলিক বিভীশিখা দেখে দেখে এক মারাত্মক রোগে চীৎকার করে করে শেষটায় ভির্‌মি গিয়ে মারা যায়। ইঁদুরছানার নাকের ডগা এ মদে একবার চুবিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলে সে মিনিট তিনেকের ভিতর ছফ্‌ফট্‌ করে মারা যায়।

কী বিকৃত মুখ করে যে আর্টিস্ট আবসাঁৎটা খেল, তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। মনে হল, পানীয় যেন আগুন হয়ে পেটে ঢুকতে চায় বলে নাড়ীভুঁড়ি উল্টে গিয়ে বমি হয়ে বেরতে চায়, আর সমস্ত মুখে তখন ফুটে ওঠে অসহ্য যন্ত্রণার বিকৃততম বিভীষিকা। চোখ দুটো ফুলে উঠে যেন বাইরের দিকে ছিটকে পড়ে যেতে চায়, আর দরদর করে দু'চোখ দিয়ে জল নেমে আসে।

আমি মাত্র একটা আবসাঁতের অর্ডার দিয়েছিলুম। সেটা শেষ হতেই আমার দিকে না তাকিয়ে নিজেই গোটা তিনেক অর্ডার দিয়ে ঝপাঝপ গিললো।

আমি চুপ করে আপন কফি খেয়ে যাচ্ছিলুম।

গোটা চারেক আবসাঁৎ সে ততক্ষণে গিলেছে। তখন দেখি সে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য এর চোখে এল কোত্থেকে?

হঠাৎ বললো, 'আর কেন ছোকরা, এইবার কেটে পড়ো, বীট ইট্‌, গে ভেক্‌, ভিৎ ভিৎ।' ক'টা ভাষায় যে সে আমায় পালাতে বললো তার হিসেবই আমি রাখতে পারলুম না।

আমি চুপ করে বসে রইলুম— নট নড়ন-চড়ন—নট-কিচ্ছু।

একগাল হেসে বলল, 'দেখলি? আমি ভিখিরি নই। এই ভাষা ক'টি ভাঙিয়েই আমি তোর চেয়ে দামী সুট পরতে পারবো, বুঝলি? আবসাঁৎ দিয়ে প্যারিস শহর ভাসিয়ে দিতে পারবো, বুঝলি, কমপ্রাঁ, ফের্‌শট্‌হেস্ট ডু, পন্নিময়েশ?' আবার চলল ভাষার তুবড়ি।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে খানিকক্ষণ হাসলো। শুধালো, 'ছবি আঁকতে এসেছিস এ দেশে?—না হলে আর্টিস্টের উপর এ দরদ কেন, বাপু? তা তোর অজন্টার কি হল? না বাগ-গুহা? কিংবা মোগল? অথবা রাজপুত?'

তারপর হঠাৎ হো হো করে হেসে কুটি কুটি। 'অবনবাবু? নন্দলাল?

যামিনী রায় ? এনারা সব আর্টিস্ট। কচু।'

আমি তবু চুপ।

বললে, 'অ-অ-অ-। সেজান্ রেনোয়া গোগাঁ, আঁরি-মাতিস ? বল্ না রে ছোকরা।'

আমি পূর্ববৎ।

'তবে শোন্ ছোকরা। এদের কাছ থেকে কিচ্ছুটি শেখবার নেই, তোকে সাফ সাফ বলে দিচ্ছি। আমার কথা শোন্। আর্ট জিনিসটা কি ? আর্ট হচ্ছে—'

বলে সে আমায় প্রথম আর্ট সম্বন্ধে একখানা লেকচর শোনালে। সেই গ্রীকদের আমল থেকে নন্দনশাস্ত্রের ইতিহাস শুরু ক'রে হঠাৎ চলে গেল ভরত দণ্ডিন মম্মট ভট্টে। সেখান থেকে গোত্তা খেয়ে নাবলো টলস্টয়ে—মধ্যিখানে গ্যোটেকে খুব একহাত নিল। তারপর বদলের, মালার্মে। শেষ করল জেমস জয়েসকে দিয়ে।

আরো বিস্তর কাব্য, নাট্য, চিত্রের সে উল্লেখ ক'রে গেল, যার নাম আমি বাপের জন্মে শুনি নি।

তারপর ঝপ ক'রে আরেকটা আবসাঁৎ গিলে বললো, 'উহুঁ! তোর চোখ থেকে বুঝতে পারছি ছবির তুই বুঝিস কচুপোড়া। একবার একটা সাড়া পর্যন্ত দিলি নে। তবে কি তোর শখ মূর্তি গড়াতে ? অশোকস্তম্ভের সিংগি, গান্ধারের বুদ্ধ, মথুরার অমিতাভ, এলেফেণ্টার ত্রিমূর্তি, মাইকেল এঞ্জেলোর মোজেস, নটরাজ ? বল্ না ?

তারপর ছাড়লে আরেকখানা লেকচর। দুনিয়ার কোন যাদুঘরের কোন্ কোণে কোন্ মূর্তি লুকনো আছে, সব খবর নখাগ্র-দর্পণে।

এই রকম ক'রে লোকটা আর্টের যত শাখা-প্রশাখা আছে তার সম্বন্ধে আপন মনে কখনো মাথা নেড়ে, কখনো শব্দ ওজন ক'রে ক'রে, কখনো গড়গড়িয়ে মেল গাড়ির তেজে, কখনো বক্রোক্তি ক'রে সন্দেহের দোদুল-দোলায় দুলে ব্যাখ্যান দিল। এদেশ ওদেশ সেদেশ সব দেশ-মহাদেশের সর্বপ্রকারের আর্ট বস্তুর পাঁচমেশালি বানিয়ে।

এরকম পণ্ডিত আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে সে চুপ করে আর থাকতে দিল না।

বোধ হয় নেশা একটু কমে গিয়েছিল ; তাই চাপ দিয়ে শুধালো, 'বল্, তুই এদেশে এসেছিস কি করতে ?'

আমি না পেরে ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, 'লেখাপড়া শিখতে।'

খুব লম্বা একখানা 'অ-অ-অ' টেনে বললো।

'তা তো শিখবি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওয়াইন, শ্যাম্পেন, আবসাঁৎ ? তার কি হবে ? নানা প্রকারের ব্যামো ? তার কি হবে ? অদ্ভুত অদ্ভুত নয়া নয়া ইনকিলাবী মতবাদ ? তার কি হবে ?

* * *

এই হল মুশকিল। আবসাঁৎ ব্যামোর চেয়েও ভয়ংকর অর্ধসিদ্ধ অর্ধপক্ক

মতবাদ। শুধু ইনকিলাবী নয়, অন্য পাঁচরকমেরও।

আজ পর্যন্ত যেটুকু এদেশে এসেছে তাকেই আমরা সামলে উঠতে পারছি নে। আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের শিক্ষার সঙ্গে তাকে কি করে মিল খাওয়াবো, বুঝে উঠতে পারিনে। অথচ পশ্চিমের সঙ্গে লেন-দেনও তো বন্ধ ক'রে দেওয়া যায় না। উপায় কি??

ভক্তি

ভক্তি ও ভালবাসার ভিতর দিয়ে অনির্বচনীয় সত্তাকে পাবার চেষ্টা মানুষ সব যুগে আর সব দেশেই করেছে। এ-প্রচেষ্টার তুলনাত্মক ইতিহাস আজও লেখা হয় নি। কারণ শেষ পর্যন্ত এ-ইতিহাস লেখা হবে সর্বধর্মের উৎপত্তিস্থল প্রাচ্যেই এবং প্রাচী এখনো আপন ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্র-ইন্ধন নিয়ে এতই উদ্ব্যস্ত যে তিন দেশের শাস্ত্রগ্রন্থ একত্র করে সেদিকে আপন শক্তি নিয়োজিত করবার অবসর পাচ্ছে না।

ভক্তিমার্গের প্রসার ও বিস্তার হয় প্রধানতঃ হিন্দু, মুসলিম এবং খৃস্টান ধর্মে। হিন্দু ধর্মের শাস্ত্ররাশি এতই বিশাল এবং বিক্ষিপ্ত যে, তার ভিতর দিয়ে ভক্তির অভ্যুদয় পদে পদে অনুসরণ করা সহজ কর্ম নয়। তার তুলনায় খৃস্টধর্মে ভক্তির অনুসন্ধান অনেক সহজ। একমাত্র বাইবেলখানা মন নিয়ে পড়লেই ভক্তির সূত্রপাত ও ক্রমবিকাশ বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

বাইবেলের প্রথম খণ্ডে (অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেণ্ট) ঈশ্বরের যে রূপ পাওয়া যয়ে সেটি প্রধানতঃ একচ্ছত্রাধিপতি দুর্ধর্ষ, অকরুণ এমন কি বদরাগী এবং খাম-খেয়ালী রাজার রূপ? তাঁর সামনে পশুপক্ষী দাহ না করলে তিনি তৃপ্ত হন না, তাঁর পদপ্রান্তে কুমারী কন্যাকে বিসর্জন না দিলে তিনি বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহা-মারী দিয়ে দেশ লণ্ডভণ্ড করে দেন। তাই ওল্ড টেস্টামেণ্টের দেবতাকে পূজারী আপন অর্ঘ্য দিচ্ছে অতি ভয়ে, সশঙ্ক চিত্তে।

খৃস্ট এসে এই ভাবধারা সম্পূর্ণ বদলে দিলেন। তিনি বললেন, সৃষ্টিকর্তা রাজাধিরাজ, তাঁর ঐশ্বর্যের সীমা নেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তিনি আমাদের পিতা। 'আওয়ার ফাদার উইচ আর্ট ইন হেভ্‌ন্।' এইখানেই ভক্তির সূত্রপাত। ভগবানকে ভয় করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁর করুণা, তাঁর স্নেহ পেতে হলে তাঁকে ভালবাসতে হবে পিতার মত।

কিন্তু মানুষ একবার ভালবাসার মন্ত্র পেলে সে আর মাটির মানুষ হয়ে থাকতে চায় না। মুক্তপক্ষ বিস্তার করে সে আকাশের সর্বোচ্চ স্তরে উড্ডীয়মান হতে চায়। পিতার প্রতি ভালবাসা মঙ্গলময় জিনিস কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়ে অনেক মধুর, বহু নিবিড় মাতার প্রতি পুত্রের ভালবাসা, পুত্রের প্রতি মাতার মমতা। তাই ক্যাথলিক জগৎ গেয়ে উঠলো, "ধন্য হে জননী মেরি,

তুমি মা করুণাময়ী।"

ক্যাথলিক জগতে তাই ভগবানের পূজা প্রধানতঃ মা-মেরিরূপে। এ পূজা 'আভেমারিয়া' মন্ত্র দিয়ে সমাধান হয় এবং সে মন্ত্র যে কত সঙ্গীত-স্রষ্টাকে অনুপ্রাণিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। খৃস্টবৈরী ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রধান সঙ্গীতকার মেণ্ডেলজোন এই আভেমারিয়া মন্ত্রে সুর দিয়ে লক্ষ লক্ষ ক্যাথলিক নরনারীর ধর্মপিপাসা সঙ্গীতসুধা দিয়ে তৃপ্ত করেছেন—সঙ্গীতজগতে আপন অক্ষয় আসন রেখে গিয়েছেন।

'উর্ধ্বদিকে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত এই আভেমারিয়া সঙ্গীতের প্রতীক উর্ধ্বশির ক্যাথলিক গির্জা। আতুর মানুষের যে প্রার্থনা, যে বন্দনা অহরহ মা-মেরির শুভ্র কোলের সন্ধানে উর্ধ্বপানে ধায় তারই প্রতীক হয়ে গির্জাঘর তার মাথা তুলেছে উর্ধ্বদিকে। লক্ষ লক্ষ গির্জার লক্ষ লক্ষ শিখর মা-মেরির দিব্য সিংহাসনের পার্থিব স্তম্ভ।'

কিন্তু মানুষ এখানে এসেও থামল না। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, মানুষের বিশ্বাস মাতার প্রেম, পুত্রের ভালবাসার চেয়েও শক্তিশালী যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণীর মধ্যে যে প্রেম উদ্ভাসিত হয়। বাইবেলে যখন বলা হয়েছে "For, love is stronger than death" তখন মহাপুরুষ এই প্রেমের কথা ভেবেছিলেন। তাই মানুষ বিচার করল, 'ভগবানকে যদি ভালবাসা দিয়েই পেতে হয়, তবে সে ভালবাসা তার নিবিড়তম রূপ নেবে না কেন? ভগবানকে তবে পিতা অথবা মাতারূপে কল্পনা না করে তাঁকে হৃদয়ে বসাব বল্লভরূপে, প্রেমিকরূপে।'

সমস্ত বৈষ্ণব রসসাধনা এই তত্ত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত—সে কথা পরে হবে। কিন্তু ক্যাথলিক রহস্যবাদী ভক্তেরা (Mystic saints)-ও যে এ-রকম রসস্বরূপে আরাধনা করছেন তার সন্ধান আমরা কমই রাখি,—কারণ আমাদের পরিচয় প্রধানতঃ প্রটেস্টাণ্ট ধর্মের সঙ্গে। ঈষৎ দীর্ঘ হলেও নিচের কবিতাটি উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না :—

O Night, that did's't lead us thus,
O Night, more lovely that dawn
of light,
O Night that broughtest us
Lover to lover's sight
Lover with loved in marriage
of delight !
Upon my flowery breast,
Wholly for him, and save himself
for none,
There did I give sweet rest
To my beloved one ;

The fanning of the cedars
breathed thereon
When the first morning air
Blew from the bower, and waived
his locks aside,
His hand with gentle care,
Did wound me in the side,
And in my body all my senses
died.
All things I then forgot,
My cheek on him who for my
coming came ;
All ceased and I was not,
Leaving my cares and shame
Among the lilies and forgetting
them.

ক্যাথলিক জগতের বিখ্যাত সাধু সান খোয়ানু দে লা ক্রুসের (San Juan de la Cruz) কবিতা পড়ে কে বলবে—এ কবিতা অধ্যাত্ম জগতের ধর্মরস সৃষ্টি করবার জন্য রচিত হয়েছিল ? এ কবিতা তো বৈষ্ণব পদাবলীর সুরে বাঁধা।

কিন্তু ভগবানকে রসস্বরূপে আরাধনা করার প্রচেষ্টাতে ক্যাথলিক জগতের এই চূড়ান্ত।

বৈষ্ণব ভক্ত সেই চূড়ান্ত ত্যাগ করে তারপর আকাশে উড্ডীয়মান হন। বৈষ্ণব প্রেমিক বলেন, 'বৈধ প্রণয়ের নিবিড়তা বার বার হার মেনেছে অবৈধ প্রেমের সম্মুখে। আত্মীয়স্বজন, প্রচলিত ধর্মরীতি যেখানে এসে প্রেমের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, দুর্বার প্রেম এসে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেইখানেই। তাই আমাদের কদম্ববনবিহারিণী বিরহিণী ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধা যে প্রেম পাগলিনী, সে প্রেমের সঙ্গে অন্য কোন প্রেমের তুলনা হয় না। বাঙালীর রাধা বিবাহিতা, —সমাজ তাঁর প্রেমের পথে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছে। শাশুড়ী-ননদী শঙ্খ-করাতের মত তাঁকে আসতে যেতে যেন খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলছেন।

বহু যুগ পূর্বে উচ্চারিত মন্ত্র তাই তার সম্পূর্ণ অর্থ পেল কৃষ্ণরাধার মিলনে—

যদেৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদেৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।

ভারতের বাইরে একমাত্র ইরানে মাঝে মাঝে এই সর্বোচ্চ রসসাধনার সন্ধান মেলে। কারণ ভারত ও ইরানের আধ্যাত্মিক যোগাযোগ বহু শত শতাব্দীর।

তাই ইরানী কবি সুর মিলিয়ে গেয়েছেন ঃ—

'মন্ তু শুদম্ তু মন্ শুদী, মন্ তন্ শুদম্
তু জাঁ শুদী
তা কসী ন গোয়েদ্ বাদ্ আজ্ ঈ মন্ দিগরম্
তু দিগরী।'

আমি তুমি হনু, তুমি আমি হলে, আমি দেহ
তুমি প্রাণ,
এর পরে যেন কেহ নাহি বলে তুমি আন
আমি আন।

* * *

এই বিশাল রসধারার কত স্রোত, কত শাখা-প্রশাখা। কত ধ্বনি, কত সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সান গোয়ান, শ্রীরাধা, রুমীর বিরহকাতর বক্ষ থেকে। কিন্তু হায়, এ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতি মানুষকে কাছে এনেও কাছে আনতে পারল না। অর্থের সন্ধানে, স্বার্থের অন্বেষণে আজ পৃথিবীর এক কোণের মানুষ অপর কোণে গিয়ে মাথা কোটে, কিন্তু এ সব সাধক প্রেমিকদের বাণী এক করে দেখবার চেষ্টা কেউ যে করে না!!

'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে—'

শব্দপ্রাচুর্যের উপর ভাষার শক্তি নির্ভর করে। ইংরেজি এবং বাংলা এই উভয় ভাষা নিয়ে যাঁদের একটুখানি ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়, তাঁরাই জানেন বাঙলার শব্দ-সম্পদ কত সীমাবদ্ধ। ডাক্তারী কিংবা ইঞ্জিনীয়ারিং টেকনিকেল শব্দের কথা তুলছি নে—সে সব শব্দ তৈরী হতে দেরি—উপস্থিত সে শব্দের কথাই তুলছি যেগুলো সাহিত্য ক্ষেত্রেই সর্বদা দরকার হয়।

ইংরেজির উদাহরণই নিন্। ইংরেজি যে নানা দিক দিয়ে ইয়োরোপীয় সর্ব-ভাষার অগ্রগণ্য তার অন্যতম প্রধান কারণ ইংরেজির শব্দ-সম্পদ। এবং ইংরেজি সে সম্পদ আহরণ করেছে অত্যন্ত 'নির্লজ্জে'র মত পূর্ব-পশ্চিম সর্ব দেশ মহাদেশ থেকে। গ্রীক, লাতিনের মত দুটো জোরালো ভাষা থেকে তার শব্দ নেবার হক তো সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েইছে, তার উপর ফরাসীর উপরও ওয়ারিশান বলে তার ষোল আনা অধিকার। তৎসত্ত্বেও—সুকুমার রায়ের ভাষায় বলি—

এতো খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা
খাও তবে কচু-পোড়া খাও তবে ঘণ্টা!!

ইংরেজ উত্তরে বেশরমের মত বলে, "ঠিক বলেছে, আমার মনে ওঠে নি, আমি কচু-পোড়া এবং ঘণ্টা খেতেও রাজী!"

তাই দেখুন ইংরেজ, আরবী, ফার্সী, তামিল, হিন্দী, মালয়—কত বলবো? —দুনিয়ায় তাবৎ ভাষা থেকে কচু-পোড়া ঘণ্টা সব কিছু নিয়েছে, এবং হজমও করে ফেলেছে। 'এডমিরাল' নিয়েছে আরবী 'আমীর-উল-বহর' থেকে, 'চেক'

(কিস্তিমাতের) নিয়েছে ফার্সী 'শাহ' থেকে, 'চুরুট' নিয়েছে তামিল 'শুরুট্টু' থেকে, 'চৌকি' নিয়েছে হিন্দী থেকে, 'এমাক' নিয়েছে মালয় থেকে।

(কিন্তু আশ্চর্য, ইংরেজের এই বিদঘুটে গরুড়ের ক্ষুধা শব্দ বাবদেই ; আহারাদির ব্যাপারে ইংরেজ নকিষ্যি কুলীনের মত উন্নাসিক, কট্টর স্বপাকে খায়, এ-দেশে এত কাল কাটানোর পরও ইংরেজ মাস্টার্ড (অর্থাৎ সর্ষেবাটা বা কাসুন্দি) এবং মাছে মিলিয়ে খেতে শেখে নি, অথচ কে না জানে সর্ষেবাটায় ইলিশ মাছ খাদ্য-জগতে অন্যতম কুতুব-মিনার ? ইংরেজ এখনো বিস্বাদ ফ্রাইড ফিশ খায়, মাছ ভাজতে শিখলো না ; আমরা তাকে খুশী করার জন্য পান্তুয়ার নাম দিলুম লেডিকিনি (লেডি ক্যানিং) তবু সে তাকে জাতে তুললো না, ছানার কদর বুঝলো না। তাই ইংরেজের রান্না এতই রসকষ-বর্জিত, বিস্বাদ এবং একঘেয়ে যে তারই ভয়ে কন্টিনেন্টাল মাত্রই বিলেত যাবার নামে আঁৎকে ওঠে—যদি নিতান্তই লণ্ডন যায় তবে খুঁজে খুঁজে সোহো মহল্লায় গিয়ে ফরাসী রেস্তোরাঁয় ঢুকে আপন প্রাণ বাঁচায়। আমার কথা বাদ দিন, আমার পেটে এটম বোম মারলেও আমি ইংরিজি খানা দিয়ে আমার পেট ভরতে রাজী হবো না।)

শব্দের জন্য ইংরেজ দুনিয়ার সর্বত্র ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায় সে না হয় বুঝলুম ; কিন্তু ইংরেজের মত দম্ভী জাত যে দুশমনের কাছ থেকেও শব্দ ধার নেয় সেইটেই বড় তাজ্জবকী বাৎ। এই লড়াইয়ের ডামাডোলে সবাই যখন আপন আপন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত তখনো ইংরেজ গোটা কয়েক শব্দ দুশমনের কাছ থেকে ধার নিয়ে দাঁত দেখিয়ে হেসেছে। লুফ্‌ট-ভাফ্‌ফের মার খেয়ে খেয়ে ইংরেজ যখন মর-মর তখনো সে মনে মনে জপছে, 'লুফ্‌ট-ভাফ্‌ফে, লুফ্‌ট-ভাফ্‌ফে, শব্দটা ভুললে চলবে না', ব্লিৎস্‌ক্রীগের ঠেলায় ইংরেজ যখন ডানকার্কে ডুবু-ডুবু তখনো ইষ্টনাম না জপে সে জপেছে, ব্লিৎস-ক্রীগ, ব্লিৎস-ক্রীগ।'

আর বেতামিজীটা দেখুন। গালাগাল দেবার বেলা যখন আপন শব্দে কুলোয় না—মা লক্ষ্মী জানেন সে ভাণ্ডারেও ইংরেজের ছয়লাব—তখনো সে চক্ষুলজ্জার ধার ধারে না। এই তো সেদিন শুনলুম কাকে যেন "স্বাধিকার-প্রমত্ত" বলতে গিয়ে কোনো এক ইংরেজ বড় কর্তা শত্রুপক্ষকে শাসিয়েছেন, "আমাদের উপর ফ্যুরার- গিরার ফপরদালালি করো না।"

পাছে এত সব শব্দের গন্ধমাদন ইংরেজকে জগন্নাথের জগদ্দল পাথরে চেপে মারে তাই তার ব্যবস্থাও সে করে রেখেছে। 'জগন্নাথ' কথাটা ব্যবহার করেই সে বলেছে, "ভেবে চিন্তে শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করবে—পাগলের মত ডোণ্ট থ্রো ইয়োরসেলভস আণ্ডার দি হুইল অব Juggernaut (জগন্নাথ)।"

ব্যাটারা আমাদের জগন্নাথকে পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রা করিয়ে দেশে নিয়ে ছেড়েছে। পারলে তাজমহল আর হিমালয়ও আগেভাগেই নিয়ে বসে থাকত—কেন পারে নি তার কারণ বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

ফরাসী জাতটা ঠিক তার উল্টো। শব্দ গ্রহণ বাবদে সে যে কত মারাত্মক ছুঁৎবাইগ্রস্ত তা বোঝা যায় তার অভিধান থেকে। পাতার পর পাতা পড়ে যান, বিদেশী শব্দের সন্ধান পাবেন না। মনে পড়ছে, আমার তরুণ বয়সে শান্তিনিকেতনের ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া সায়েবের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। রোমা রলাঁর পঞ্চাশ না ষাট বছর পূর্ণ হওয়াতে পৃথিবীর বড় বড় রলাঁ-ভক্তেরা তখন তাঁকে একখানা রলাঁ-প্রশস্তি উপহার দেন। এ-দেশ থেকে গাঁধী, জগদীশ বসু এঁরা সব লিখেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কি না ঠিক মনে পড়ছে না। বেনওয়া সায়েবও সে-কেতাবে একখানা প্রবন্ধ লিখেছিলেন—বিষয়বস্তু 'শান্তিনিকেতনের আশ্রম'। 'আশ্রম' শব্দে এসে বেনওয়া সায়েবের ফরাসী নৌকা বানচাল হয়ে গেল। 'আশ্রম' শব্দটা ফরাসীতে লিখবেন কি প্রকারে, অথচ ফরাসী ভাষায় 'আশ্রম' জাতীয় কোনো শব্দ নেই। আমি বললুম, 'প্যারিস শহর আর ব্রহ্মচর্যাশ্রম যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুই প্রান্তে অবস্থিত—অন্ততঃ ভাবলোকে—সে কথা সবাই জানে, তবু—ইত্যাদি।' বেনওয়া সায়েব ফরাসী কায়দায় শোলডার শ্রাগ করে বললেন, 'উঁহু বদহজম হবে।' সায়েব শেষটায় কি করে জাতরক্ষা আর পেট ভরানোর দ্বন্দ্ব সমাধান করেছিলেন সে-কথাটা এতদিন বাদে আজ আমার আর মনে নেই।

অর্থাভাববশতঃ একদা আমাকে কিছুদিনের জন্য এক ইংরেজ ব্যবসায়ীর ফ্রান্সাগত ফরাসী চিঠি-পত্রের অনুবাদ করে দিতে হয়েছিল। মনে পড়ছে, কারবারে ফরাসী পক্ষ হামেশাই ইংরেজ পক্ষকে দোষারোপ করতো যে ইংরেজ অনেক সময় আপন অভিসন্ধি সাফ সাফ বলে না। ইংরেজি ভাষায় শব্দসম্পদ প্রচুর বলে ইচ্ছে করলেই আপন বক্তব্য ঘোলাটে, আব্‌ছা আব্‌ছা করে লেখা যায়। ফরাসীতে সেটি হবার জো নেই। যা বলার সেটা পরিষ্কার হয়ে বেরবেই বেরবে (লক্ষ্য করে থাকবেন কাচ্চা-বাচ্চার শব্দ-সম্পদ সীমাবদ্ধ বলে তাদের কথায় সব জিনিসই হয় কালো নয় ধলা, সব কিছুই পরিষ্কার, কোনো প্রকারের হাফটোন নেই)। তাই ফরাসী এই চিঠিপত্র লেনদেনের ব্যাপারে পড়লো বিপদে।

কিন্তু ফরাসীরাও গম যব দিয়ে লেখাপড়া শেখে না। তাই শেষটায় ফরাসী কারবারি হুমকি দিল, সে ইংরেজ রেখে চিঠি-পত্র ইংরিজিতে লেখাবে। ইংরেজ হন্তদন্ত হয়ে চিঠি লিখল, 'সে কি কথা, আপনাদের বহুৎ তকলিফ হবে, বড্ড বেশী বাজে খর্চা হবে, এমন কম্ম করতে নেই।'

তখন একটা সমাঝাওতা হল।

* * *

Gepaeckaufbewahrungstelle !

শব্দটা শুনে মূর্ছা যাই আর কি !

প্রথমবার বার্লিন যাচ্ছি, জর্মন ভাষার জানি শুধু ব্যাকরণ, আর কণ্ঠস্থ আছে হাইনরিশ হাইনের গুটিকয়েক মোলায়েম প্রেমের কবিতা। সে-রেস্ত দিয়ে তো বার্লিন শহরে বেসাতি করা যায় না। তাই একজন ফরাসী সহযাত্রীকে ট্রেনে

বার্লিন পেঁছিবার কিছু আগে জিজ্ঞেস করলুম, 'ক্লোক-রুম' বা 'লেফট-লগেজ-অফিসের' জর্মন প্রতিশব্দ কি? বললেন—

Gepaeckaufbewahrungstelle!

প্রথম ধাক্কায়ই এ-রকম আড়াইগজী শব্দ মুখস্থ করতে পারবো, সে দুরাশা আমি করি নি। মসিয়োও আঁচতে পারলেন বেদনাটা—একখানা কাগজে টুকে দিলেন শব্দটা। তাই দেখালুম বার্লিন স্টেশনের এক পোর্টারকে। মাল সেখানে রেখে একটা হোটেল খুঁজে নিলুম। ভাগ্যিস 'হোটেল' কথাটা আন্তর্জাতিক—না হলে ক্লোক-রুমের তুলনায় হোটেলের সাইজ যখন পঞ্চাশগুণ বড় তখন শব্দটা পঞ্চাশগুণ লম্বা হত বই কি।

জর্মন ভাষার এই হল বৈশিষ্ট্য। জর্মন ইংরিজির মত দিল-দরিয়া হয়ে যত্রতত্র শব্দ কুড়োতে পারে না, আবার ফরাসীর মত শব্দতাত্ত্বিক বাত-ব্যামোও তার এমন ভয়ংকর মারাত্মক নয় যে উবু হয়ে দু'একটা নিত্যপ্রয়োজনীয় শব্দ কুড়োতে না পারে। শব্দ সঞ্চয় বাবদে জর্মন ইংরেজী ও ফরাসীর মাঝখানে। তার সম্প্রসারণক্ষমতা বেশ খানিকটা আছে; কিন্তু ইংরিজী রবরের মত তাকে যত খুশী টেনে লম্বা করা যায় না।

জর্মন ভাষার আসল জোর তার সমাস বানাবার কৌশলে আর সেখানে জর্মনের মত উদার ভাষা উপস্থিত পৃথিবীতে কমই আছে।

এই যে উপরের শব্দটা শুনে বিদগ্ধ পাঠক পর্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন সেইটেই নিন। Gepaeck অর্থ যা প্যাক করা যায়, অর্থাৎ লাগেজ, aufbewahrung অর্থ তদারকি করা (ইংরিজী beware কথা থেকে bewahrung); আর stelle কথার অর্থ জায়গা। একুনে হল 'লাগেজ তদারকির জায়গা'। জর্মন সবকটা শব্দকে আলাদা আলাদা রূপে বিলক্ষণ চেনে বলেই সমাসটার দৈর্ঘ্য তাকে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত করে না।

তুলনা দিয়ে বক্তব্যটা খোলসা করি।

"কিংকর্তব্যবিমূঢ়" কথাটার সামনে আমরা মোটেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হই নে। তার কারণ, কর্তব্য আর বিমূঢ় আমরাই হামেশাই ব্যবহার করি আর কিং কথাটার সঙ্গেও আমাদের ঈষৎ মুখ চেনাচেনি আছে। কাজেই সমাসটা ব্যবহার করার জন্য আমাদের বড্ড বেশী 'প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে'র প্রয়োজন হয় না। যারা সামান্যতম বাঙলা জানে না তাদের কথা হচ্ছে না, তারা 'নিত্যসা ফতেনা দিয়ামা' করে এবং ঘৃত-তৈল-লবণ-তণ্ডুল-বস্ত্র-ইন্ধনের সামনে ঘরপোড়া গোরুর মত সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়।

বড্ড বেশী লম্বা সমাস অবিশ্যি কাজের সুবিধে করে দেয় না। তাই যারা সমাস বানাবার জন্যই সমাস বানায় তাদের কচকচানি নিয়ে আমরা ঠাট্টা-মস্করা করি। জর্মনরাও করে। রাজনৈতিক বিসমার্ক পর্যন্ত সমাস বানাবার বাই নিয়ে ঠাট্টা করতে কসুর করেন নি। 'ড্রাগিস্ট' শব্দটা জর্মনে চলে, কিন্তু তার একটা উৎকট জর্মন সমাস স্বয়ং বিসমার্ক বানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

Gesundheitswiederherstellungsmittelzusammen' mischun-

gverhaeltnisskundiger.

টুকরো টুকরো করলে অর্থ হয়; 'স্বাস্থ্য,' 'পুনরায় দান,' 'সর্বভৈষজ', 'এক-সঙ্গে মেশানোর তত্ত্বজ্ঞান'। একুনে হবে 'স্বাস্থ্যপুনরদানসর্বভৈষজসংমিশ্রণ-শাস্ত্রজ্ঞ'।

(সমাসটায় কোনো ভুল থেকে গেলে বিদগ্ধ পাঠক বিরক্ত হবেন না—আমার সংস্কৃতজ্ঞান 'নিত্যসা ফতেমা' জাতীয়)।

সংস্কৃত ভাষা সমাস বানানোতে সুপটু, সে-কথা আমরা সবাই জানি এবং প্রয়োজনমত আমরা সংস্কৃত থেকে সমাস নিই, কিন্তু নতুন সমাস যদি বা আমরা বানাই তবু কেমন যেন আধুনিক বাংলায় চালু হতে চায় না। 'আলোকচিত্র', 'যাদুঘর', 'হাওয়া-গাড়ি' কিছুতেই চললো না।—ইংরিজি কথাগুলোই শেষ পর্যন্ত ঠেলে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকে আসন জাঁকিয়ে বসলো। দ্বিজেন্দ্রনাথ নির্মিত automobile কথার 'স্বতশ্চলশকট' সমাসটা চালানোর ভরসা আমরা অবশ্য কোনো কালেই করি নি।

বিশেষ করে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এ প্রস্তাবটি আমি উত্থাপন করেছি—এবং এতক্ষণ ধরে তারই পটভূমিকা নির্মাণ করলুম।

ভাষাকে জোরালো করার জন্য যে অকাতরে বিদেশী শব্দ গ্রহণ করতে হয়, সেকথা অনেকেই মেনে নেন, কিন্তু আপন ভাষারই দুটো কিংবা তারও বেশী শব্দ একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে যে তৃতীয় শব্দ নির্মাণ করে ভাষার শব্দভাণ্ডার বাড়ানো যায় সে দিকে সচরাচর কারো খেয়াল যায় না।

এই সমাস বাড়ানোর প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা কোনো কোনো ভাষার নেই। ইংরিজী ফরাসী কেঁদে-কুঁকিয়ে দৈবাৎ দু'একটা সমাস বানাতে পারে—যথা 'হাই-ব্রাও' 'রাঁদেভু'। এ প্রবৃত্তি যে ভাষার নেই, তার ঘাড়ে এটা জোর করে চাপানো যায় না।

বাংলার আছে, কিন্তু মরমর। এখানে শুদ্ধ সংস্কৃত সমাসের কথা হচ্ছে না—সে তো আমরা নিইই—আমি খাঁটি বাংলা সমাসের কথা ভাবছি। হুতোমের আমলেও অশিক্ষিত বাঙালী খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ দিয়ে খাস সমাস বানাতো। মেছুনি ডাকছে, "ও-'গামছা-কাঁধে,' দাঁড়া, ঐ হোথায় 'খ্যাংরা-গোঁপো' তোর সঙ্গে কথা কইতে চায়।"

একেই বলে সমাস! চট করে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কিন্তু আজকালকার লেখকেরা এরকম সমাসের দিকে নজর দেন না, নতুন সমাস গড়বার তকলিফ বরদাস্ত করতে তো তাঁরা বিলকুল নারাজ বটেনই। সমাস বানাবার প্রবৃত্তিটা অনাদরে ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে, কারণ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকেরা যদি দিশী সমাসকে আপন লেখনে স্থান না দেন, তবে ক্রমে ক্রমে গোটা প্রবৃত্তিটা বেমালুম লোপ পায়—যে-রকম বাউল-ভাটিয়ালী সাহিত্যিকদের কাছে সম্মান পাচ্ছে না বলে ক্রমেই উপে যাচ্ছে—পরে যখন হুঁশ হয় ততদিনে ভাষায় লড়াইয়ের একখানা উমদা-সে উমদা হাতিয়ার অবহেলায় মর্চে ধরে শেষ হয়ে গেছে। তখন শুধু মাথা-চাপড়ানো আর কান্নাকাটি।

রবীন্দ্রনাথ এ তত্ত্বটা শেষ বয়সে বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই শেষ রাতেই ওস্তাদের মার দেখিয়ে গিয়েছেন :—

'ডাকছে থাকি থাকি
ঘুমহারা কোন্ 'নাম-না-জানা' পাখী,
দক্ষিণের 'দোলা-লাগা', 'পাখী-জাগা'
বসন্ত প্রভাতে'

তাই বলি বাঙ্গলা ভাষা 'লক্ষ্মীছাড়া,' 'হতভাগা' নয়! শুধু হাতীর মত আমরা নিজেদের তাগদ জানি নে

মার্জারনিধন কাব্য
বা
গুরবে কুশ্ তন শব-ই আওওয়ল

কোন্ দেবে পূজা করি কোন্ শীনী ধরি ?
গণপতি, মৌলা-আলী, ধূর্জটি, শ্রীহরি ?
মুশকিল্-আসান্ আর মুর্শিদ মস্তান্
কোম্পানী কি মহারানী, ইংরেজ, শয়তান ?
হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, যেবা আছ যথা
ইস্পাহানী, ডালমিঞা—কলির দেবতা।
সবারে স্মরণ করি সিতুমিঞা ভনে
বেদরদ বেধড়ক ভয় নাহি মনে ॥

ইরান দেশের কেচ্ছা শোন সাধুজন
বেহদ্ রঙীন কেচ্ছা, বহুৎ বরণ।
এন্তার তালিম পাবে করিলে খেয়াল
রোশনী আসিবে দিলে ভাঙিয়া দেয়াল।
পুরানা যদিও কেচ্ছা তবু হর্কৎ
সমঝাইয়া দিবে নয়া হাল হকীকৎ ॥

ইরান দেশেতে ছিল যমজ তরুণী।
ইয়া রঙ, ইয়া ঢঙ, নানা গুণে গুণী।
কোথায় লায়লী লাগে কোথায় শিরীন
চোখেতে বিজলী খেলে ঠোঁটে বাজে বীণ।
ওড়না দুলায়ে যবে দুই বোন যায়
কলিজা আছাড় খায় জোরা রাঙা পায়।
এ্যাসা পীরিতি তোলে ফকিরেরও জানে
বেহুঁশ হইয়া লোক তারীফ বাখানে।

দৌলতও আছিল বটে বিস্তরে বিস্তর
বাপ দাদা রাখি গেলা চাকর-নফর।
ধন জন ঘর বাড়ী তালাব খামার
টাকা কড়ি জওয়াহর এন্তারে এন্তার।
তাই দুই নারী চায় থাকিতে আজাদ
কলঙ্কের ভয়ে শুধু বিয়ে হৈল সাধ।
তখন সে করিল শর্ত সে বড় অদ্ভুত
সে শর্ত শুনিলে ডর পায় যমদূত।
বলে কিনা প্রতি ভোরে মিঞার গর্দনে
পঞ্চাশ পয়জার মারি রাখিবে শাসনে।
এ বড় তাজ্জব বাৎ বেতালা বদ্‌খদ্‌
এ শর্ত মানিবে কেবা হয় যদি মর্দ্‌?
দুল্‌হা বরেতে ছিল পাড়া ছয়লাপ
শর্ত শুনে পত্রপাঠ হয়ে গেল সাফ।
সিতু মিঞা বলে সাধু এ বড় কৌতুক
মন দিয়া কেচ্ছা শোনো পাবে দিলে সুখ॥

শীত গেল বর্ষা গেল আসিল বাহার
ফুলে গুলে ইস্‌ফাহান হৈল গুলজার।
শীরাজ তব্রীজ আর আজর বৈজান
খুশীতে ভরপুর ভেল জমিন আসমান।
শুধু দুই ভাই নাম ফিরোজ মতীন
পেটের ধান্দায় মরে দুঃখে কাটে দিন।
অবশেষে ছোট ভাই বলে ফিরোজেরে
"কি করে বাঁচিবে বলো, কি হবে আখেরে।
তার চেয়ে জুতা ভালো চলো দুই জনে
শাদী করি পেট ভরি দু মেয়ের সনে।"
দুআভুআ ফিরোজের মন মাঝে হয়
শাদীতে আয়েশ বটে জুতারও তো ভয়।
হদীসের লাগি ঘাঁটে কুরান পুরাণ
দীন সিতু মিঞা ভণে শুনে পুণ্যবান॥

মজলিস জৌলুস করি দুনিয়া রওশন
জোড়া শাদী হয়ে গেল খুশ ত্রিভুবন।
চলি গেলা দুই ভাই ভিন্ন হাবেলিতে
মগ্ন হইলা মত্ত হইলা রসের কেলিতে।

পয়জারের ভয়ে নারি করিতে বয়ান
সিতু ভণে চুপিসাড়ে শুনে পুণ্যবান ॥

তিন মাস পরে বুঝি খুদার কুদ্রতে
আচম্বিতে দু ভায়েতে দেখা হল পথে।
কোলাকুলি গলাগলি গিনা কলিজায়
মরি মরি মেলামেলি করে দুজনায়।

"তোমার মাথায় টাক নেই কেন ?
শুধায় ফিরোজ ভাই
মানিয়া তাজ্জব উত্তরে মতীন
"টাক কেন বলো তাই ?"
কাঁচুমাচু হয়ে পুছিল ফিরোজ
"জোরে কি মারে না চটি ?"
"আরে দুত্তোর হিম্মত কাহার
আমি কি তেমনি বটি ?
বাখানিয়া বলি শোন কান পেতে
তরতিব কাহারে কয়।
আজব দুনিয়া আজব চিড়িয়া
মামেলা ঝামেলা ময়।
তাই বসিলাম তলওয়ার হাতে
বীবী দিলা খানা আনি
কোর্মা পোলাও তন্দুরী মুর্গী
ঢাকাই বাখরখানী।
খানা আইল যেই বীবীর পেয়ারা
বিড়াল আসিল সাথে
যেই না করিল মরমিয়া 'ম্যাঁও'
খাপটা না তুল্যা হাতে,—
খুল্যা তলোয়ার এক কোপে কাট্যা
ফালাইনু কল্লাডারে
তাজ্জব বীবী আক্কেল গুড়ুম
জবানে রা'টি না কাড়ে।
গুস্সা কৈরা কই 'এসব না সই
মেজাজ বহুৎ কড়া
বরদাস্ত নাই বিলকুল আমার
তবিয়ৎ আগুনে গড়া।'

তার পর কার ঘাড়ে দুইডা মাথা
করিবে যে তেড়িমেড়ি ?"
সিতু মিঞা কয় নিশ্চয় নিশ্চয়
বাঘিনী পরিল বেড়ি।

"ক্যাবাৎ", "ক্যাবাৎ" বলি হাওয়া করি ভর
চলিলা ফিরোজ মিঞা পেঁাছি গেলা ঘর।
মিলেছে দাওয়াই আর আন্দেশা তো নাই
খুদার কুদ্রতে ছিল তালেবর ভাই।
তার পর শোনো কেচ্ছা শোনো সাধুজন
ঠাস্যা দিল সেই দাওয়া পুলকিত মন।
সে রাতে খানার ওক্তে খুল্যা তলোয়ার
কাট্যা না ফালাইল মিঞা কল্লা বিল্লিডার।
চক্ষু দুইডা রাঙ্গা কর্যা হুঙকারিয়া কয়
"তবিয়ৎ আমার বুরা গর্বড় না সয়।
হুঁশিয়ার হয়ে থেকো নয় সর্বনাশ।"
সিতু মিঞা শুনে কয়, শাবাশ শাবাশ ॥
হায়রে বিধির লেখা, হায়রে কিস্মৎ
জহর হইয়া গেল যা ছিল শর্বৎ।
ভোর না হইতে বীবী লয়ে পয়জার
মিঞার বুকেতে চড়ি কানে ধরি তার।
দমাদম মারে জুতো দাড়ি ছিঁড়ে কয়
"তবিয়ৎ তোমার বুরা, বরদাস্ত না হয় ?
মেজাজ চড়েছে তব হয়েছ বজ্জাৎ ?
শাবুদ করিব তোমা শুনে লও বাৎ
আজ হৈতে বেড়ে গেল রেশন তোমার
পঞ্চাশ হৈতে হৈল একশ' পয়জার।"
এত বলি মারে কিল মারে কানে টান
ইয়াল্লা ফুকারে সিতু, ভাগ্যে পুণ্যবান ॥
কোথায় পাগড়ী গেল কোথায় পাজামা
হোঁচট খাইয়া পড়ে কভু দেয় হামা।
খুন ঝরে সর্ব অঙ্গে ছিঁড়ে গেছে দাড়ি
ফিরোজ পেঁাছিল শেষে মতীনের বাড়ি।
কাঁদিয়া কহিল, "ভাইয়া কি দিলি দাওয়াই
লাগাইনু কামে এবে জান যায় তাই।"
বর্ণিল তাবৎ বাৎ, মতীন শুনিল
আদর করিয়া ভায়ে কোলে তুলি নিল।

বুলাইয়া হাত মাথে বুলাইয়া দেহ
"বিড়াল মেরেছে" কয়, "নাই তো সন্দেহ।
ব্যাকরণে তবু, দাদা, কৈলা ভুল খাঁটি।
বিলকুল বরবাদ সব গুড় হৈল মাটি।
আসলে এলেমে তুমি করোনি খেয়াল
শাদীর পয়লা রাতে বধিবে বিড়াল।"
বাণীরে বন্দিয়া বন্দিয়া বান্ধিলো বয়ান
দীন সিতু মিঞা ভণে শুনে পুণ্যবান ॥

* * *

মল্লিনাথস্য { স্বরাজ লাভের সাথে কালোবাজারীরে
মারনি এখন তাই হাত হানো শিরে।
শাদীর পয়লা রাতে মারিবে বিড়াল
না হলে বর্বাদ সব, তাবৎ পয়মাল ॥*

বেদে

ঝাড়া বিয়াল্লিশ বছর মিশরে চাকরি করার পর ইংরেজ রাস্‌ল, পাশা (পাশা খেতাবটি তিনি মিশরীয় সরকারের কাছ থেকে পান) একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছেন। সা'দ জগলুল পাশা থেকে আরম্ভ করে বহু বাঘ বহুৎ চিড়িয়ার সঙ্গে তাঁর বিস্তর যোগাযোগের ফলে এই কেতাবখানি লেখা হয়েছে।

এমন কি বেদেরাও এ বইয়ে বাদ পড়ে নি। রাস্‌ল্‌ পাশার মতে মিশরের বেদেরা আসলে ভারতীয়। শুধু তাই নয়, রাস্‌ল্‌ পাশা পৃথিবীর আর সব পণ্ডিতদের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন পৃথিবীর সব বেদেরই ভাষা নাকি আসলে ভারতীয়—তা সে ইয়োরোপীয় বেদেই হোক্‌ আর চীনে বেদেই হোক্‌।

পণ্ডিত নই, তাই চট্‌ করে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। ইয়োরোপীয় বেদেরা ফর্সায় প্রায় ইংরেজের শামিল, সিংহলের বেদে ঘনশ্যাম। আচার-ব্যবহারেও বিস্তর পার্থক্য, বহুৎ ফারাক। আরবিস্থানের বেদেরা কথায় কথায় ছোরা বের করে, জর্মনীর বেদেরা ঘুষি ওঁচায় বটে, কিন্তু শেষটায় বখেড়ার ফৈসালা হয় বিয়ারের বোতল টেনে। চীন দেশের বেদেরা নাকি রুপালি ঝরণাতলায় সোনালী চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চুকুস চুকুস্‌ করে সবুজ চা চাখে।

তবু আজ স্বীকার করি গুণীরাই হক্‌ কথা বলেছেন ॥

* * *

* ইরানে এ কাহিনী সবিস্তরে বলা হয় না। শুধু বলা হয়, 'গুরবে কুশতন, শব-ই-আওওয়ল' অর্থাৎ গুরবে=বিড়াল, কুশতন=মারা, শব=রাত্রি, আওওয়ল=প্রথম। সোজা বাঙলার 'পয়লা রাতেই মারবে বিড়াল।'

আমার বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ। আজ যেখানে জর্মনীর রাজধানী, সেই সাদা-মাটা বন্ন্ (Bonn) শহরে আমি তখন কলেজ যাই। এগারোটার ঝোঁকে কলেজের পাশের কাফেতে বসে এক পাত্র কফি খাই। ও সময়টায় বনের মত আধা-ঘুমন্ত পুরীর কাফেতে খদ্দেরের ঝামেলা লাগে না। খদ্দের বলতে নিতান্ত আমারই মত দু'একটি কফি-কাতর প্রাণী।

সেদিনও তাই। আমি এক কোণে কফি সাঙ্গ করে উঠি-উঠি করছি, এমন সময় অন্য কোণের কাউণ্টারে, আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল এসে এক বেদেনী। গোলাপী স্কার্ট, বেগুনি ব্লাউজ, লাল-নীলে ডোরা-কাটা স্কার্ফ, মিশকালো খোঁপাবাঁধা চুল। কেক্ আর কফির গুঁড়ো কিনতে এসেছে।

সওদা শেষ হয়ে গেলে পর যখন সে ঘুরে দাঁড়াল তখন হঠাৎ তার চোখ পড়ল আমার উপর। প্রথমটায় থ হয়ে তাকিয়ে রইল প্যাট প্যাট করে। তারপর কি এক বিজাতীয় ভাষায় চীৎকার করে সোল্লাসে এগিয়ে এল আমার দিকে। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় সর্বমুখ টমাটোর মত লাল করে অনর্গল বকে যেতে লাগল সেই 'যাবনিক' ভাষায়। সে ভাষা আমার চেনা-অচেনা কোনো ভাষারই চৌহদ্দি মাড়ায় না, কিন্তু শোনালো—তারই মুখের মত —মিষ্টি।

আমি জর্মনে বললুম, 'আমি তো আপনার ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

মেয়েটি মুখ করল আরও লাল। বুঝলুম, চটেছে। ফের চলল সেই তুবড়ী বাজী—সেই বিজাতীয় বুলিতে। কিছুতেই জর্মন বলতে রাজী হয় না।

আমি কাতর হয়ে কাফের মালিককে বললুম, 'একে বুঝিয়ে বলুন না, আমি ভারতীয়। এর ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

আমার সকরুণ নিবেদনটা শেষ হওয়ার পূর্বেই মেয়েটা হুঙ্কার দিয়ে কাফে-ওয়ালাকে পরিষ্কার জর্মনে বলল, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। আমরা বেদে, ভারতবর্ষ আমাদের আদিম ভূমি। এও ভারতীয়। আমার জাত-ভাই। ভদ্রলোক সেজেছে, তাই আমার সঙ্গে কথা কইতে চায় না।'

আমি আর কি বলব? পণ্ডিতেরাও তো এই মতই পোষণ করে। তবু বললুম, 'কিন্তু সত্যি বলছি, আমি আপনার ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

চোখে-মুখে—এমন কি আমার মনে হল চুলে পর্যন্ত—ঘেন্না মেখে মেয়েটা গটগট করে কাফে থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বোকা বনে তাকিয়ে রইলুম।

কয়েক মিনিট পরে জানলার দিকে নজর যেতে দেখি সেই মেয়েটি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কফির দাম পূর্বেই চুকিয়ে দিয়েছিলুম—চুপ করে বেরিয়ে পড়ে তার মুখোমুখি হলুম।

ধবধবে দাঁতে হাসির ঝিলিক লাগিয়ে আমায় অভ্যর্থনা করে নিয়ে বললো—দুত্তোর ছাই আমার সেই বিজাতীয় ভাষায়—কি বললো, খোদায় মালুম। গড় গড় করে চোখে-মুখে হাসি মেখে, সুডোল দু'খানি বাহু দুলিয়ে, সর্বাঙ্গে সৌন্দর্যের ঢেউ তুলে।

আমি আবার জর্মনে বললুম, 'সত্যি ফ্রলাইন (কুমারী), আমি তোমার ভাষা বুঝতে পারছি নে।'

কেউটে সাপের মতো ফণা তুলে যেন আমাকে ছোবল মারতে এল। আমি তড়াক করে তিন কদম পিছিয়ে গেলুম।

হঠাৎ মেয়েটা কি যেন ভেবে নিয়ে আবার হাসি মুখে বলল,—যাক্ বাঁচাল, এবার জর্মনে—'সব মানুষেরই কিছু-না-কিছু পাগলামি থাকে, তোমার বুঝি মাতৃভাষায় কথা না বলার? তা আমি সেটা সয়ে নিলুম। কিন্তু কেন এ স্নবারি, আপন ভাষাকে অবহেলা, কাফের লোকের সামনে আপন জনকে অস্বীকার করা? তাই তো তোমাকে বাইরে ডেকে আনলুম।'

আমি বললুম, 'তোমার আপন জন হতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমি তো তা নই।

ফের ফণা তুলতে গিয়ে নিজেকে চেপে নিয়ে বলল, 'তোমার আপন জন নই আমি? দেখো দিকিনি তোমার রঙ আর আমার রঙ মিলিয়ে—একই বাদামী না? হাঁ, আমার একটু সোনালী বটে—তা সে আমি রোদবৃষ্টিতে ঘোরাঘুরি করি বলে। দেখো দিকিনি চুলের রঙ—মিশকালো, ঢেউখেলানো। নিজের চোখে দেখনি কখনো আয়না দিয়ে?—আমার চোখের রঙ তোমারই মত কালো। আর সব জর্মনদের দিকে তাকিয়ে দেখো, হাবা-গবার দল, শ্বেত কুষ্ঠের মত সাদা, মাগো!'

আমি চুপ।

বলল, 'বুঝতে পেরেছি, বাপু, বুঝতে পেরেছি; বাপ তোমার দু'পয়সা রেখে গিয়েছে—হঠাৎ-নবাব হয়েছ। এখন আর বেদে বলে পরিচয় দিতে চাও না—হাতে আবার খাতাপত্র—কলেজ যাও বুঝি? ভদ্রলোক সাজার শখ চেপেছে, না?'

আমি বললুম, 'ফ্রলাইন, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার সাতপুরুষ লেখাপড়া করেছে, আমিও তাই করছি। ভদ্রলোক সাজা-না-সাজার কোনো কথাই উঠছে না।'

মেয়েটি এমনভাবে তাকালো যার সোজা অর্থ 'গাঁজা গুল'। জিজ্ঞেস করল, তুমি ভারতীয় নও?'

আমি বললুম, 'আলবাৎ!'

আনন্দের হাসি হেসে বলল, 'ভারতীয়েরা সব বেদে।'

আমি বললুম, 'সুন্দরী, তোমরা ভারতবর্ষ ছেড়েছ হাজার দু'হাজার বছর কিংবা তারও পূর্বে। বাদবাকী ভারতীয়রা এখনো গেরস্থালী করে।'

কিছুতেই বিশ্বাস করে না। বলল, 'তোমার সঙ্গে আর কাঁহাতক খামকা তর্ক করি। তার চেয়ে চলো আমার সঙ্গে। আমাদের সার্কাসের গাড়ি শহরের বাইরে রেখে এসেছি। বাবা, মা সেখানে। তোমাকে পেলে ভারি খুশী হবেন। তাঁদের সঙ্গে তর্ক করো। তখন বুঝবে ঠ্যালা কারে কয়। বাবা সব জানে। কাচের গোলার দিকে তাকিয়ে তোমাকে সব বাৎলে দেবে।'

অনেকক্ষণ ধরে এ রকম ধারা কথা হয়েছিল। আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না, আমি বেদে নই, স্নব নই, সাদা-মাটা ভারতীয়।

* * *

এ-কথাটা কিন্তু সেদিন সাফ বুঝে গেলুম, দু'হাজার কিংবা তার বেশি বছর ধরে যাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি তারা যদি বিদেশ-বিভূঁইয়ে দেখামাত্র আমাকে ডাক দিয়ে বলে, 'তুমি আমাদের আপন জন', তখন কি করে বুক ঠুকে বলি—যদিও জানি, আজ আমাদের ভাষা আলাদা, আচার-ব্যবহার আলাদা—যে ওরা ভারতীয় নয় ? ?

ভাষাতত্ত্ব

প্যারিসে রেস্তরাঁয় বসে আছি। নিতান্ত একা ; যাঁদের আসবার কথা ছিল তাঁরা আসেন নি। এমন সময় একটি অতি সুপুরুষ এসে আমারই টেবিলের একখানা শূন্য চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন—অবশ্য প্রথমে ফরাসী কায়দায় বাও করে, আমার অনুমতি নিয়ে।

নিতান্ত মুখোমুখি তদুপরি কাত্তিকের মত চেহারাখানা—বার বার আমার মুগ্ধ চোখ তাঁর চেহারার দিকে ধাওয়া করছিল। তিনিও নিশ্চয়ই এ রকম পরিস্থিতিতে জীবনে আরো বহুবার পড়েছেন ; কি করতে হয় সেটা তাঁর রপ্ত আছে।

সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলছেন, 'ইচ্ছে করুন।'

আমি ধন্যবাদ জানালুম।

জিজ্ঞেস করলেন, 'ফরাসীটা বলতে পারেন তো ? আমি তো আর কোনো ভাষা জানি নে।'

আমি বললুম, 'ফরাসী ভাষাটা সব সময় ঠিক বুঝতে পারি কি না বলা একটু কঠিন। এই মনে করুন, কোনো সুন্দরী যখন প্রেমের আভাস দিয়ে কিছু বলেন, তখন ঠিক বুঝতে পারি আবার যখন ল্যান্ডলোর্ড ভাড়ার জন্যে তাগাদা দেন তখন হঠাৎ আমার তাবৎ ফরাসী ভাষাজ্ঞান বিলকুল লোপ পায়।'

উচ্চাঙ্গের রসবিকাশ হল না সে কথা আমার সুরসিক পাঠকেরা বুঝতে পেরে নিশ্চয়ই একটুখানি স্মিতহাস্য করবেন। আমিও এ-কথা জানি, কিন্তু বিদেশে যখন মানুষ নিতান্ত একা পড়ে এবং রাম, শ্যাম যে-কোনো কারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব জমাতে চায় তখন ঐ হল একমাত্র পন্থা, অর্থাৎ তখন কাঁচা, পাকা যে-কোনো প্রকারের রসিকতা করে বোঝাতে হয় যে, আমি তখন সঙ্গসুখলিপ্সু।

ফরাসী ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'দেশভ্রমণ বড় ভাল জিনিস। বিদেশে ভাষা নিয়ে এ ভানটা অনায়াসে করা যায়। আমি করি কি প্রকারে ? আমি যে ফরাসী সে তো আর বেশীক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারি নে।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'সে না হয় হল। কিন্তু বলুন তো, শব্দার্থ

আপনি ঠিক ঠিক বুঝতে শিখেছেন? এই যদি আমি বলি যে, আমি "জার্নালিস্ট" তাহলে তার মানে কি হল?'

একগাল হেসে বললুম, 'তা আর জানি নে? তার মানে হল আপনি খবরের কাগজে লেখেন।'

'উঁহু, হল না। ঠিক তার উল্টো; আমি লিখি নে। সে কথা যাক। আরেকটি উদাহরণ দি। আমি যদি বলি, "আচ্ছা তা হলে আরেকদিন দেখা হবে", তবে তার মানে কি?'

আমি এবারে আরেক গাল আর হাসলুম না; বললুম, 'তার মানে আরেক দিন দেখা হবে, এতে আর অস্পষ্টতাটা কোথায়?'

বললেন, 'ফেল্!' তার মানে হল, "আপনি এবারে দয়া করে গাত্রোৎপাটন করুন।"

আমি খুশী হয়ে বললুম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরাও যখন বাঙলায় বলি, "এবার তুমি এসো" তখন তার অর্থ "তুমি এবারে কেটে পড়ো।"

'ঠিক ধরেছেন। তাই বলছিলুম, আমি জার্নালিস্ট; কিন্তু না-লেখার জন্য লোকে পয়সা দেয়। খুলে কই।

'এই ধরুন কয়েক মাস আগে খবর পেলুম, আমাদের ডাকসাইটে রাজনৈতিক মসিয়ো অনুস্বার একটি রমণীর সঙ্গে ঢলাঢলি করছেন। ওদিকে বাজারে তাঁর সুনাম আর খ্যাতি অতিশয় ধর্মভীরুরূপে—কোথায় জানি নে গির্জে মেরামত করে দিয়েছেন, কোন্ সেণ্টের জন্মদিনে জাব্বাজোব্বা পরে পরবে পয়লা নম্বরী বনেছিলেন এইরকম ধারা কত কি? আমি খবরটা শুনে বললুম, "বটেরে স্যাঙাৎ, দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি।"

'করলুম কি, লাগলুম তত্ত্ব-তাবাশে। ডাক্তাররা নাকি এক্স-রে দিয়ে পেটের মধ্যিখানের ছবি তোলেন? স্রেফ গাঁজা; তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী নাড়ী-ভুঁড়ির খবর মেলে কয়েক আউন্স রুপো ঢেলে, সোনা ঢাললে তার চেয়েও ভালো।

'সেই নর্তকীর নামধাম সাকিন ঠিকানা হাড়হদ্দের তাবৎ খবর পেয়ে গেলুম এক হপ্তার ভিতর।'

সিগারেট ধরাবার জন্য কথা বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু এ কর্মে একটুখানি খাবসুরৎ হতে হয়। আমি—' বলে থামলেন।

আমি বললুম, 'আপনার চেহারা সম্বন্ধে কি আর বলব—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ।'

তারপর করলুম কি জানেন, একপ্রস্ত উত্তম সুট পরে, গোঁফে আতর মেখে লেগে গেলুম নর্তকীর পিছনে। প্রেমের কবিতাগুলো ঝালিয়ে নিলুম আচ্ছা করে, টাঙ্গো ওয়ালটস নাচের নবীনতম "অবদানগুলো" রপ্ত করে নিয়ে দিলুম হানা। জানতুম, রাজনৈতিক মসিয়ো অনুস্বারের টাকার জোয়ারের উপর আমি থাড্ডো কেলাস খোলামকুচি, কোথায় ভেসে যাব কেউ পাত্তাটি পাবে না, কিন্তু খোলামকুচি না হয়ে যদি পদ্মফুল হই—চেহারাটা বিবেচনা করুন—তা

হলে নর্তকী কি কি একটুখানি মোলায়েম হবেন না ?

আমি অবিশ্যি নর্তকীকে প্রিয়ারূপে চিরকালের জন্য জিতে নিতে চাই নি। মসিয়ো অনুস্বার তাকে নিয়ে প্রেমসে প্রেমের ঢলাঢলি করুন আমার তাতে নস্যি। আমি শুধু চাই একটুখানি খবর।

কিছুটা ভাবসাব হয়ে যাবার পর আমি আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলুম যে, তিনি যদি অন্য সূত্র থেকে অর্থাৎ অনুস্বারের কাছ থেকে টাকা মারেন তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তিনি দু ঘোড়া না চড়ে আড়ই শ'টা চড়ুন আমি আপনাদের দেশের ফকিরের মত নির্বিকার। আমি একটুখানি প্রেমেই খুশী।

'কাজেই আস্তে আস্তে প্রেমের নেশায় বানচাল হয়ে নর্তকী খবর দিয়ে ফেললেন, কোন্ হোটেলে কবে তাঁরা গোপনে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করেছেন, কোন্ ইয়েটে কবে ক'দিন ক'রাত্তির কাটিয়েছেন। সেই খেই ধরে তাবৎ গোপনীয় খবর যোগাড় করে গেলুম, অনুস্বারের কাছে। তাঁকে বললুম, "নিছক সাহিত্যের খাতিরে আমি তাঁর জীবনী লিখতে চাই, তাতে অবশ্য নর্তকী সম্পর্কীয় কিঞ্চিৎ প্রামাণিক সংবাদও থাকবে। তবে কিনা, কিছু অর্থ পেলে আমি এসব ছাপবো না।"

অনুস্বারে জউরি এবং ঘড়েল লোক। যেসব হোটেলে জাল সই করেছেন তার ফোটোগ্রাফ দেখে বুঝলেন আমিও কাঁচা নই।'

তাপপর বললেন, 'লিখি নি বলেই তো টাকা পেলুম, হাজার দশেক। যাক্‌গে, এখন আমি চললুম।'

ব্যাপারটা বুঝতে আমার মিনিট খানেক লাগল। তখন ছুটে গিয়ে তাঁকে বললুম, 'এটা কি তবে ব্ল্যাক-মেলিং হল না ?'

হেসে বললেন, 'অর্থাৎ "না-লিখিয়ে জার্নালিস্ট"। তাই তো বলছিলুম, ভাষা জিনিসটে অদ্ভুত।'

আমি স্বয়ং জার্নালিস্ট—আঁৎকে উঠলুম ॥

সিনিয়ার এপ্রেন্টিস্

কোনো কোনো ধর্মগ্রন্থ যত পুরনো হয় তাদের কদর ততই বেড়ে যায়। নতুন যুগের লোক সে সব গ্রন্থ থেকে নতুন সমস্যার অতি প্রাচীন এবং চিরন্তন সমাধান পায় বলে তারা সব কেতাবকে অনায়াসে হার মানায়। শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, কোনো কোনো গল্পও অজরামর হয়ে থাকে ঐ একই কারণে। তারই একটা অতি মর্মান্তিকভাবে কাল মনে পড়ে গেল—কুড়িটি টাকা জেবে নিয়ে বাজার ঘুরে এলুম, ধুতি পেলুম না। গল্পটি হয়ত অনেকেই জানেন—তাঁরা অপরাধ নেবেন না।

গণেশ বেচারী এপ্রেন্‌টিস্ মাইনে পায় না। কাজ শিখছে, এর ধাঁতানি ওর গুঁতানি চাঁদপানা মুখ করে সয়। আশা, একদিন পাকাপাকি চাকরি, মাইনে সব

কিছুই পাবে। চাকরি খালি পড়লও, কিন্তু বড়বাবু সেটা দিয়ে দিলেন তাঁর শালীর ছেলেকে—সে কখনো এপ্রেন্‌টিসি করে নি। বড়বাবু গণেশকে ডেকে বললেন, 'বাবা গণেশ, কিছু মনে করো না ; এ চাকরিটা নিতান্তই অন্য একজনকে দিয়ে দিতে হল। আসছেটা তোমাকে দেব নিশ্চয়ই।'

কাকস্য পরিবেদনা, আবার চাকরি খালি পড়ল, বড়বাবু ফের ফক্কিকারি মারলেন, গণেশকে ডেকে আবার মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজালেন। এমনি করে দেদার চাকরি গণেশের সামনে দিয়ে ভেসে গেল, তার এপ্রেন্‌টিসির আঁকশি দিয়ে একটাকেও ধরতে পারল না। শেষের দিকে বড়বাবু আর গণেশকে ডেকে বাপুরে, বাছারে বলে সান্ত্বনা মালিশ করার প্রয়োজনও বোধ করেন না।

গণেশের চোখ বসে গেছে, গাল ভেঙে গেছে, রগের চুলের দু'এক গাছায় পাক ধরলো, পরনের ধুতি ছিঁড়ে গিয়েছে, জামাটা কোনো গতিকে গায়ে ঝুলে আছে। গণেশ এ-টুলে ও-টুলে, এর কাজ, ওর ফাইফরমাশ করে দেয়—আর করে করে আপিসের বেবাক কাজ তার শেখা হয়ে গেল। চাকুরি কিন্তু হল না।

এমন সময় বড় সাহেব একদিন বড়বাবুকে দোতলায় ডেকে বললেন, 'আমায় একটা জরুরী রিপোর্ট লিখে আজকেরই মেল ধরতে হবে। কেউ যেন ডিস্‌টার্ব না করে। দরজার গোড়ায় একজন পাকা লোক বসিয়ে দাও, কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়।'

দরোয়ানরা সেদিন করেছিল ধর্মঘট। বড়বাবু গণেশকে দিলেন দোরের সামনে বসিয়ে। বললেন, 'কিছু মনে করো না বাবা গণেশ, হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ', ইত্যাদি। গণেশ টুলে বসে ছেঁড়া ধুতিতে গিঁট দিতে লাগল।

এমন সময় নিচের রাস্তায় হৈহৈ রৈরৈ। এক বদ্ধ পাগল রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, পরনে কপ্পিনটুকু পর্যন্ত নেই—ইংরেজিতে যাকে বলে 'বার্থ-ডে-স্যুট'—আর পিছনে রাস্তার ছোঁড়ারা তাকে লেলিয়ে লেলিয়ে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হবি তো হ, পাগলা করল গণেশের আপিসের দিকেই ধাওয়া। সিঁড়ি ভেঙে উপরের তলায় উঠে ঢুকতে গেল বড় সাহেবের ঘরে। গণেশ টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কিন্তু পাগলকে বাধা দিল না।

মারমার কাটকাট কাণ্ড। পাগলের পিছনে পিছনে ছোঁড়াগুলোও গিয়ে ঢুকেছে বড়সাহেবের ঘরে। চীৎকার চেঁচামেচি। পাগলা আবার সাহেবকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ফেলে রিভলভিং-টিল্‌টিঙ চেয়ারে বসতে চায়।

তাই দেখে কেউ বদ্যি ডাকে
কেউ বা ডাকে পুলিশ,
কেউ বা বলে কামড়ে দেবে
সাবধানেতে তুলিস !

শেষটায় পুরো লালবাজার এসে ঘর সাফ করল।

সায়েব রেগে কাঁই। বড়বাবুকে ধরে তো এই-মার কি তেই-মার লাগান আর কি। বলেন 'তুমি একটা ইডিয়েট, আর দোরে বসিয়েছিলে তোমার মত একটা ইম্বেসাইলকে। কোথায় সে, ডাকো তাকে।'

গণেশ এসে সামনে দাঁড়াল।

সায়েব মারমুখো হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইউ প্রাইজ-ইডিয়েট, পাগলকে তুমি ঠেকালে না কেন?'

গণেশ বড় বিনয়ী ছেলে। বললে, 'আমি ভেবেছিলুম, উনি আমাদের আপিসের সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস্‌। আমি তো জুনিয়র, ওঁকে ঠ্যাকাবো কি করে?

সাহেব তো সাত হাত পানিমেঁ। বললেন, 'হোয়াড্যু মীন বাই দ্যাট?'

গণেশ বললে, 'হুজুর, আমি তিন বৎসর ধরে এ আপিসে এপ্রেন্‌টিসি করছি। খেতে পাই নে, পরতে পাই নে। এই দেখুন ধুতি। ছিঁড়ে ছিঁড়ে পট্টি হয়ে গিয়েছে। লজ্জা ঢাকবার উপায় নেই। তাই যখন এঁকে দেখলুম, আমাদের আপিসে ঢুকছেন, একদম অবস্তর উলঙ্গ, তখন আন্দাজ করলুম, ইনি নিশ্চয়ই এ-আপিসের সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস্‌। তা না হলে তাঁর এ অবস্থা হবে কেন? এখানে এপ্রেন্‌টিসি করে করে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস্‌ হয়েছেন।'

* * *

১৯৪৭ সালে স্বরাজ লাভ হয়। আমাদের এপ্রেন্‌টিসি তখন শুরু হয়। তখনো পরনে ধুতি ছিল, গায়ে জামা ছিল। আর আমাদের সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস হওয়ার বেশী বাকী নেই। সবই আল্লার কেরামতী।

দাম্পত্য জীবন

যাঁদের ঝড়তি-পড়তি মালা কুড়িয়ে নিয়ে ভাঙিয়ে খাচ্ছি—অর্থাৎ 'পঞ্চতন্ত্র' তৈরি করছি তাঁদের সঙ্গে 'দেশে'র পাঠক-পাঠিকার যোগসূত্র স্থাপন করার বাসনা এ-অধমের প্রায়ই হয়। তাঁদেরই একজন আমার এক চীনা-বন্ধু। সত্যকার জহুরী লোক—লাওৎসে, কন-ফুৎসিয়ে টৈ-টম্বুর হয়ে আছেন। তত্ত্বালোচনা আরম্ভ হলেই শাস্ত্রবচন ওষ্ঠাগ্রে। আমি যে পদে পদে হার মানি সে-কথা আর রঙ-ফুলিয়ে, তুলি-বুলিয়ে বলতে হবে না।

ক্লাবের সুদূরতম প্রত্যন্ত প্রদেশে একটি নিমগাছের তলায় বসে তিনি আপিস ফাঁকি দিয়ে চা পান করেন। তাঁর কাছ থেকে আমি এন্তার এলেম হাঁসিল করেছি—তারই একটা আপিস ফাঁকি দেওয়া। কাছে পেঁছিতেই একগাল হেসে নিলেন—অর্থ সুস্পষ্ট—ছোকরা কাবেল হয়ে উঠছে। আর ক'দিন বাদেই আপিস-যাওয়া বিলকুল বন্ধ করে পুরো তনখা টানবে।

ইতিমধ্যে এক ইংরেজও এসে উপস্থিত।

রসালাপ আরম্ভ হল। কথায় কথায় বিবাহিত জীবন নিয়ে আলোচনা। সাহেব বললে, 'লণ্ডনে একবার স্বামীদের এক আড়াই মাইল লম্বা প্রসেশন হয়েছিল, স্ত্রীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য। প্রসেশনের মাথায় ছিল এক পাঁচ ফুট লম্বা টিউটিঙে হাড্ডি-সার ছোকরা। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই ছ'ফুট লম্বা ইয়া লাশ এক ঔরৎ দুমদুম করে তার দিকে এগিয়ে

গিয়ে তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, 'তুমি এখানে কেন, তুমি তো আমাকে ডরাও না। চলো বাড়ি।' সুড়সুড় করে ছোকরা চলে গেল সেই খাণ্ডার বউয়ের পিছনে পিছনে।'

আমার চীনা বন্ধুটি আদত-মাফিক মিষ্টি মৌরী হাসি হাসলেন। সায়েব খুশী হয়ে চলে গেল।

গুটিকয়েক শুকনো নিমপাতা টেবিলের উপর ঝরে পড়ল। বন্ধু তাই দিয়ে টেবিলক্লথের উপর আল্পনা সাজাতে সাজাতে বললেন, 'কী গল্প! শুনে হাসির চেয়ে কান্না পায় বেশী।' তারপর চোখবন্ধ করে বললেন,

'চীনা গুণী আচার্য সু তাঁর প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে লিখেছেন, একদা চীন দেশের পেপিং শহরে অত্যাচার-জর্জরিত স্বামীরা এক মহতী সভার আহ্বান করেন। সভার উদ্দেশ্য, কি প্রকারে নিপীড়িত স্বামীকুলকে তাঁদের খাণ্ডার গৃহিণীদের হাত থেকে উদ্ধার করা যায়?

'সভাপতির সম্মানিত আসনে বসানো হল সবচেয়ে জাঁদরেল দাড়িওয়ালা অধ্যাপক মাওলীকে। ঝাড়া ষাটটি বছর তিনি তাঁর দজ্জাল গিন্নীর হাতে অশেষ অত্যাচার ভুগেছেন সে কথা সকলেরই জানা ছিল।

'ওজস্বিনী ভাষায় গম্ভীর কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে বক্তার পর বক্তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপন আপন অভিজ্ঞতা বলে যেতে লাগলেন। স্ত্রীলোকের অত্যাচারে দেশ গেল, ঐহিত্য গেল, ধর্ম গেল, সব গেল, চীন দেশ হটেনটটের মুল্লুকে পরিণত হতে চলল, এর একটা প্রতিকার করতেই হবে! ধন-প্রাণ, সর্বস্ব দিয়ে এ অত্যাচার ঠেকাতে হবে। এস ভাই, এক জোট হয়ে—

'এমন সময় বাড়ির দারোয়ান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, "হুজুররা এবার আসুন। আপনাদের গিন্নীরা কি করে এ সভার খবর পেয়ে ঝাঁটা, ছেঁড়া জুতো, ভাঙা ছাতা ইত্যাদি যাবতীয় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এদিকে ধাওয়া করে আসছেন।"

'যেই না শোনা, আর যাবে কোথায়? জানলা দিয়ে, পেছনের দরজা দিয়ে, এমন কি ছাত ফুটো করে, দেয়াল কাণা করে দে ছুট,! দে ছুট! তিন সেকেণ্ডে মিটিঙ সাফ—বিলকুল ঠাণ্ডা!

'কেবলমাত্র সভাপতি বসে আছেন সেই শান্ত গম্ভীর মুখ নিয়ে—তিনি—বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। দারোয়ান তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বার বার প্রণাম করে বলল, "হুজুর যে সাহস দেখাচ্ছেন তাঁর সামনে চেঙ্গিস খানও তসলীম ঠুকতেন, কিন্তু এ তো সাহস নয়, এ হচ্ছে আত্মহত্যার শামিল। গৃহিণীদের প্রসেশনের সকলের পয়লা রয়েছেন আপনারই স্ত্রী। এখনো সময় আছে। আমি আপনাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।" সভাপতি তবু চুপ। তখন দারোয়ান তাঁকে তুলে ধরতে গিয়ে দেখে তাঁর সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা। হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছেন।'

আচার্য উ থামলেন। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে 'সাধু সাধু,' 'শাবাস, শাবাস' বললুম। করতালি দিতে দিতে নিবেদন করলুম, 'এ একটা গল্পের মত

গল্প বটে।'

আচার্য উ বললেন, 'এ বিষয়ে ভারতীয় আপ্তবাক্য কি ?'

চোখ বন্ধ করে আল্লা রসুলকে স্মরণ করলুম, পীর দরবেশ গুরু ধর্ম কেউই বাদ পড়লেন না। শেষটায় মৌলা আলীর দয়া হল !

হাত জোড় করে বরজলালের মত ক্ষীণ কণ্ঠে ইমন কল্যাণ ধরলুম।

শ্রীমন্মহারাজ রাজাধিরাজ দেবেন্দ্রবিজয় মুখ কালি করে একদিন বসে আছেন ঘরের অন্ধকার কোণে। খবর পেয়ে প্রধান মন্ত্রী এসে শুধালেন, 'মহারাজের কুশল তো ?' মহারাজ রা কাড়েন না। মন্ত্রী বিস্তর পীড়াপীড়ি করাতে হঠাৎ খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন, 'ঐ রাণীটা—ওঃ কি দজ্জাল, কি খাণ্ডার ! বাপরে বাপ ! দেখলেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।'

মন্ত্রীর যেন বুক থেকে হিমালয় নেমে গেল। বললেন 'ওঃ ! আমি ভাবি আর কিছু। তাতে অতো বিচলিত হচ্ছেন কেন মহারাজ ! বউকে তো সব্বাই ডরায়—আম্মো ডরাই। তাই বলে তো আর কেউ এরকমধারা গুম হয়ে বসে থাকে না।'

রাজা বললেন, 'ঐ তুমি ফের আরেকখানা গুল ছাড়লে।' মন্ত্রী বললেন, 'আমি প্রমাণ করতে পারি।' রাজা বললেন, 'ধরো বাজি।' 'কত মহারাজ !' দশ লাখ ?' 'দশ লাখ।'

পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরে ঢোল পেটানোর সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারি হল—বিষ্যুদবার বেলা পাঁচটায় শহরের তাবৎ বিবাহিত পুরুষ যেন শহরের দেয়ালের বাইরে জমায়েৎ হয় ; মহারাজ তাদের কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে চান।

লোকে লোকারণ্য। মধ্যিখানে মাচাঙ—তার উপরে মহারাজ আর মন্ত্রী। মন্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন, 'মহারাজ জানতে চান তোমরা তোমাদের বউকে ডরাও কি না। তাই তাঁর হয়ে আমি হুকুম দিচ্ছি যারা বউকে ডরাও তারা পাহাড়ের দিকে সরে যাও আর যারা ডরাও না তারা যাও নদীর দিকে।'

যেই না বলা অমনি হুড়মুড় করে, বাঘের সামনে পড়লে গোরু পালের মত, কালবৈশাখীর সামনে শুকনো পলাশ পাতার মত সবাই ধাওয়া করলে পাহাড়ের দিকে, একে অন্যকে পিষে, দলে, থেঁৎলে—তিন সেকেণ্ডের ভিতর পাহাড়ের গা ভর্তি।

বউকে না-ডরানোর দিক বিলকুল ফর্সা। না, ভুল বললুম। মাত্র একটি রোগা টিঙটিঙে লোক সেই বিরাট মাঠের মধ্যিখানে লিক্‌লিক্ করছে।

রাজা তো অবাক। ব্যাপারটা যে এরকম দাঁড়াবে তিনি তার কল্পনাও করতে পারেন নি। মন্ত্রীকে বললেন, তুমিই বাজি জিতলে। এই নাও দশ লখা হার।' মন্ত্রী বললেন, 'দাঁড়ান, মহারাজ। ঐ যে একটা লোক রয়ে গেছে। মন্ত্রী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে এলে বললেন, তুমি যে বড় ওদিকে দাঁড়িয়ে ? বউকে ডরাও না বুঝি ?'

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'অতশত বুঝিনে,

হুজুর। এখানে আসবার সময় বউ আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিল, 'যেদিকে ভিড় সেখানে যেয়ো না।" তাই আমি ওদিকে যাই নি।'

আচার্য উ আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'ভারতবর্ষেরই জিৎ। তোমার গল্প যেন বাঘিনী-বউ। আমার গল্প ভয়ে পালালো।'

তবু আমার মনে সন্দ রয়ে গিয়েছে। রসিক পাঠক, তুমি বলতে পারো কোন্ গল্পটাকে শিরোপা দি ? ?

পঁচিশে বৈশাখ

রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়েছিলুম, তাই যদি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দেখি তাহলে আশা করি' সুশীল পাঠক এবং সহৃদয়া পাঠিকা অপরাধ নেবেন না।

রবীন্দ্রনাথ উত্তম উপন্যাস লিখেছেন, ছোট গল্পে তিনি মপাসাঁ, চেখফকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন, নাট্যে তিনি যে-কোন মিস্টিকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন, কবিরূপে তিনি বিশ্বজনের প্রশংসা অর্জন করেছেন, শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা করেছেন তার গভীরতা পণ্ডিতদের নির্বাক করে দিয়েছে, সত্যদ্রষ্টা হিসাবে তাঁর ব্যাখ্যান ভক্তজনের চিত্তজয় করতে সমর্থ হয়েছে, তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি আরো কত বৎসর ভারতবাসীকে নব নব শিক্ষা নেবে তার ইয়ত্তা নেই আর গুরুরূপে তিনি যে শান্তিনিকেতনে নির্মাণ করে গিয়েছেন তার স্নিগ্ধচ্ছায়ায় বিশ্বজন একদিন সুখময় নীড় লাভ করবে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

আমার কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ এসব উত্তীর্ণ হয়ে অজরামর হয়ে রইবেন তাঁর গানের জন্য।

সুরের দিক দিয়ে বিচার করবে না। সুহৃদ শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতে' এমন কোন জিনিস বাদ দেন নি যে সম্বন্ধে আপনি আমি আর পাঁচজনকে কিছু বলে দিতে পারি। আমি বিচার করছি, কিংবা বলুন মুগ্ধ হয়ে ভাবি যে, কতগুলো অপূর্ব গুণের সমন্বয় হলে পর এ রকম গান সৃষ্ট হতে পারে। সামান্য যে দু'চারটে ভাষা জানি তার ভিতর আমি চিরজীবন যে রসের সন্ধান করেছি সে হচ্ছে গীতিরস। শেলি কীট্স, গ্যোটে হাইনে, হাফিজ আত্তার, কালিদাস জয়দেব, গালীব জওক্ এঁদের গান বলুন কবিতা বলুন সব কিছুর রসাস্বাদ করে এ জীবন ধন্য মেনেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বার বার বলেছি—

'এমনটি আর পড়িল না চোখে,
আমার যেমন আছে।'

তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বার বার হার মেনেছি। রবীন্দ্রনাথের গান এমনি এক অখণ্ড রূপ নিয়ে হৃদয় মন অভিভূত করে ফেলে যে, তখন সর্বপ্রকারের বিশ্লেষণ ক্ষমতা লোপ পায়।

জর্মন যখন 'লীডার' কিংবা ইরানীরা যখন গজল গান একমাত্র তখনই আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত জাতীয় কিঞ্চিৎ রস পেয়েছি। তাই একমাত্র সেগুলোর

সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের গানের তুলনা করে ঈষৎ বিশ্লেষণ করা যায়।

তখন ধরা পড়ে ঃ

রবীন্দ্রনাথের গানের অখণ্ড, সম্পূর্ণ রূপ। বহু লীডার এবং গজল শুনে মনে হয়েছে এ গান অপূর্ব, এ গান যদি আরো অনেকক্ষণ ধরে চলত তবে আরো ভালো লাগত অর্থাৎ শুধু যে অতৃপ্ত রেখে গিয়েছে তাই নয়, অসম্পূর্ণ বলেই মনে হয়েছে এ 'লীডার' বা 'গজল' আরো কিছুক্ষণ ধরে চলতে পারতো। রবীন্দ্রনাথের গান কখনই অসম্পূর্ণরূপে আমার সামনে দাঁড়ায় নি। তাঁর গান শুনে যদি কখনো মনে হয়ে থাকে এ গান আমাকে অতৃপ্ত রেখে গেল তবে তার কারণ তার অসম্পূর্ণতা নয়, তার কারণ অতিশয় উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টি মাত্রই ব্যঞ্জনা এবং ধ্বনিপ্রধান। তার ধর্ম সম্পূর্ণ তৃপ্ত করে ও ব্যঞ্জনার অতৃপ্তি দিয়ে হৃদয়মন ভরে দেওয়া। তখন মনে হয়, এ গান আমার সামনে যে-ভুবন গড়ে দিয়ে গেল তার প্রথম পরিচয়ে তার সব কিছু আমার জানা হল না বটে, কিন্তু খেদ নেই, আবার শুনব তখন সে ভুবনের আরো অনেকখানি আমার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আর এমনি করে একদিন সে ভুবন আমার নিতান্ত আপন হয়ে উঠবে। কোনো সন্দেহ নেই এরকম ধারাই হয়ে থাকে কিন্তু আরেকটি কথা তার চেয়েও সত্য ঃ রবীন্দ্রনাথের কোনো গানই কখনো নিজকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে না।

শব্দের চয়ন, সে শব্দগুলো বিশেষ স্থলে সংস্থাপন এবং হৃদয়মনকে অভাবিত কল্পনাতীত নূতন শব্দের ভিতর দিয়ে উন্মুখ রেখে ভাবে, অর্থে, মাধুর্যের পরিসমাপ্তিতে পেঁছিয়ে দিয়ে গান যখন সাঙ্গ হয় তখন প্রতিবারই হৃদয়ঙ্গম করি, এ গান আর অন্য কোনো রূপ নিতে পারতো না—নটরাজের মূর্তি দেখে যেমন মনে হয়, নটরাজ অন্য কোনো অঙ্গভঙ্গি দিয়ে আমার চোখের সামনে নৃত্যকে রূপায়িত করতে পারতেন না। তাই বলি, নটরাজের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গির মত রবীন্দ্রনাথের গানের প্রত্যেকটি শব্দ।

লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, চমৎকার সুর তাল জ্ঞান, মধুরতম কণ্ঠ, তবু কোনো কোনো গায়কের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান ফিকে, পানসে অর্থাৎ ফ্ল্যাট বলে মনে হয়। কেন এরকম ধারা হয় তার কারণ অনুসন্ধান করলে অধিকাংশ স্থলেই দেখতে পাবেন, গায়কের যথেষ্ট শব্দ-সম্মান বোধ নেই বলে প্রতিটি শব্দ রসিয়ে বসিয়ে গাইছেন না আর তাই যেন নটরাজের প্রতিটি অঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে তাঁর নৃত্য বন্ধ হয়ে গেল।

মৃত্তিকার বন্ধন থেকে রবীন্দ্রনাথ কত শতবার আমাদের নিয়ে গিয়েছেন 'নীলাম্বরের মর্মমাঝে'। আবার যখন তিনি আমাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন তখন এই মৃত্তিকাই স্বর্গের চেয়ে অধিকতর 'মধুময় হয়ে ওঠে'।

'তারায় তারায় দীপ্তশিখার অগ্নি জ্বলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে—'

শুনে কি কল্পনা করতে পারি যে

'ঐ আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন,

কোথায় ছিল কোন্ যুগে মোর নিমন্ত্রণ।'

তারপর যখন মনকে তৈরি করলুম সেই স্বর্গসভার নব নব অভিজ্ঞতার জন্য তখন আবার হঠাৎ আমি

'কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে ॥'

তারপর এ-ধারার কি অপরূপ বর্ণনা

'হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিম্পন
বনের পথে আঁধার-আলোয় আলিঙ্গন।'

কখনো স্বর্গে কখনো মর্ত্যে, আপন অজানাতে এই যে মধুর আনাগোনা, মানুষকে দেবতা বানিয়ে, আবার তাকে দেবতার চেয়ে মহত্তর মানুষ করে তোলা —মাত্র কয়েকটি শব্দ আর একটুখানি সুর দিয়ে—এ অলৌকিক কর্ম যিনি করতে পারেন তিনিই 'বিশ্বকর্মা মহাত্মা'।

তোতা কাহিনী

পারস্য দেশের গুণী-জ্ঞানীরা বলেন, আল্লা যদি আরবী ভাষায় কোরান প্রকাশ না করে ফার্সীতে করতেন, তবে মৌলানা জালালউদ্দীন রুমীর 'মসনবি' কেতাবখানাকে কোরান নাম দিয়ে চালিয়ে দিতেন। এ ধরনের তারিফ আর কোন দেশের লোক তাদের কবির জন্য করেছে বলে তো আমার জানা নেই।

মৌলানা রুমী ছিলেন ভক্ত। তিনি ভগবানকে পেয়েছিলেন কদম্ববনবিহারিণী শ্রীরাধা যেরকম করে গোপীজনবল্লভ শ্রীহরিকে পেয়েছিলেন, অর্থাৎ প্রেম দিয়ে। রুমী তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা মসনবিতে বর্ণনা করেছেন। বেশির ভাগ গল্পচ্ছলে, তারই একটি 'তোতা কাহিনী'।

ইরান দেশের এক সদাগরের ছিল একটি ভারতীয় তোতা। সে তোতা জ্ঞানে বৃহস্পতি, রসে কালিদাস, সৌন্দর্যে রুডলফ ভেলেন্টিনো, পাণ্ডিত্যে ম্যাক্সমুলার। সদাগর তাই ফুরসৎ পেলেই সেই তোতার সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ, তত্ত্বালোচনা করে নিতেন।

হঠাৎ একদিন সদাগর খবর পেলেন ভারতবর্ষে কার্পেট বিক্রি হচ্ছে আক্রা দরে। তখনই মনস্থির করে ফেললেন ভারতে যাবেন কার্পেট বেচতে। যোগাড়-যন্ত্র তদ্দণ্ডেই হয়ে গেল। সর্ব শেষে গোষ্ঠীকুটুমকে জিজ্ঞেস করলেন, কার জন্য হিন্দুস্তান থেকে কি সওদা নিয়ে আসবেন। তোতাও বাদ পড়ল না—তাকেও শুধালেন সে কি সওগাত চায়। তোতা বললে, 'হুজুর, যদিও আপনার সঙ্গে আমার বেরাদরি, ইয়ারগিরি বহু বৎসরের, তবু খাঁচা থেকে মুক্তি চায় না কোন্ চিড়িয়া? হিন্দুস্তানে আমার জাতভাই কারোর সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে আমার এ অবস্থার বর্ণনা করে মুক্তির উপায়টা জেনে নেবেন কি? আর তার প্রতিকূল ব্যবস্থাও যখন আপনি করতে পারবেন, তখন এ সওগাতটা চাওয়া তো

কিছু অন্যায়ও নয়।

সওদাগর ভারতবর্ষে এসে মেলা পয়সা কামালেন, সওগাতও কেনা হল, কিন্তু তোতার সওগাতের কথা গেলেন বেবাক ভুলে। মনে পড়ল হঠাৎ একদিন এক বনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় একঝাঁক তোতা পাখি দেখে। তখ্খুনি তাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমাদের এক বেরাদর ইরান দেশের খাঁচায় বন্ধ হয়ে দিন কাটাচ্ছে। তার মুক্তির উপায় বলে দিতে পারো?' কোনো পাখিই খেয়াল করল না সদাগরের কথার দিকে। শুধু দুঃসংবাদটা একটা পাখির বুকে এমনি বাজ হানল যে, সে তৎক্ষণাৎ মরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সদাগর বিস্তর আপসোস করলেন নিরীহ একটি পাখিকে বেমক্কা বদ-খবর দিয়ে মেরে ফেলার জন্যে। স্থির করলেন, এ মুর্খামি দু-বার করবেন না। মনে মনে নিজের গালে ঠাস-ঠাস করে মারলেন গণ্ডা দুই চড়।

বাড়ি ফিরে সদাগর সওগাত বিলোলেন দরাজ হাতে। সবাই খুশ, নিশ্চয়ই 'জয় হিন্দ্' বলেছিল ব্যাটা-বাচ্চা সবাই। শুধু তোতা গেল ফাঁকি—সদাগর আর ও-ঘরে যান না পাছে তোতা তাঁকে পাকড়ে ধরে সওগাতের জন্য। উঁহু, সেটি হচ্ছে না, ও খবরটা যে করেই হোক চেপে যেতে হবে।

কিন্তু হলে কি হয়—গোঁপ কামানোর পরও হাত ওঠে অজানাতে চাড়া দেবার জন্য (পরশুরাম উবাচ), বে-খেয়ালে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন হঠাৎ একদিন তোতার ঘরে। আর যাবে কোথায়—'অস্-সালাম আলাই কুম, ও রহমৎ উল্লাহি, ও বরকত ওহু, আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞে হোক। হুজুরের আগমন শুভ হোক ইত্যাদি ইত্যাদি, তোতা চেঁচাল।

সদাগর 'হেঁ হেঁ' করে গেলেন! মনে মনে বললেন, খেয়েছে!

তোতা আর ঘুঘু এক জিনিস নয় জানি, কিন্তু এ তোতা ঘুঘু। বললে, 'হুজুর সওগাত?'

সদাগর ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে। বলতে পারেন না, চাপতেও পারেন না। তোতা এমন ভাবে সদাগরের দিকে তাকায় যেন তিনি বেইমানস্য বেইমান। সওগাতের ওয়াদা দিয়ে গড্ড্যাম্ ফক্কিকারি। মানুষ জানোয়ারটা এই রকমই হয় বটে! তওবা, তওবা!

কি আর করেন সদাগর। কথা রাখতেই হয়। দুম করে বলে ফেললেন।

যেই না বলা তোতাটি ধপ করে পড়ে মরে গেল। তার একটা বেরাদর সেই দূর হিন্দুস্তানে তার দুরবস্থার খবর পেয়ে হার্টফেল করে মারা গেল, এরকম একটা প্রাণঘাতী দুঃসংবাদ শুনলে কার না কলিজা ফেটে যায়?

দিলের দোস্ত তোতাটি মারা যাওয়ায় সদাগর তো হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। 'হায়, হায়, কী বেকুব, কী বে-আক্কেল আমি। একই ভুল, দুবার করলুম।' পাগলের মত মাথা থাবড়ান সদাগর। কিন্তু তখন আর আপসোস ফায়দা নেই—ঘোড়া চুরির পর আর আস্তাবলে তালা মেরে কি লভ্য! সদাগর চোখের জল মুছতে মুছতে খাঁচা খুলে তোতাকে বের করে আঙ্গিনায় ছুঁড়ে ফেললেন।

তখন কী আশ্চর্য, কী কেরামতি! ছুঁড়ে ফেলতেই তোতা উড়ে বসল গিয়ে বাড়ির ছাদে। সদাগর তাজ্জব—হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তোতার দিকে। অনেকক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে শুধালেন, 'মানে?'

তোতা এবারে প্যাঁচার মত গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'হিন্দুস্থানী যে তোতা আমার বদনসিবের খবর পেয়ে মারা যায়, সে কিন্তু আসলে মরে নি। মরার ভান করে আমাকে খবর পাঠালো, আমিও যদি মরার ভান করি, তবে খাঁচা থেকে মুক্তি পাবো।'

সদাগর মাথা নিচু করে বললেন, 'বুঝেছি, কিন্তু বন্ধু, যাবার আগে আমাকে শেষ তত্ত্ব বলে যাও। আর তো তোমাকে পাব না।'

তোতা বললে, 'মরার আগেই যদি মরতে পারো, তবেই মোক্ষলাভ। মড়ার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, মান-অপমান বোধ নেই। সে তখন মুক্ত, সে নির্বাণ মোক্ষ সবই পেয়ে গিয়েছে। মরার আগে মরবার চেষ্টা করো।'

* * *

এই গল্প ভারতবর্ষে বহু পূর্বে এসেছিল। কবীর বলেছেন,

'ত্যজো অভিমানা শিখো জ্ঞানা
সত্‌গুরু সঙ্গত তরতা হৈ
কহৈঁ কবীর কোই বিরল হংসা
জীবতহী জো মরতা হৈ ॥

(অভিমান ত্যাগ করে জ্ঞান শেখো, সৎগুরুর সঙ্গ নিলেই ত্রাণ। কবীর বলেন, 'জীবনেই মৃত্যুলাভ করেছেন সেরকম হংসসাধক বিরল')।

আর বাঙলা দেশের লালন ফকিরও বলেছেন,

'মরার আগে মলে শমন-জ্বালা ঘুচে যায়।
জানগে সে মরা কেমন, মুরশীদ ধরে জানতে হয়।' ॥

ত্রাহি বিশ্বকর্মা

দিল্লি শহরে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন স্থাপত্যের নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। শুধু কুৎব্ মিনারের গায়ে লাগানো কুওৎউল্‌ইসলাম মসজিদের কয়েকটি অংশ যে প্রাচীন হিন্দু মন্দির থেকে নেওয়া হয়েছে সে কথা মসজিদের দেয়ালে পাথরে খোদাই করা রয়েছে আর সেগুলোর দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। কী সুনিপুণ, সুদক্ষ দৃঢ় হস্তের কলাসৃষ্টি! নৈসর্গিক সৌন্দর্য স্থপতি যে রকম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন ঠিক তেমনি বিশ্বভুবনের সর্বরসবস্তুর অভেদ্য, সমষ্টিগত রূপও তিনি হৃদয়ঙ্গম করে উভয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণ প্রস্তরগাত্রে প্রকাশ করেছেন কখনো অতি অল্প দু-একটি ইঙ্গিত দিয়ে, কখনো সূক্ষ্মতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিবিড়তম 'বর্ণনা' এবং ব্যঞ্জনা দিয়ে।

এ তো হল কারুকার্যের কথা। কিন্তু যে স্তম্ভগুলোর উপর এসব কারুকার্য খোদাই করা হয়েছে তাদের আকার-প্রকার দেখলেও মনে কোন সন্দেহ থাকে না যে এ স্তম্ভগুলো নিশ্চয়ই একদা কোনো মহৎ স্থাপত্যের অঙ্গরূপে

নির্মিত হয়েছিল। মনে কণামাত্র দ্বিধার অবকাশ থাকে না যে সে যুগের স্থাপত্য গাম্ভীর্যে এবং মধুরতায় অন্য যে-কোনো দেশের স্থাপত্যের সম্মুখে মস্তকোত্তোলন করতে পারত।

তারপর আরম্ভ হল নব পর্যায়। কুৎবুমিনার, ইলতুৎমিশের কবর, আলাউদ্দিন খিলজির মসজিদ, গিয়াসুউদ্দীন তুগলুকের কবর, সিকন্দর লোদীর মসজিদ, এবং গোর, হুমায়ুনের কবর, খানখানার কবর, জামি মসজিদ, লালকেল্লা, সফদরজঙ্গ আরো কত অজস্র কলা নিদর্শন। দেখতে দেখতে মাসের পর মাস কেটে যায়, দেশকালপাত্রজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পায়—দিল্লী ত্যাগ না করা পর্যন্ত সে রসের সায়রে ডুবে মরা থেকে বাঁচতে পারে না।

তারপর ইংরেজের বর্বরতা। সেক্রেটারিয়েট মেমোরিয়েল ও রাজা জর্জের প্রতিমূর্তি দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় যে হিন্দু-মুসলিম যুগের কলাসৃষ্টি দেখার পরও ইংরেজ কী করে এ সব গর্ভস্রাব (সুশীল পাঠক! ক্ষমা ভিক্ষা করি, অনেক ভাবিয়াও কোনো ভদ্র শব্দ খুঁজিয়া পাইলাম না) যত্রতত্র নিক্ষেপ করে গেল। যে ইংরেজ আপন দেশে চরিত্রবান সেই ইংরেজই বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ হলে অসাধু হয়ে যায়—যে ইংরেজ স্বদেশে স্ব-ঐতিহ্যে মধ্যম শ্রেণীর স্থাপত্য নির্মাণে সক্ষম সেই ইংরেজই বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের দম্ভে মদোন্মত্ত স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে সৃষ্টি করে—কি সৃষ্টি করে? অশ্লীল কথাটার আর পুনরাবৃত্তি করবো না।

ফরাসী গুণী ক্লেমাঁসো দিল্লীর ইংরেজ স্থাপত্য দেখে বলেছিলেন, 'বাই গদ্, হোয়াৎ ওয়ান্দারফুল রুইন্স্ দে উইল মেক্!' এরপর এ-স্থাপত্য বাবদে এ অধম আর কি নিবেদন করবে?

* * *

কিন্তু এ সব কিছু হার মানে এক নবীন পরিকল্পনার সম্মুখে। এক অতি আধুনিক শিল্পী মহাত্মাজীর স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য একটি 'আজব' প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। পদ্মাসনে আসীন মহাত্মাজীর একটি ১৪০ ফুট উঁচু মূর্তি নির্মাণ করা হবে এবং সেই মূর্তির ভিতরে চারতলা এমারৎ তৈরী থাকবে। যেহেতু মস্তিষ্ক চিন্তাধার তাই মূর্তির মস্তকে লাইব্রেরী থাকবে এবং সেই হিসেবে বক্ষে থাকবে অন্য কিছু, নাসিকা কর্ণেও তাই সেই রকম জুৎসই কিছু একটা। সমস্ত পরিকল্পনাটা আমার মনে নেই; তবু অনুমান করি উপরের হিসাব মাফিক পেটে থাকবে হোটেল রেস্তোরাঁ!

শান্ত সমাহিত হয়ে ভাবুন দেখি আমরা কোথায় এসে পৌঁচেছি। সেই বিরাট মূর্তি প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে থাকবে তামাম দিল্লী শহরের দিকে অষ্টপ্রহর—হয়ত বা চোখে দুটি জোরালো সার্চ-লাইট জুড়ে দেওয়া হবে। মূর্তিটি যদি কলাসৃষ্টি হিসাবেও অতি উচ্চ পর্যায়ের হয় তবু তার বিরাট আকার আর সব সূক্ষ্মানুভূতিকে গলা টিপে মেরে ফেলে তাবৎ দিল্লীবাসীর মনে হরবকৎ জাগিয়ে রাখবে যে অনুভূতি সেটা হচ্ছে, ভয়-বিহ্বলতা।

অথচ ধর্ম সাক্ষী—মহাত্মাজীকে দেখে কেউ কখনো ভয়ে বিহ্বল হয় নি।

অতি পাষণ্ড ইংরেজও তাঁর সামনে শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে মাথা নত করেছে।

সে কথা থাক্। আমার প্রশ্ন, এই যে ব্যাপারটি হতে চলল—শুনলাম শ্রী গাড্‌গিল মূর্তিটির মড্‌ল্ দেখে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করেছেন এবং পরিকল্পনাটির মূর্তমান করার মঞ্জুরী না-মঞ্জুরী তাঁরই শ্রীহস্তে—সেটি কলাসৃষ্টির দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে তাকে কি বলা যায়?

অবিমিশ্র ভাস্কর্য? তা তো নয়। স্থাপত্য? তাও তো নয়। কারণ ভাস্কর্যের ভিতর স্থাপত্য থানা গাড়েন না। তদুপরি সর্বকলাসৃষ্টির একটা বিশেষ পরিমাণ আছে—মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব হতে পারেন কারণ তিনি এপিক, কিন্তু মেঘদূত অষ্টাদশপর্ব হতে পারেন না, এবং মহাভারতও মেঘদূতের আকার ধরতে পারেন না। তাজমহলকে আরও দশগুণ বড় করে বানালে তার মাধুর্য সম্পূর্ণ লোপ পাবে; মার্বেলে তৈরী যে ক্ষুদে ক্ষুদে তাজ লোকে ড্রইংরুমে সাজিয়ে রাখে তার থেকে আসল তাজের কোনো রসই পাওয়া যায় না। একশ চল্লিশ ফুট উঁচু মূর্তি ভাস্কর্যের রস দিতে পারবে না।—যদি কোনো রস দেয় তবে সে বীভৎস—সে কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি। হায়, মহাত্মাজীকে দেখতে হবে বিরাট দানবের মূর্তিতে?

আরেকটি কথা পেশ করতে আমার বড় বাধো বাধো ঠেকছে। কিন্তু না করে উপায়ও নেই। সংক্ষেপে বলি। মূর্তির ভিতর যখন চারতলা বাড়ি থাকবে, লাইব্রেরী হাসপাতাল থাকবে তখন অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে স্নানাগার ও তৎসংলগ্নীয় যাবতীয় শৌচাগারও থাকবে। একদিকে গ্রামের মেয়েরা এসে সেই বিরাট মূর্তির সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্তির ভিতরে স্নানাগারে, শৌচালয়ে—থাক্!

হিন্দু-মুসলমান তুর্ক-পাঠান অনেক কিছু রেখে গিয়েছে দিল্লী শহরে—তাই দেখবার জন্যে দুনিয়ার লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে জমায়েত হয় সেখানে। বিস্ময়ে তারা নির্বাক হয়, বিশুদ্ধ কলারসে তারা নিমজ্জিত হয়, আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা প্রশস্তিবাক্যে আমাদের প্রাণ অতিষ্ট করে তোলে, যেন ওগুলো নিতান্ত আপনার আমার তৈরী, সাতদিন থাকবে বলে দিল্লীতে এসে থাকে সাতমাস, আর প্রাণ ভরে, প্রেমসে অভিসম্পাত দেয় ইংরেজদের বানানো নিউ দিল্লীকে।

আমার মনে হয়, এ মূর্তি গড়া হলে ইংরেজ পর্যন্ত আমাদের অভিসম্পাত না করে হুইস্কি স্পর্শ করবে না।

কিংবা লণ্ডনে বসে মূর্তিটির ছবি দেখেই যে ঠাট্টা অট্টহাস্য ছাড়বে তার শব্দ আমরা ভারত-পাকিস্তান সর্বত্র শুনতে পাবো।

রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্ আবসুর্ডুম!

গিয়ে দেখলুম ক্লাবের প্রত্যন্ত প্রদেশে সেই নিমগাছের তলায় চীনা বন্ধু, গুণী অধ্যাপক উ বসে আছেন। নিমপাতা এখন বর্ষণ রসে টৈটম্বুর বলে টেবিলের উপর ঝরে পড়ে না। তাই উ বকুল ফুল দিয়ে আল্পনা আঁকছেন।

আমি চীনা কায়দায় ঝুঁকে ঝুঁকে দুলতে দুলতে বললুম, 'জয় হিন্দ!'

অধ্যাপক মৃদু হাস্য করে মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'আলাইকুম সালাম আজ তোমাদের ইদের পারব না?'

আমি বললুম, 'ছুটির বাজার, তাই আপনার কাছ থেকে তত্ত্বকথা শুনতে এলুম।'

'তৎপূর্বে বল, এ ফুলের নাম কি?'

মূল বক্তব্যের সঙ্গে এ প্রশ্নোত্তরের কোনো যোগ নেই তবু বাঙালীর মনে বিমলানন্দের সৃষ্টি হবে বলে নিবেদন করছি।

বললুম, 'বাঙলা, মারাঠী, সংস্কৃতে "বকুল", হেথাকার নেটিভ ভাষাতে "মোলশী"।'*

অনেকক্ষণ ধরে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন, 'বকুল, মোলশী,—মোলশী বকুল। উহুঁ, বকুলটিই মিষ্টি।' বাঙালীর ছাতি তিন বিঘৎ ফুলে উঠল তো?

আমি বললুম, 'মিষ্টি নামই যদি রাখবেন তবে "প্রাণনাথ" বলে ডাকলেই পারেন।'

ভুরু কুঁচকে বললেন, সে আবার কি?'

'প্রাণনাথ মানে, মাই ডার্লিং।'

'আরো বুঝিয়ে বলো।'

আমি বললুম, আমি বাঙাল। আমারই দেশের এক "চুকুমবুদাই" অর্থাৎ এদিকে মুখচোরা ওদিকে চটে যায় ক্ষণে ক্ষণে, এসেছে কলকাতায়। গেছে বেগুন কিনতে। দোকানীকে বললে, "দাও তো হে, এক সের বাইগন।" দোকানী পশ্চিম বাঙলার লোক। "বেগুনে"র উচ্চারণ "ব্যইগন" শুনে একটু-খানি গর্বের ঈষৎ মৌরী-হাসি হেসে শুধালো, "কি বললে হে জিনিষটার নাম?" বাঙাল গেছে চটে, উচ্চারণ নিয়ে যত্রতত্র এরকম ঠাট্টা-মস্কারা করার মানে?—চতুর্দিকে আবার বিস্তর "ঘটি" দাঁড়িয়ে। তেড়েমেড়ে বলল, "বাইগন কইছি তো বেশ কইছি হইছে কি"?'

দোকানী আরেক দফা হাম্বড়াই আত্মম্ভরিতার মৃদু হাসি হেসে বললে, 'ছ্যাঃ, বাইগন, বাইগন। দেখো দিকিনি আমাদের শব্দটা কি রকম মিষ্টি—বেগুন, বেগুন।'

বাঙাল বলল, মিষ্টি নামই যদি রাখবা, তবে "প্রাণনাথ" ডাকলেই পারো। দাও, তবে এক সের প্রাণনাথ। প্রাণনাথের সের কত? ছ' পয়সা না সাত পয়সা।'

উ প্রাণভরে হাসলেন উচ্চস্বরে। তারপর চোখ বন্ধ করে মিটমিটিয়ে। সর্ব শেষে চেশায়ার বেড়ালের হাসিটার মত 'আকাশে আকাশে রহিল ছড়ানো সে হাসির তুলনা।'

সুশীল পাঠক, তুমি রাগত হয়েছে, বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। এ বাসি মাল

* বানানে ভুল থাকতে পারে, আমি যেরকম শুনেছি, সেই রকমই লিখলুম।

আমি পরিবেশন করছি কেন ? এ গল্প জানে না কোন্ মর্কট ? পদ্মার এ-পারে কিংবা হে-পারে ?

তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। এ গল্পের খেই ধরে চীনা-গুণী সেদিন তত্ত্ব বিতরণ করেছিলেন বলেই এটাকে 'এনকোর' করতে হল।

* * *

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'এ গল্পে কি তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে ?'

খাইছে। আমি করজোড় বললুম, 'আপনিই মেহেরবাণী করুন।'

বললেন, "রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্ আবসুর্ডুম" কাকে বলে জানো ?'

আমার পেটের এলেম আপনারা বিলক্ষণ জানেন। কাজেই বলতে লজ্জা নেই, অতিশয় মনোযোগের সহিত গ্রীবাকণ্ডুয়নে নিযুক্ত হলুম।

বললেন, 'কেন। জানো না, যখন কোনো বিষয় টানাটানি করলে অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয় তখনই তাকে বলে "রেডৎক্‌সিয়ো আড্ আবসু-র্ডুম"।'

ততক্ষণে বুঝে গিয়েছি। সোৎসাহে বললুম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, রিডাকশিও এ্যাড-এ্যাবসার্ডাম্।' একটুখানি গর্বের হাসিও হেসে নিলুম।

বাঁকা নয়নে তাকিয়ে বললেন, 'কথাটা যখন লাতিন তখন ইংরিজি উচ্চারণ করছো কেন ? ইংরেজের মুখ না হলে তোমরা কোনো ঝাল খেতে পারো না বুঝি ?'

'সে কথা থাক। শোনো।'

আসল কথা হচ্ছে বাঙাল দেখিয়ে দিল, মিষ্টি নামই যদি রাখবে তবে যাও একস্ট্রিমে। রাখো নাম "প্রাণনাথ"। তৎক্ষণাৎ প্রমাণ হয়ে গেল, মিষ্টত্বের দোহাই কত অ্যাবসার্ড।

এই দেখো না, মার্কিন জাতটা কি রকম অ্যাবসার্ড। কোনো কর্মে সুনিপুণ হতে পারাটা অতীব প্রশংসনীয়। এতে সন্দেহ করবে কে ? কিন্তু এরও তো একটা সীমা থাকা দরকার। গল্প দিয়ে জিনিসটে বোঝাচ্ছি।

'ব্রুকলিন ব্রিজ যখন বানানো হয় তখন দু'পাড় থেকে দু'দল লোক পুল তৈরি করে মাঝ গাঙ্গের দিকে রওয়ানা হল। এমনি চৌকশ তাদের হিসেব, এমনি সুনিপুণ তাদের কলকব্জা যে মধ্যিখানে এসে যখন পুলের দু'দিকে জোড়া লাগল তখন দেখা গেল এক ইঞ্চির আঠারো ভাগের উঁচু-নীচুর ফেরফার হয়েছে। তারিফ করবার মত কেরদানী, কোনো সন্দ নেই।

'পক্ষান্তরে আমার স্বর্ণভূমি চীনদেশে কি হয় ? দুদল লোককে এক পাহাড়ের দু'দিকে দেওয়া হয়েছিল সুড়ঙ্গ বানানোর জন্য। এদিক থেকে এনারা যাবেন, ওদিক থেকে ওনারা আসবেন। মধ্যিখানে মিলে গিয়ে খাসা টানেল।

কিন্তু কার্যত হল কি ? দেখা গেল, ডবল সময় চলে গেল তবু মধ্যিখানে দু'দলের দেখা নেই। তারপর এক সুপ্রভাতে দুদল বেরিয়ে এলেন দুদিকে। মধ্যিখানে মেলামেলি, কোলাকুলি হয় নি।'

আমি চোখ টিপে ইশারায় জানালুম, এ কি রঙ্গ বুঝতে পেরেছি।

তিনি বললেন, 'আদপেই না। মার্কিনরা সুনিপুণ, সেই নৈপুণ্যের প্রসাদাৎ তারা পেল কুল্লে একখানা ব্রিজ। আর আমরা পেয়ে গেলুম, দু'খানা টানেল। লাভ কার বেশী হ'ল বল তো!'

তাই বলি অত্যধিক নৈপুণ্য ভালো নয়।

'রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্‌ আবসুর্ডুম!'।

ইউরোপে ভারতীয় শাস্ত্র-চর্চা

সুইটজারল্যাণ্ডের মত দেশেও লোকে সংস্কৃত পড়ে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সুইসদের কৌতূহলও আছে—যদি সে দেশে মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানো হয় ও তাতে সংস্কৃতের অধ্যাপক কুল্লে একজনই। সেই অধ্যাপকটি এসেছেন এদেশে—সেদিন দেখা হল এখানে। অমায়িক লোক, চেহারাটি খাবসুরৎ, ইংরেজি বলেন ভাঙা-চাঙা, নিজের ভুলে নিজেই হেসে ওঠেন। ভারতবর্ষের নীল আকাশ, সোনালি রোদ আর সবুজ ঘাসের যা তারিফ করলেন তা শুনে আমি লাজুক হাসি হেসে 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' করে গেলুম, এমনি কায়দায় যেন ওগুলো নিতান্ত আমারই হাতে গড়া, এগজিবিশানে ছেড়েছি, দু'চার পয়সা পেলে বিক্রি করতেও রাজী আছি। সুইটজারল্যাণ্ডের পাল্টা প্রশংসাও করলুম, 'আহা, কী চমৎকার শাদা বরফ, নীল সরোবর আর চকচকে ঝকঝকে বাড়িঘরদোর।' সায়েব হাসিমুখে অনেক ধন্যবাদ দিলেন।

জিজ্ঞেস করলুম, 'সায়েব, তোমার দেশে সংস্কৃত এগোচ্ছে কি রকম?'

সায়েব বললেন, 'মন্দ না, তবে কেতাবপত্রের বড় অভাব। আর সংস্কৃত ক'টা ছেলে পড়ে না-পড়ে সেইটেই তো আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পাঁচজন সুইসের জ্ঞানগম্যি কতটুকু। সুইসরা ভাবে, ভারতবর্ষ দেশটা সাপে বাঘে ভর্তি, মধ্যিখানে হরেকরকমের সাধু-সন্ন্যাসী আর ফকির-বৈরাগী ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাদের ঝোলা থেকে হরবকত হরেকরকমের সাপ লাফ দিয়ে দিয়ে বেরোচ্ছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দেবার মত প্রামাণিক বই কেউ তো লেখে না যেগুলো সাধারণ সুইস পড়তে পারে। ইংরিজি জানে ক'টা সুইস?'

এই খেই ধরে দু'দণ্ড রসালাপ হল।

* * *

গেল শতকের মাঝামাঝি এবং শেষের দিকে বিস্তর ভারতীয় কেতাবপত্রের ইংরিজি, ফরাসী, জর্মন অনুবাদ হয়। ঠিক সেই সময়েই বিজ্ঞানের প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের লোক ক্রমেই ঈশ্বর, ধর্ম এবং পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাতে থাকে। অথচ গুণী-জ্ঞানীরা জানতেন যে ঈশ্বর ধর্ম আত্মা এসব ব্যাপারে অনেকখানি কুসংস্কার মেশানো থাকলেও সব কিছু 'গাঁজাখুরি' বলে এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায় না, দেওয়া উচিতও নয়। তাই তাঁরা এমন কিছুর সন্ধান করেছিলেন যাতে ঊনবিংশ শতকের 'মুক্ত', 'কুসংস্কারবর্জিত', 'বৈজ্ঞানিক' মনও চরম তত্ত্বের সন্ধান পায়।

তাই বৌদ্ধধর্ম তাদের মনকে বেশ একটা জোর নাড়া দেয়। কারণ, বৌদ্ধ-ধর্মে ভগবানের বালাই নেই, আত্মাটাকে পর্যন্ত কবুল জবাব দেওয়া যায়। ওদিকে ইরানী কবি ওমর খৈয়ামের 'কিস্মৎ' অর্থাৎ অদৃষ্টবাদ ইয়োরোপকে পাগল করে তুলেছে, তাদের সঙ্গে বুদ্ধদেবের 'ধর্মচক্রে'র অলঙ্ঘ্য নিয়মও বেশ খাপ খেয়ে গেল।

পল্লবগ্রাহীরা ওমরকে নিয়ে পড়ে রইল আর যাঁরা 'এহ বাহ্য' জানতেন তাঁরা বৌদ্ধধর্মের খেই ধরে ভারতবর্ষের আর পাঁচটা তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। উপনিষদ না জেনে বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক পটভূমির সঙ্গে পরিচয় হয় না। তাই বিশেষ করে উপনিষদের উত্তম উত্তম অনুবাদ ইংরিজি, ফরাসী, জর্মনে বেরুলো। তারই দু'একখানা 'দ্য লুক্স' সংস্করণ এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে। আর গীতার তো কথাই নেই।

এবং সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, এসব কেতাবপত্র যে পণ্ডিতেরাই পড়লেন তা নয়—সর্বসাধারণের মধ্যে এসব অনুবাদ এবং তাদের নিয়ে গড়ে তোলা মৌলিক বইও ছড়িয়ে পড়ল। জাতকের বিস্তর গল্প কাচ্চাবাচ্চাদের জন্য অনুবাদ করা হল, মাসিকে ধারাবাহিক হয়ে বেরুতে লাগল।

এমন সময় একটা ঘটনা ঘটলো, তার জন্য কে দায়ী তা আমি জানি নে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা তখন ভাবখানা দেখাতে আরম্ভ করলেন যে, এ সব তত্ত্বজ্ঞানের বস্তু সাধারণ লোকের বিদ্যেবুদ্ধির বাইরে। এসব জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন গুণী-জ্ঞানীরা, এসব কেতাবপত্রের টীকা-টিপ্পনী লিখবেন যাঁদের 'শাস্ত্রাধিকার' আছে তাঁরাই।

তখন ব্যাপারটা কিসে গিয়ে দাঁড়ালো আমি ঠিক বলতে পারব না, তবে কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, যেসব অনুবাদ বেরোয় তাতে অনুবাদেরচেয়ে টীকাটিপ্পনী বেশী, ফুটনোটে ফুটনোটে ছয়ালপ আর অনুবাদের ভাষাও দিনকে দিন এমনি টেকনিক্যাল এবং 'হিং টিং ছটে' ভর্তি হতে লাগল যে সেগুলো সাধারণ পাঠক আর বুঝতে পারে না!

সর্বজনপাঠ্য যে-সব অনুবাদ আগে বেরোত সেগুলোতে ভুল থাকত বটে এখানে ওখানে, কিন্তু সাধারণ মানুষ সেগুলো অন্তত পড়ত এবং পড়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারত। শুধু তাই নয় এমন লোকও আমি চিনি যিনি, বৌদ্ধ দর্শন ও নীতি অতি সামান্য মাত্রায় পড়ে নিয়েই আপন জীবন সেই অনুসারে চালাবার চেষ্টা করেছেন। ধর্মাচরণ তো অভ্রভেদী পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করে না।

ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় শাস্ত্রচর্চার জন্য ইয়োরোপের বহু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়, সেগুলো থেকে প্রতি বৎসর প্রামাণিক অনুবাদ, মূল গ্রন্থ, এমন কি মোটা মোটা ত্রৈমাসিকও বেরুতে লাগল, ইংরিজী, ফরাসী, জর্মন, ইতালীয় রুশ ভাষায়. কিন্তু তার প্রায় সব কটাই এমনি পদ্ধতিতে লেখা এবং তার কায়দা-কেতা এমনি পাকা-পোক্ত যে, তাতে কামড় দিতে হলে পাণ্ডিত্যের লৌহদন্তের প্রয়োজন, সাধারণ মানুষ কামড় দিতে গিয়ে দাঁত হারায়,

হজমের তো কথাই ওঠে না। এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বজনবোধ্য অনুবাদের বই বেরতে লাগল কম—যা দু'একখানা বেরলো সেগুলে পল ব্রাণ্টনের রগরগে বই কিংবা মিস মেয়োর মত প্রপাগাণ্ডা মেশানো।

ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় আর ওরিয়েণ্টালিস্ট্স্ কনফারেন্সের ভিতর হারেমবন্ধ হলেন।

তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন ইয়োরোপ গেলেন তখন এল এক নূতন জোয়ার। বিশেষ করে, কণ্টিনেণ্টে রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি জানবার জন্য বহু লোকের আগ্রহ দেখা গেল। ফ্রান্সে রেনে গ্রুসের মত লোক আবার চেষ্টা করলেন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে ধরবার জন্য। দু'চারজন পণ্ডিত ব্যক্তিও এ-কর্মে যোগ দিলেন কিন্তু কেন জানি নে, এ আন্দোলন খুব বেশী লোকের ভিতর ছড়াতে পারলো না।

হয়ত ইয়োরোপে তখন যে অশান্তি দেখা দিয়েছিল—কম্যুনিজম নাৎসিজম দুই-ই সে অশান্তির পিছনে ছিল—তার মাঝখানে সাধারণ মানুষ মনস্থির করে কোনো ভালো জিনিসই গ্রহণ করতে পারছিল না? প্রতিদিন নূতন সমস্যা, অস্ত্রবস্ত্রের নূতন নূতন অনটন, চতুর্দিকে পালোয়ানীর পাঁয়তারা কষার হুঙ্কারধ্বনি, এর মাঝখানে মানুষ পড়বেই বা কি, ভাববার সময়ই বা তার কোথায়?

শুধু ভারতীয় সংস্কৃতি নয়, চীনা, আরবী-ফারসী, প্রাচীন মিশর, বাবিলনীয় সর্বপ্রকারের প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতা সংস্কৃতির অনুসন্ধান তখনো একেবারে নির্মম ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিতরেই সীমাবদ্ধ। বাইরের লোক তখন প্রাণপণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাতে ব্যস্ত। অন্য জিনিসের জন্য ফুর্সৎ কই?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধকল কাটতে না কাটতেই এটম বম, চীন, কোরিয়া।

এদিকে ভারতবর্ষ স্বরাজ পেল। দেশ-বিদেশে আমাদের আপন রাজদূতাবাস বসল। অনেকেই আশা করলেন, এইভাবে হয়ত একটা কিছু হবে—কিন্তু সে কাহিনী আরেক দিনের জন্য মুলতুবী রইল।

* * *

ইয়োরোপের উপস্থিত যে উত্তেজনা উন্মাদনা চলেছে তার মাঝখানে ইয়োরোপীয় ছাত্র যখন প্লাতো-আরিস্ততল, কিকেরো-টাকিটুস পড়া ছেড়ে দিয়েছে—ক্লাসিক্স যখন 'নিজ বাসভূমে' মরমর তখন ভরত-শঙ্কর পড়বে কে?

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, আমাদের কি নিতান্তই কোনো কিছুই করবার নেই??

চরিত্র পরিচয়

গল্প শুনেছি, ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন আর স্কচ এই চারজনে মিলে একটা চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করল। বন্দোবস্ত হল সবাই কিছু কিছু সঙ্গে নিয়ে আসবেন। ইংরেজ নিয়ে এল বেকন আর আণ্ডা, ফরাসী নিয়ে এল এক বোতল স্যাম্পেন জর্মন নিয়ে এল ডজনখানেক সসেজ, আর স্কচম্যান—? সে সঙ্গে নিয়ে এল

তার ভাইকে।

এ জাতীয় বিস্তর গল্প ইয়োরোপে আছে। স্কচদের সম্বন্ধে গল্প আরম্ভ হলেই মনে মনে প্রত্যাশা করতে পারবেন যে গল্পটার প্রতিপাদ্য বস্তু হবে, হয় স্কচদের হাড়কিপ্‌টেমিগিরি নয় তাদের হুইস্কির প্রতি অত্যধিক দুর্বলতা। ওদিকে আবার বিশ্বসংসার জানে স্কচরা ভয়ঙ্কর গোঁড়া ক্রীশ্চান আর মারাত্মক রকমের নীতিবাগীশ (বঙ্গজ হেরম্ব মৈত্র অতুলনীয়)। তাই এই তিনগুণে মিলে গিয়ে গল্প বেরল ;—

এক স্কচ পাদ্রী এসেছেন লণ্ডনে, দেখা করতে গেছেন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে। গিয়ে দেখেন হৈহৈ রৈরৈ, ইলাহি ব্যাপার, পেল্লাই পার্টি, মেয়েমদ্দে গিসগিস করছে। বন্ধুর স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে কাঁচুমাচু হয়ে পাদ্রীকে অভ্যর্থনা জানালেন। কারণ জানতেন স্কচ পাদ্রীরা এরকম পার্টি পরবের মাতলামো আদপেই পছন্দ করেন না। অথচ ভদ্রতাও রক্ষা করতে হয়, তাই ভয়ে ভয়ে শুধালেন,

'একটুখানি চা খাবেন ?'

পাদ্রী হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'নো টী !'

আরো ভয়ে ভয়ে শুধালেন, 'কফি ?'

'নো কফি !'

'কোকো ?'

'নো কোকো !'

ভদ্রমহিলা তখন মরীয়া। মৃদুস্বরে কাতর কণ্ঠে শেষ প্রশ্ন শুধালেন, 'হুইস্কি সোডা ?'

'নো সোডা !'

অথচ কলকাতায় একবার অনুসন্ধান করে আমি খবর পাই, যে সব ব্রিটিশ এদেশে দানখয়রাত করে গিয়েছেন তাঁদের বেশীর ভাগই স্কচ্—ইংরেজের দান অতি নগণ্য। তারপর বিলেতে খবর নিয়ে জানলুম, স্কচরা হুইস্কি খায় কম, বেশীর ভাগ রপ্তানি করে দেয়, আর নিজেরা খায় বিয়ার !

ঠিক সেই রকমই বিশ্বদুনিয়ার বিশ্বাসী ফরাসী জাতটা বড্ডই উচ্ছৃঙ্খল। পঞ্চমকার নিয়ে অষ্টপ্রহর বেএক্তেয়ার। তাই ইংরিজী 'ক্যারিইঙ কোল্ টু নিউ কাসলের' ফরাসী রূপ নাকি 'ক্যারিইঙ এ ওয়াইফ টু প্যারিস'।

এ প্রবাদটি আমি ফরাসী ভাষায় শুনি নি ; শুনেছি ইংরেজের মুখে ইংরেজি ভাষাতে। তাই প্যারিস গিয়ে আমার জানবার বাসনা হল ফরাসীরা সত্যই উপরের প্রবাদবাক্য মেনে চলে কিনা ?

খানিকটা চলে, অস্বীকার করা যায় না। যৌন ব্যাপারে ফরাসীরা বেশ উদার কিন্তু একটা ব্যাপারে দেখলুম তারা ভয়ঙ্কর নীতিবাগীশ। ফষ্টিনষ্টি তারা অনেকখানি বরদাস্ত করে—অবশ্য নিয়ম, সেটা যেন বিয়ের পূর্বে না করে পরেই করা হয়—কিন্তু সেই ফষ্টিনষ্টি যদি এমন চরমে পৌঁছয় যে স্ত্রী স্বামীকে কিংবা স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় তবে ফরাসী মেয়েমদ্দ দু'দলই

চটে যায়। 'পরিবার' নামক প্রতিষ্ঠানটিকে ফরাসী জাত বড়ই সম্ভ্রমের সঙ্গে মেনে চলে। তাই পরকীয়া প্রেম যতই গভীর হোক না কেন তারই ফলে যদি কোনো পরিবার ভেঙে পড়ার উপক্রম করে তবে অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, নাগর-নাগরী একে অন্যকে ত্যাগ করেছেন।

কাজেই মেনে নিতে হয়, এ-ব্যাপারে ফরাসীদের যথেষ্ট সংযম আছে।

ঈষৎ অবান্তর, তবু হয়ত পাঠক প্রশ্ন শুধাবেন, তাহলে এই যে শুনতে পাই প্যারিসে হরদম ফুর্তি সেটা কি তবে ডাহা মিথ্যে?

নিশ্চয়ই নয়। প্যারিসে ফুর্তির কমতি নেই। কিন্তু সে ফুর্তিটা করে অফরাসীরা। যৌন ব্যাপারে ইংরেজের ভণ্ডামি সকলেই অবগত আছেন—লরেন্স্ সেটা বিশ্বসংসারের কাছে গোপন রাখেন নি। তাই ইংরেজ মোকা পেলেই ছুটে যায় প্যারিসে। পাড়াপ্রতিবেশী তো আর সেখানে সঙ্গে যাবে না—বেশ যাচ্ছেতাই করা যাবে। শুধু ইংরেজ নয়, আরো পাঁচটা জাত আসে, তবে তারা আসে খোলাখুলি সবাসাভাবে—ইংরেজের মত 'ফরাসী আর্ট' দেখার ভান করে না। কোন জর্মনকে যদি বার্লিনে শুনতে পেতুম বলছে, 'ভাই হপ্তাখানেকের জন্য প্যারিস চললুম' তখন সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেতুম আর পাঁচজন মিটমিটিয়ে হাসছে—অবশ্য প্রথম জর্মনও সে হাসিতে যোগ দিতে কসুর করছে না।

তা সে যাই হোক, একটা প্রবাদ আমি বিশ্বাস করি। ফরাসীরা বলে 'পারফিডিয়স অ্যালবিয়ন' অর্থাৎ 'ভণ্ড ইংরেজ'। একটি গল্প শুনুন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার খবর শুনে এক বুড়ো শিখ মেজর জিজ্ঞেস করলেন, 'কে কার বিরুদ্ধে লড়ছে?'

'ইংরেজ-ফরাসী জর্মনির বিরুদ্ধে।'

সর্দারজী আপসোস করে বললেন, 'ফরাসী হারলে দুনিয়া থেকে সৌন্দর্যের চর্চা উঠে যাবে আর জর্মনি হারলেও বুরি বাৎ, কারণ জ্ঞানবিজ্ঞান কলকৌশল মারা যাবে।' কিন্তু ইংরেজর হারা সম্বন্ধে সর্দারজী চুপ।

'আর যদি ইংরেজ হারে?'

সর্দারজী দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তবে দুনিয়া থেকে বেইমানি লোপ পেয়ে যাবে।'

আড্ডা

আড্ডা সম্বন্ধে সম্প্রতি কয়েকটি উত্তম উত্তম লেখা বাঙলায় বেরনোর পর ইংরিজিতেও দেখলুম আড্ডা হামলা চালিয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপের ভশচায এবং জমিদার-হাবেলির মৌলবী যেন হঠাৎ কোট-পাতলুন-কামিজ পরে গট্‌গট করে স্টেটসম্যান অফিসে ঢুকলেন। আমার তাতে আনন্দই হল।

কিন্তু এ সম্পর্কে একটি বিষয়ে আড্ডার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আড্ডাবাজরা বলতে চান, বাংলার বাইরে নাকি আড্ডা নেই। কথাটা ঠিকও, ভুলও। তুলনা

দিয়ে নিবেদন করছি। সিন্ধুনদ উজিয়ে যে মাছ ধরা পড়ে, তার নাম 'পাল্লা' —অতি উপাদেয় মৎস্য। নর্মদা উজিয়ে ভরোচ শহরে যে মাছ ধরা পড়ে তার নাম 'মাদার'—সেও উপাদেয় মৎস্য। আর গঙ্গা পদ্মা উজিয়ে যে মাছ বাঙালীকে আকুল উতলা করে তোলে, তার নাম ইলিশ—খোট্টা (মাফ কীজীয়ে) মুল্লুকে পেঁছিনর পর তার নাম হয় হিল্‌সা।

উপর্যুক্ত সর্ব মৎস্য একই বস্তু—দেশভেদে ভিন্ন নাম। তফাৎ মাত্র এইটুকু যে সরষে বাটা আর ফালি ফালি কাঁচা লংকা দিয়ে আমরা যে রকম ইলিশ দেবীর পুজো দি বাদবাকীরা ওরকমধারা পারে না। অর্থাৎ আড্ডা বহু দেশেই আছে, শুধু আমাদের মত তরিবৎ করে রসিয়ে রসিয়ে চাখতে তারা জানে না। অপিচ ভুললে চলবে না সিন্ধীরা আমাদের সরষে-ইলিশ খেয়ে নাক সিঁটকে বলেন, 'কী উম্‌দা চীজকে বরবাদ করে দিলে।' ভৃগুকচ্ছের (ভরোচের) মহাজনগণও সিন্ধীর রান্না পাল্লা খেয়ে 'আল্লা আল্লা' বলে রোদন করেন।

কে সূক্ষ্ম নিরপেক্ষ বিচার করবে? এ যে রসবস্তু—এবং আমার মতে ভোজনরস সর্বরসের রসরাজ।

তাই কাইরোর আড্ডাবাজরা বলেন, একমাত্র তাঁরাই নাকি আড্ডা দিতে জানেন।

কাইরোর আড্ডা কক্‌খনো কোনো অবস্থাতেই কারো বাড়িতে বসে না। আড্ডাবাজরা বলেন, তাতে করে আড্ডা নিরপেক্ষতা—কিংবা বলুন গণতন্ত্র—লোপ পায়। কারণ যাঁর বাড়িতে আড্ডা বসলো, তিনি পানটা-আসটা, খিচুড়িটা, ইলিশ-ভাজাটা (আবার ইলিশ! সুশীল পাঠক, ক্ষমা করো। ঐ বস্তুটির প্রতি আমার মরাত্মক দুর্বলতা আছে। বেহেশ্‌তের বর্ণনাতে ইলিশের উল্লেখ নেই বলে পাঁচ-বকৎ নামাজ পড়ে সেথায় যাবার কণামাত্র বাসনা আমার নেই) 'ফিরি' দেন বলে তাঁকে সবাই যেন একটু বড্ড বেশী তোয়াজ করে। আড্ডাগোত্রের মিশরী নিকষ্যি মহাশয়রা বলেন, বাড়ির আড্ডায় 'মেল' মেলে না।

অপিচ, পশ্য পশ্য, কোনো কাফেতে যদি আড্ডা বসে, তবে সেখানে কেউ কাউকে খয়ের খাঁ বানাতে পারে না—যেন পুরীর মন্দির, জাতফাত নেই, সব ভাই, সব বেরাদর।

এবং সব চেয়ে বড় কথা বাড়ির গিন্নী 'মুখপোড়া মিনষেরা ওঠে না কেন' কখনো শুনিয়ে, কখনো আভাসে-ইঙ্গিতে জানিয়ে অকারণে অকালে আড্ডার গলায় ছুরি চালাতে পারেন না। তার চেয়ে দেখো দিকিনি, দিব্যি কাফেতে বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছ, পছন্দমাফিক মমলেট কটলেট খাচ্ছো, আড্ডা জমজমাট* ভরভরাট, কেউ বাড়ি যাবার নামটি করছে না, কারো গিন্নী এসে উপস্থিত হবেন সে ভয়ও নেই—আর চাই কি?

শতকরা নব্বুই জন কাইরোবাসী আড্ডাবাজ এবং তার দশ আনা পরিমাণ অর্ধেক জীবন কাটায় কাফেতে বসে আড্ডা মেরে। আমাদের আড্ডা বসত 'কাফে দ্য নীল' বা 'নীলনদ কাফেতে'। কফির দাম ছ' পয়সা, ফি পাত্তর। রাবড়ির মত ঘন, কিন্তু দুধ চাইলেই চিত্তির। সবাই কালো কফি খায়, তাই দুধের কোনো ব্যবস্থা নেই। কিছু ঘাবড়াবেন না, দু'দিনেই অভ্যাস হয়ে যায়।

কালো কফি খেলে রঙভী ফর্সা হয়।

আমাদের আড্ডাটা বসত কাফের উত্তর-পূর্ব কোণে, কাউন্টারের গা ঘেঁষে। হরেক জাতের চিড়িয়া সে আড্ডায় হরবকৎ মৌজুদ থাকত। রমজান বে আর সজ্জাদ এফেন্দি খাঁটি মিশরী মুসলমান, ওয়াহহাব আতিয়া কপ্ট ক্রীশ্চান অর্থাৎ ততোধিক খাঁটি মিশরী, কারণ, তার শরীরে রয়েছে ফারাওদের রক্ত। জুর্নো ফরাসী কিন্তু ক'পুরুষ ধরে 'কাইরোর হাওয়া বিষাক্ত করছে' কেউ জানে না, অতি উত্তম আরবী কবিতা লেখে আর সে কবিতার আসল বক্তব্য হচ্ছে, সে তলওয়ার চালিয়ে আড়াই ডজন বেদুইনকে ঘায়েল করে প্রিয়াকে উটের উপর তুলে মরুভূমির দিগদিগন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, যদিও আমরা সবাই জানতুম, জুর্নো যেটুকু মরুভূমি দেখেছে সে পিরামিডে বেড়াতে গিয়ে, তাও জীবনে একবার মাত্র, যদিও পিরামিড কাইরো থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। উট কখনো চড়ে নি, ট্রামের ঝাঁকুনিতেই বমি করে ফেলে। আর তলওয়ার? তওবা, তওবা! মার্কোস জাতে গ্রীক, বেশী নয় কুল্লে আড়াই হাজার বৎসর ধরে তারা মিশরে আছে। মিশর রাণী, গ্রীক রমণী ক্লিয়োপাত্রার সঙ্গে তার নাকি খেশকুটুম্বিতা আছে। হবেও বা, কারণ প্রায়ই ব্যবসাতে দাঁও মেরেছে বলে ফালতো এবং 'ফিরি' এক রোঁদ কফি খাইয়ে দিত। তাতে করে কাফের 'গণতন্ত্র' ক্ষুণ্ণ হত না, কারণ মার্কোসকে 'কাট্যা ফালাইলে'ও আড্ডার ঝগড়া-কাজিয়ায় সে কস্মিনকালেও হিস্যা নিত না; বেশীর ভাগ সময় চেয়ারের হেলানে মাথা রেখে আকাশের দিকে হাঁ করে ঘুমুতো কিংবা খবরের কাগজ থেকে তুলোর ফটকা বাজারের তেজি-মন্দির (বুল এ্যাণ্ড বিয়ার) হালহকিকৎ মুখস্থ করতো।

আর বাঙলা দেশের তাবৎ চণ্ডীমণ্ডপ, বেবাক জমিদার-হাবেলীর আড্ডার প্রতিভূ হিসেবে আপনাদের আশীর্বাদে আর শ্রীগুরুর কৃপায় ধূলির ধূলি এ-অধম।

আমার বাড়ির নিতান্ত গা ঘেঁষে বলে নিছক কফি পানার্থে ঐ কাফেতে আমি রোজ সকাল-সন্ধ্যা যেতুম। বিদেশ-বিভূঁই, কাউকে বড় একটা চিনি নে, ছন্নের মত হেথা-হোথা ঘুরে বেড়াই আর দেশভ্রমণ যে কি রকম পীড়াদায়ক 'প্রতিষ্ঠান' সে সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক কেতাব লিখব বলে মনে মনে পায়তারা কষি। এমন সময় হঠাৎ খেয়াল গেল কাফের কোণের আড্ডাটির দিকে। লক্ষ্য করি নি যে কফি-পানটা ওদের নিতান্ত গৌণকর্ম, ওরা আসলে আড্ডাবাজ।

আম্মো যে আড্ডাবাজ সে তত্ত্বটা ওদেরও মনে ঝিলিক দিয়ে গেল একই ব্রাহ্মমুহূর্তে। সে 'মহালগনে'র বর্ণনা আমি আর কি দেব? সুরসিক পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো শ্রীহরি শ্রীরাধাতে, ইউসুফ জোলেখাতে, লায়লী মজনুতে, খ্রিস্তান ইজোল্‌দেতে কি করে প্রথম চারি চক্ষু বিনিময় হয়েছিল। কী ব্যাকুলতা, কী গভীরা তৃষা, কী মহা ভবিষ্যতের প্রগাঢ় সুখস্বপ্ন, কী মরুতীর পার হয়ে সুধাশ্যামলিম নীলাম্বুজে অবগাহনানন্দ সে দৃষ্টি-বিনিময়ে ছিল। এক ফরাসী কবি বলেছেন, 'প্রেমের সব চেয়ে মহান দিবস সেদিন, যেদিন প্রথম বলেছিলুম, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' তত্ত্বটা হৃদয়ঙ্গম হয় সেই ব্রাহ্ম

মুহূর্তে।

তাবা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে আসুন, স্পর্শ করে বলব, তিন লহমাও লাগে নি, এই ব্রাত্যের উপনয়ন হয়ে গেল, বেদ শাখা ঋষি স্থির হয়ে গেলেন—সোজা বাঙলায় বলে, জাতে উঠে গেলুম। অমিয়া ছানিয়া, নয়ন হানিয়া বললুম, 'এক রৌদ কফি ?'

আড্ডার মেম্বররা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে পরিতোষের স্মিতহাস্য বিকশিত করলেন। ভাবখানা, ভুল লোককে বাছা হয় নি।

কাফের ছোকরাটা পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছে। আমার ছন্নছাড়া ভাবটা তার চোখে বহু পূর্বেই ধরা পড়েছিল। রৌদ পরিবেশন করার সময় নীলনদ-ডেল্টার মত মুখ হাঁ করে হেসে আমি যে অতিশয় ভদ্রলোক—অর্থাৎ জোর টিপ্‌স্‌ দি—সে কথাটা বলে আড্ডার সামনে আমার কেস রেকমেণ্ড করলো।

জুর্নো তাড়া লাগিয়ে বললেন, 'যা, যা, ছোঁড়া মেলা জ্যাঠামো করিস নে।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খাসা আরবী বলেন আপনি।'

রবিঠাকুর বলেছেন—

'এত বলি সিক্তপক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া
সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া
বিদেশীর অঙ্গ হতে—'

ঠিক সেই ধরনে আমার দিকে তাকিয়ে জুর্নো যেন আমার প্রবাস-লাঞ্ছনা এক থাবড়ায় ঝেড়ে ফেললেন, আমার অঙ্গ থেকে।

আমি কিন্তু মনে মনে বললুম, 'ইয়া আল্লা, তেরো দিনের আরবীকে যদি এরা বলে খাসা তবে এরা নিশ্চয়ই খানদানী মনিষ্যি।' করজোড়ে বললুম, 'ভারতবর্ষের নীতি, সত্য বলবে, প্রিয় বলবে, অপ্রিয় সত্য বলবে না ; আপনাদের নীতি দেখছি আরো এক কদম এগিয়ে গিয়েছে, প্রিয় অসত্যও বলবে।'

আড্ডা তো—পার্লিমেণ্ট নয় তাই হরবকৎ কথার পিঠে কথা চলবে এমন কোনো কসমাদিব্যি নেই। দুম্‌ করে রমজান বে বললে, 'আমার মামা (আমি মনে মনে বললুম, 'যগাদাসের মামা') হজ করতে গিয়েছিলেন আর বছর। সেখানে জনকয়েক ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তারা নাকি পাঁচ বকৎ নামাজ পড়ত আর বাদবাকী তামাম দিনরাত এক চায়ের দোকানে বসে কিচিরমিচির করত। তবে তারা নাকি কোন্‌ এক প্রদেশের—বিঙ্গালা, বাঙালী—কি যেন—আমার ঠিক মনে নেই—'

উৎসাহে উত্তেজনায় ফেটে গিয়ে চৌচির হয়ে আমি শুধালুম, 'বাঙালা ?'

'হাঁ, হাঁ।'

আমি চোখ বন্ধ করে ভাবলুম, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম বাঙালী। কিন্তু কই, কখনো তো এত গর্ব অনুভব করি নি যে, আমি বাঙালী। এই যে নমস্য মহাজনরা মক্কা শহরে আড্ডাবাজ হিসেবে নাম করতে পেরেছেন—নিশ্চয়ই বিস্তর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে—তাঁরা আলবৎ শ্রীহট্ট, নোয়াখালি, চাটগাঁ, কাছাড়ের বাঙালী খালাসী, পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা নগরীর উপকণ্ঠে

খিদিরপুরে আড্ডা মারতে শিখে 'হেলায় লঙ্কা করিলা জয়'।

আস্তে আস্তে চেয়ার থেকে উঠে ডান হাত বুকের উপর রেখে মাথা নিচু করে অতিশয় সবিনয় কণ্ঠে বললুম, 'আমি বাঙালী।'

গ্রীক সদস্য মার্কোস প্রথম পরিচয়ের সময় একবার মাত্র 'সালাম আলাইক্' করে খবরের কাগজের পিছনে ডুব মেরেছিলেন। তাঁর কানে কিছু যাচ্ছিল কি না জানি নে। আমি ভাবলুম, রাশভারী লোক, হয়ত ভাবছেন, নূতন মেম্বার হলেই তাঁকে নূতন জামাইয়ের মত কাঁধে তুলে ধেই ধেই করেই নাচতে হবে একথা আড্ডার কন্‌স্‌টিট্যুশানে লেখে না। মুখের উপর থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে বললেন, 'দাঁও মেরেছি। একটা শ্যাম্পেন হবে? আমাদের নূতন মেম্বর—।' কাউণ্টারের পিছনে দাঁড়িয়েছিল মালিক; তার দিকে তাকিয়ে বাঁ হাত গোল করে বোতল ধরার মুদ্রা দেখিয়ে ডান হাত দিয়ে দেখালেন ফোয়ারার জল লাফানোর মুদ্রা। ম্যানেজার কুল্লে দুই ডিগ্রী কাৎ করে ঘাড় নাড়ল।

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'এ দোকানে তো মদ বেচার লাইসেন্স নেই।'

মার্কোস বললেন, 'কাফের পেছনে, তার ড্রইংরুমে। ব্যাটা সব বেচে;—আফিম, ককেইন, হেরোইন, হশীশ যা চাও।'

ছোকরাকে বললেন, 'আর একটা তামাকও সাজিস।'

বলে কি? কাইরোতে তামাক! স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রম নু?

দিব্যি ফর্শী হুঁকো এল। তবে হনুমানের ন্যাজের মত সাড়ে তিনগজী দরবারি নল নয় আর সমস্ত জিনিসটার গঠন কেমন যেন ভোঁতা ভোঁতা। জরির কাজ করা আমাদের ফর্শী কেমন যেন একটু 'নাজুক', মোলায়েম হয়—এদের যেন একটু গাঁইয়া। তবে হ্যাঁ, চিলিমটা দেখে ভক্তি হল—ইয়া ডাবর পরিমাণ। একপো তামাক হেসেখেলে তার ভিতর থানা গাড়তে পারে—তাওয়াও আছে। আগুনের বেলা অবিশ্যি আমি টিকের ধিকিধিকি গোলাপী গরম প্রত্যাশা করি নি, কারণ কাবুলেও দেখেছি টিকে বানাবার গুহ্যতথ্য সেখানকার রসিকরাও জানেন না।

আর যা খুশবাই বেরল তার রেশ দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পরও যেন আমার নাকে লেগে আছে।

পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো সুগন্ধী ইজিপশিয়ন সিগারেট ভুবনবিখ্যাত। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছ বিশেষ করে মিশরই সুগন্ধী সিগারেট তরিবৎ করে বানাতে শিখল কি করে? আইস, সে সম্বন্ধে ঈষৎ গবেষণা করা যাক। এই সিগারেট বানানোর পিছনে বিস্তর ইতিহাস, এন্তার রাজনীতি এবং দেদার রসায়নশাস্ত্র লুক্কায়িত রয়েছে।

সিগারেটের জন্য ভালো তামাক জন্মায় তিন দেশে। আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে, গ্রীসের মেসেডোন অঞ্চলে এবং রুশের কৃষ্ণসাগরের পারে পারে। ভারতবর্ষ প্রধানত ভার্জিনিয়া খায়, কিছুটা গ্রীক, কিন্তু এই গ্রীক তামাক এদেশে টার্কিশ এবং ইজিপশিয়ন নামে প্রচলিত। তার কারণ একদা গ্রীসের উপর আধিপত্য করতো তুর্কী এবং তুর্কী গ্রীসের বেবাক তামাক ইস্তাম্বুলে নিয়ে এসে

কাগজে পেঁচিয়ে সিগারেট বানাত। মিশরও তখন তুর্কীর কব্জাতে, তাই তুর্কীর কর্তারা কিছুটা তামাক মিশরে পাঠাতেন। মিশরের কারিগররা সেই গ্রীক তামাকের সঙ্গে খাঁটি মিশরের খুশবাই মাখিয়ে দিয়ে যে অনবদ্য রসনলী নির্মাণ করলেন তারই নাম ইজিপশিয়ন সিগারেটে।

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন চায়ের টিন যদি রান্নাঘরে ভালো করে বন্ধ না রাখা হয়, তবে ফোঁড়নের ঝাঁঝে চা বরবাদ হয়ে যায়, অর্থাৎ আর কিছু না হোক খুশবাইটি আঁতুড়ঘরে নুন-খাওয়ানো বাচ্চার মত প্রাণত্যাগ করে। মালজাহাজ লাদাই করা যে অপিসারের কর্ম তিনিও বিলক্ষণ জানেন, যে-জাহাজে কাঁচা তামাক লাদাই করা হয়েছে তাতে কড়া গন্ধওলা অন্য কোনো মাল নেওয়া হয় না—পাছে তামাকের গন্ধ এবং কিঞ্চিৎ স্বাদও নষ্ট হয়ে যায়।

তাই তামাকের স্বাদ নষ্ট না করে সিগারেটকে খুশবাইয়ে মজানো অতীব কঠিন কর্ম। সিগারেটে একফোঁটা ইউকেলিপ্‌টস তেল ঢেলে সেই সিগারেট ফুঁকে দেখুন, একফোঁটা তেল আস্ত সিগারেট একদম বরবাদ করে দিয়েছে। পাঁচ বছরের বাচ্চাও তখন সে সিগারেট না কেশে অনায়াসে ভস্ ভস্ করে ফুঁকে যেতে পারে (বস্তুত বড্ড বেশি ভেজা সর্দি হলে অনেকে এই পদ্ধতিতে ইউকেলিপ্‌টস্ সেবন করে থাকেন—যাঁরা সিগারেট সইতে পারেন না তাঁরা পর্যন্ত)।

বরঞ্চ এমন গুণী আছেন যিনি এটম বমের মাল-মসলা মেশানোর হাড়হদ্দ হালহকিকৎ জানেন, কিন্তু তামাকের সঙ্গে খুশবাই! তার পিছনে রয়েছে গূঢ়তর, রহস্যাবৃত ইন্দ্রজাল।

কিচ্ছু বাড়িয়ে বলছি নে। অজন্তার দেওয়াল এবং ছবির রঙ কোন্ কোন্ মসলা দিয়ে বানানো হয়েছিল, পাঠানযুগে পাথরে পাথরে জোড়া দেবার জন্য কি মাল কোন্ পরিমাণে লাগানো হয়েছিল আমরা সে তত্ত্বগুলো মাথা খুঁড়েও বের করতে পারি নি এবং পারে নি বিশ্বসংসার বের করতে কি কৌশলে, কি মসলা দিয়ে মিশরীরা তাদের মমীগুলোকে পচার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

স্বীকার করি, মিশরীরাই একদিন সে কায়দা ভুলে মেরে দিয়েছিল—পাঠান-মোগল যুগে যে রকম আমাদের অনেকখানি রসায়নবিদ্যা অনাদরে লোপ পায়। তবু তো আমরা আজও মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ বানাতে পারি—ভেজাল তো শুরু হল মাত্র সেদিন, আমাদেরই চশমার সামনে।

মিশরীরাও ঠিক সেই রকম সুগন্ধ-তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুলে যায় নি। ঝড়তি-পড়তি যেটুকু এলেম তখনো তাদের পেটে ছিল তাই দিয়ে তারা সেই সমস্যা সমাধান করলো, তামাকে কি করে খুশবাই জোড়া যায়, তামাকের 'সোয়াদ'টি জখম না করে।

তাই যখন কোনো ডাকসাঁইটে তামাক কদরদারের (হায়! এ গোত্র পৃথিবীর সর্বত্র কি কাবুল, কি দিল্লী, কি কাইরো—সুকুমারের ভাষায় বলি—হুশ হুশ করে মরে যাচ্ছে) তদারকিতে কাইরোর কাফেতে তামাক সাজা হয় এবং সেই কদরদার যখন সে তামাকের নীলাভ ধুঁয়োটি ফুরফুর করে নাকের ভিতর দিয়ে

ছাড়েন এবং নীলনদের মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া যখন সেই ধুঁয়োটির সঙ্গে রসকেলি করে তাকে ছিন্নভিন্ন করে কাফের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়, তখন রাস্তার লোক পর্যন্ত উন্নাসিক হয়ে থমকে দাঁড়ায়, পাঁড় সিগারখেকো, পাইকারি সিগারেটফোঁকা পর্যন্ত বুকের উপর হাত রেখে আসমানের দিকে তাকিয়ে 'অলহমদুলিল্লা' (খুদাতালার তারিফ) বলে।

আর ইলিশের বেলা যে-রকম হয়েছিল, এ অধম ঠিক সেই রকম তাজ্জব মানে, বেহশতের বর্ণনায় এ তামাকের বয়ান নেই কেন ? তা হলে পাপ করে নরকে যেত কোন্ মূর্খ ?

বাঙালী তার চুলটিকে কেতাদুরস্ত করে রাখতে ভালোবাসে, কাবুলী বেলা-অবেলা মোকা পেলেই তার পায়জারে গুটিকয়েক পেরেক ঠুকিয়ে নেয়, ইংরেজ আয়না সামনে পেলেই টাইটা ঠিক মধ্যিখানে আছে কি না তার তদারকিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, পেশাওয়ারী পাঠানের প্রধান শিরঃপীড়া তার শিরাভরণ নিয়ে, আর মিশরীর চরম দুর্বলতা তার জুতো জোড়াটিকে 'বালিশ' (আরবী ভাষায় 'প' অক্ষর নেই, তাই ইংরিজি 'পালিশ' কথাটা মিশরীতে 'বালিশ' রূপ ধারণ করেছে) রাখার জন্যে।

অতএব কাফেতে ঢোকামাত্রই কাফের 'বুৎ-বালিশ' (অর্থাৎ বুট পালিশ করনেওলা) ছোকরা এসে আপনাকে সেলাম ঠুকবে। আপনি তাকে বিলক্ষণ চেনেন, তাই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলবেন, 'যা, যা'—তার অর্থ 'আচ্ছা পালিশ কর।' সে বত্রিশখানা ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে আপনার 'বুৎ-বালিশ' কর্মে নিযুক্ত হবে।

সদস্যদের কেউ বলবেন, 'শুভ দিবস' কেউ 'এই যে', কেউ একটু মৃদু হাস্য করবেন, আর কেউ মুখ খবরের কাগজের আড়ালে রেখেই কাগজখানা ঈষৎ দুলিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যে আপনার কফি এসে উপস্থিত। ওয়েটার ঠিক জানে, আপনি কতটা কড়া, কতখানি চিনি আর কোন্ ঢঙের পেয়ালার কফি খেতে পছন্দ করেন। আপনি বলবেন, 'চিঠিপত্র নেই ?'

অর্থাৎ গৃহিণীর ভয়ে আপনি প্রিয়াকে কাফের ঠিকানা দিয়েছেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'ফোন ?'

'আজ্ঞে না। তবে ইউসুফ বে আপনাকে বলতে বলেছেন, তিনি একটু দেরিতে আসবেন। আপনি যেন না যান।'

'চুলোয় যাক গে ইউসুফ বে। আমি জিজ্ঞেস করছি, চিঠি বা ফোন নেই ?'

কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'আজ্ঞে না।' জানে আজ আপনি দরাজ হাতে বখশিশ দেবেন না।

'যাও, চিঠির কাগজ নিয়ে এস !'

কাফের নাম-ঠিকানা-লেখা উত্তম চিঠির কাগজ, খাম, ব্লটিং প্যাড যাবতীয় সাজসরঞ্জাম এক মিনিটের ভিতর উপস্থিত হবে। আপনি পাশের টেবিলে গিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রেমপত্র লিখে যখন ঘণ্টাখানেক পরে আড্ডার টেবিলে ফিরে ওয়েটারকে বলবেন, চিঠিটা ডাকে ফেলতে, তখন হঠাৎ রমজান বে শুধাবে,

'কাকে লিখলে ?' যেন কিছুই জানে না।

চটে গিয়ে বলবেন, 'তোমার তাতে কি ?'

রমজান বে উদাস সুরে বলবে, 'না, আমার তাতে কি। তবু বলছিলুম, সকালে বিল্‌কিসের সঙ্গে দেখা। সে তোমাকে বলে দিতে বললে, তুমি যেন সাড়ে এগারোটায় "ফামিনা" সিনেমার গেটে তাঁর সঙ্গে দেখা করো।'

আরো চটে গিয়ে বলবেন, 'তাহলে এতক্ষণ ধরে সেটা বলো নি কেন ?'

'সাড়ে এগারোটা বাজতে তো এখনো অনেক দেরি।'

'আঃ, সে কথা হচ্ছে না। আমি যে মিছিমিছি এক ঘণ্টা ধরে চিঠিটা লিখলুম।'

রমজান বে আরো উদাস সুরে বলবে, 'জানি নে, ভাই, তোমাদের দেশে প্রেমের রেওয়াজ কি। এদেশে তো জানি, প্রিয়া পাশের ঘরে, আর এ-ঘরে বসে প্রেমিক পাতার পর পাতা প্রেমপত্র লিখে যাচ্ছেন।'

এতক্ষণ একটা মুখরোচক আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থিত হল। রেশনশপ খোলা মাত্রই মেয়ে-মদ্দে যে রকম দোকানের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তামাম আড্ডা ঠিক সেই রকম প্রেমপত্র লেখার সময়-অসময়, মোকা-বে-মোকা, কায়দা-কেতা সম্বন্ধে আলোচনা জুড়ে দেবে।

ক্রমে ক্রমে আলোচনার বিষয়বস্তু হটতে হটতে পৌঁছবে সেই সনাতন প্রশ্নে, কোন্ দেশের রমণী সব চেয়ে সুন্দরী হয়।

অবান্তর নয়, তাই নিবেদন করি, দেশ-বিদেশ ঘুরেছি, অর্থাৎ ভ্যাগাবণ্ড হিসাবে আমার ঈষৎ বদনাম আছে। কাজেই আমাকে কেউ শুধান, কোন্ দেশের রান্না সবচেয়ে ভাল, কেউ শুধান, তুলনাত্মক কাব্যচর্চার জন্য কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশস্ততম, আর অধিকাংশ শুধান, কোন্ দেশের রমণী সব চেয়ে সুন্দরী ?

আমি কলির পরশুরামের স্মরণে উত্তর দি, 'এনারা আছেন, ওনারাও আছেন।' কারণ যাঁরা দেশ-বিদেশ ঘোরেন নি, তাঁদের সঙ্গে এ-আলোচনাটা দানা বাঁধে না, বড্ড একতরফা বক্তৃতার মত হয়ে যায়, আর সবাই জানেন, বক্তৃতা আড্ডার সব চেয়ে ডাঙর দুশমন।

এ সংসারে যদি কোনো শহরের সত্যকার হক্ক থাকে, উপযুক্ত প্রাণাভিরাম বিষয় নিয়ে আলোচনা করার তবে কসম খেয়ে বলতে পারি, সে শহর কাইরো। কারণ কাইরোতে খাঁটি বাসিন্দারূপে যুগ যুগ ধরে আছে গ্রীক, আরব, তুর্কী, হাবশী, সুদানী, ইতালীয়, ফরাসিস, ইহুদী এবং আরো বিস্তর চিড়িয়া। এদের কেউ কেউ বোরকা পরেন বটে, তবু অক্লেশে বলা যেতে পারে, কাফের দরজার দিকে মুখ করে বসে, আড্ডা অনায়াসে নিজের মুখে ঝাল খেয়ে নিতে পারে।

আর শীতকাল হলে তো পোয়া বারো। কাইরোতে বছরে আড়াই ফোঁটা বৃষ্টি হয়, সাহারার শুকনো হাওয়া যক্ষ্মারোগ সারিয়ে দেয়, পিরামিড কাইরোর বাইরেই ঠায় বসে, ফুর্তি-ফার্তির নামে কাইরো বে-এক্তিয়ার, মসজিদ-কবর কাইরো শহরে বে-শুমার, শীতকালে না-গরম-না-ঠাণ্ডা আবহাওয়া, সবসুদ্ধ জড়িয়ে মড়িয়ে

কাইরো টুরিস্টজনের ভূস্বর্গ এবং টুরিস্টাদেরও বটে।

তদুপরি মার্কিন লক্ষপতিরা আসেন নানা ধান্দায়। তাঁদের সন্ধানে আসেন তাবৎ দুনিয়ার ডাকসাইটে সুন্দরীরা। তাঁদের সন্ধানে আসেন হলিউডের ডিরেক্টররা এবং তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসেন আরেক ঝাঁক সুন্দরী।

কিন্তু থাক্ সুশীল পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো, কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে আলোচনা শাস্ত্রে নিষেধ। গুরুর বারণ।

* * *

মিশরী আড্ডাবাজরা (দাঁড়ান, ব্যাকরণে ভুল হয়ে গেল, মিশরী মাত্রই আড্ডাবাজ: এমন কি সাদ্ জগলুল্ পাশা পর্যন্ত দিনে অন্তত একবার আড্ডার সন্ধানে বেরতেন। তবে, হাঁ, তিনি কোনো টেবিলে গিয়ে বসলে কেউ সাহস করে সে টেবিলের ত্রিসীমানায় ঘেঁষত না। সেখান থেকে তিনি চোখের ইশারায় এঁকে ওঁকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আড্ডা জমাতেন) দৈবাৎ একই আড্ডায় জীবন কাটান। বিষয়টা সবিস্তর বুঝিয়ে বলতে হয়।

এই মনে করুন, আপনি রোজ আপিস ফেরার পথে 'কাফে দ্য নীলের' উত্তর-পূব কোণে বসেন। সেই টেবিলটায় আপনার জন-পাঁচেক দোস্ত বসেন। আড্ডার ফুল স্ট্রেন্থ্ জন দশ—সবাই কিন্তু সব দিন এ আড্ডাতেই আসেন না। তাই হরে-দরে আপনার টেবিলে জন পাঁচ-সাত নিয়মিত উপস্থিত থাকেন।

এ ছাড়া আপনি সপ্তাহে একদিন—জোর দু'দিন, বাড়ির পাশের সেমিরামিস কাফেতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বসেন। এ আড্ডার সদস্যরা কিন্তু আপনার 'কাফে দ্য নীলের' সদস্যদের বিলকুল চেনেন না। এরা হয়ত চ্যাংড়ার দল, কলেজে পড়ে, কেরানীগিরি করে, বেকার, কিংবা ইনশিওরেন্স এজেন্ট (তার অর্থও বেকার)। এদের আলোচনার বিষয়বস্তু রাজনীতি, অর্থাৎ কোন্ পাশার কউ কোন্ মিনিস্টারের সঙ্গে পরকীয় করেন বলে তাঁর বোনপো পার্টিতে ভালো নোকরি পেয়ে গেল, কিংবা আলোচনার বিষয়বস্তু সাহিত্য, অর্থাৎ কোন প্রকাশক এক হাজারের নাম করে তিন হাজার ছাপিয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছে। তা ছাড়া অবশ্যই দুনিয়ার হাজারো জিনিস নিয়ে আলোচনা হয়, তা না হলে আড্ডা হবে কেন। এ আড্ডার সদস্যদের সবাই সবজান্তা। এরা মিশর তথা তাবৎ দুনিয়ার এত সব গুহ্য এবং গরম গরম খবর রাখেন যে এদের কথাবার্তা, হাবভাব দেখে আপনার মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না যে এদের প্রত্যেকের চোখের সামনে এক অদৃশ্য, অশ্রুত টেলিপ্রিন্টার খবর জানিয়ে যাচ্ছে এবং সে খবরের যোগান দিচ্ছেন রাশার বেরিয়া, জর্মনির হিমলার আর কলকাতার টেগার্ট। রোজ বাড়ি ফেরার সময় আপনি তাজ্জব মানবেন, এদের সাহায্য ছাড়া মিশর তথা দুনিয়ার বাদবাকী সরকারগুলো চলছে কি করে। আপনার মনে আর কোনো সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না যে, এদের যদি মস্কো, বার্লিন, লণ্ডন, দিল্লীর বড়কর্তা বানিয়ে দেওয়া হয়, তবে দুনিয়ায় কুল্লে সমস্যার সাকুল্য সমাধান এক লহমায়ই হয়ে যাবে। মনে মনে বললেন, 'হায়, দুনিয়া, তুমি জানছো না তুমি কি হারাচ্ছো।'

আপনি এদের চেয়ে বছর দশেক বড়, তাই এরা আপনাকে একটুখানি সমীহ করে, যদিও আড় না হয়েই বিড়ি টানে। কারণ এদেশে সে রেওয়াজটা তেমন নেই। আপনি নিতান্ত বিদেশী বলেই এ আড্ডায় ছিটকে এসে পড়েছেন। এদের কাউকে পয়লা আড্ডায় নিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি নিয়ে গিয়েছিলুম ; বেচারী সেখানে রা'টি কাড়ে নি যদ্যপি দুসরা আড্ডাতে সে-ই তড়পাতো সব চেয়ে বেশী।

তা ছাড়া আপনি মাসে এক দিন কিংবা দু দিন শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা কাফেতে যান। আপনার এক বন্ধু সে কাফেটারই উপরতলায় থাকেন। খাসা জায়গায়—সামনেই নীল নদ বয়ে যাচ্ছে। আপনারই বন্ধু এখানকার এ-আড্ডার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে প্রথম খুঁজবেন কাফেতে—সেখানে না পেলে অবশ্য তাঁর ফ্ল্যাটে যেতে পারেন, তাতে কিন্তু কোনো লাভ নেই।

এ কাফে আপনাকে উদ্বাহু হয়ে অভ্যর্থনা করবে যেন আপনি অনেক দিনের হারিয়ে-যাওয়া ফিরে-পাওয়া ভাই। কারণ আপনি এখানে আসেন কালে-ভদ্রে। আপনাকে পেয়ে এঁদের বিশেষ আনন্দ কারণ পক্ষাধিক কাল ধরে তাঁরা যে সব বিষয় কেটেকুটে ঘষে পিষে চাটনি বানিয়ে ফেলেছিলেন সেগুলো তাঁরা নূতন করে হাড়কাটে ঢুকিয়ে রাম দা' ওঁচাবেন। আপনার রায় জানতে চাইবেন। যে রায়ই দিন না কেন আপনার উদ্ধার নেই। আপনি যদিও গাঁধীর দেশের লোক—আপনি অবশ্য একশ' বার ওঁদের বলেছেন যে, গাঁধীর সঙ্গে আপনার কোনো প্রকারে সাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই, কিন্তু তাতে করে কোনো ফায়দা ওৎরায় না—যদিও আপনার জ্ঞানগম্যিতে কারো কোনো সন্দেহ নেই, কারণ আপনি গুহ্য ষষ্ঠেন্দ্রিয় ধারণ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি তবু স্বীকার করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনি নির্ঘাৎ শেষ বাস্ মিস করবেন। বন্ধুর ফ্ল্যাটে সোফার উপর চতুর্থ যাম যাপন করে পরদিন সকাল বেলা বাড়ি ফিরবেন।

ধূপ-ছায়া

জাহাজে শেষ রাত্রি। পরদিন ভেনিস পৌঁছব।

তিনদিন ধ'রে কারো মুখে আর কোনো কথা নেই—শেষ রাত্রে যে জহুর ফ্যান্সি বল হবে তাই নিয়ে সুবো-শাম জল্পনা-কল্পনা! মহিলারা কে কি পরবেন তাই ভেবে ভেবে আকুল হয়ে উঠেছেন কিন্তু কে কোন্ বেশ ধরবেন সে কথা একে অন্যের কাছ থেকে একদম চেপে যাচ্ছেন। নিতান্ত বিপদে পড়লে তবু বরঞ্চ কোনো পুরুষের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিন্তু স্ত্রীলোক?—নৈব নৈব চ। বুঝলুম, আমাদের দেশে ভুল বলে না, 'বরঞ্চ যমের হাতে স্বামীকে তুলে দেব তবু সতীনের কোলে নয়'। এস্থলে বরঞ্চ অপরিচিত, অর্ধপরিচিত হুলোর সাহায্য কবুল, তবু কোনো মেনির ছায়া মাড়াব না।

আমি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, বয়সে চ্যাংড়া, চব্বিশ হয় কি না হয়। ভয়ে কারোর

সঙ্গে কথা কই নে, পাছে এটিকেটের ব্যাকরণ-ভুল হয়ে যায়। আমার কেবিনে —বিবেচনা করুন খুদ কেবিনে, 'ডেকে' না, 'লাউঞ্জে' না—এক গরবিনী ফরাসিনী ভামিনী এসে উপস্থিত, 'মসিয়ো, তিন সত্যি দাও, কাউকে বলবে না, তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি।'

বাপ মা আদর করে বলতেন আমার নাকি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। আমি বিলক্ষণ জানি, আমার বর্ণ কি? আমারই এক বন্ধু আমার রঙ দেখিয়ে দোকানদারকে বলেছিলেন, ঐ রঙের বুট-পলিশ দিতে। লজ্জায় সেই বর্ণ টিকেয় আগুন ধরার রঙ চড়ালো। সাত বার খাবি খেয়ে বললুম, 'ইয়েস, ইয়েস, উই, উই, উই; বিলক্ষণ, বিলক্ষণ!'

বললেন, 'আপনার সিল্কের পাগড়িটা এক রাত্রের মত ধার দিন।' আমার মত কালো কুচ্ছিৎকে তিনি প্রেমনিবেদন করবেন সে দুরাশা আমি করি নি কিন্তু নিতান্ত গদ্যময়ী পাগড়ি! কে বলে ফরাসিনী সুরসিকা?

তা যাক্ গে—এইটে আসল বক্তব্য নয়। মোদ্দা কথা, এই করে করে ফ্যান্সি বল্ 'রূপায়িত' হল।

ইলাহি ব্যাপার, পেল্লাই কাণ্ড। শিখের বাচ্চা দাড়িমাড়ি বাগিয়ে ভলগা-মাঝির পোশাক পরে নাচছে চীনা পাজামা-কুর্তা পরা নধরা ভিয়েনা-সুন্দরীর সঙ্গে, বগলে ঝাড়ু দেবে মেথরানীর বেশ পরে ফরাসিনী ধেই ধেই করছেন স্প্যানীয় রাজপুত্রের বেশে মিশকালো নিগ্রোর সঙ্গে, রেড্ ইণ্ডিয়ানের রঙ মেখে জাপানী তুর্কী-নাচন নাচছেন এক পার্সী নারীর সঙ্গে—তার সর্বাঙ্গ প্যাকিঙের ব্রাউন-পেপারে মোড়া, তদুপরি কালো হরফে লেখা 'ফ্রেজাইল, উইথ কেয়ার'—কাঁচের বস্তু, ভঙ্গুর, সাবধানে নাড়াচাড়া করো।'

এ সব বস্তু রপ্ত হতে বাঙালী ছেলের সময় লাগে।

আমি কি পরে গিয়েছিলুম তা আর বলব না। একেই তো মর্কটের মত চেহারা, তাকে 'ফিন্‌সি' করলে বড়ি শুকনোর সময় কাগ তাড়াবার জন্য পাড়ায় ডাক পড়বে।

'বারে' গিয়ে দাঁড়ালুম।

উঃ! চ্যাংড়া-চিংড়ীরা কী বেদম ফুর্তিটাই না করতে জানে। হোলির দিনে যেমন মানুষ গায়ে রঙ মাখে এরা ঠিক তেমনি দু পাত্তর রঙিন জল গিলে মনে রঙ লাগিয়ে নিয়েছেন। চোখ অল্প অল্প গোলাপী হয়ে গিয়েছে—বিশ্ব-সংসার গোলাপী রঙে ছোপানো বলে মনে আমেজ লাগছে। না হয় খর্চা হয়েই গেল শেষ কড়ি—খর্চা না করলে খুদা আরো পয়সা দেবেন কি করে? না হয় নাচলই লক্ষ্মীছাড়া মেরিটা ঐ খাটাশ-মুখো সেপাইটার সঙ্গে তোমাকে ছোলাগাছি দেখিয়ে—ভয় কি, আরো মেলা মেরি ফেনী রয়েছে। মনে আরেক পোঁচ রঙ লাগিয়ে লাও হে লাটুবাবু, বাবুরা যখন অত করে কইচেন। বেবাক বাৎ ভুলে যাবে। অত সিরিয়স হয়ো না মাইরি, এই শেষ পরবের রাত্তিরে।

তার সঙ্গে এ কোণে ও কোণে, হেথা-হোথা, একে অন্যের কানে কানে কত 'মৃদু মর্মর গানে মর্মের বাণী বলা', কত 'বেদনার পেয়ালা' ভরে গেল কত হিয়ায়,

কত গান উঠলো বুকে বুকে, 'পিয়ো হে পিয়ো'।'

অরকেস্ট্রা কিন্তু ঢাক ঢোল কত্তাল বাজিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছে—

'ওগো, ডনা ক্লারা, তোমাকে আমি নাচতে দেখেছি
ওগো ডনা ক্লারা, তোমার সোনার ছবি বুকে এঁকেছি।'

* * *

বাইরে এসে ডেকের সুদূরতম প্রান্তে একখানা চেয়ার টেনে একলাটি চুপ করে বসলুম। সিগার সিগরেটের অত্যাচারে সমুদ্রের লোনা হাওয়া জলসাঘরে নাক গলাতে পারে নি; আমাকে পেয়ে খুশী হয়ে আমার সর্বাঙ্গে আদর করে হাত বুলিয়ে গেল।

আজ কি অমাবস্যা? এরকম অন্ধকার শ্রাবণ-ভাদ্রের মেঘাচ্ছন্ন অমা-যামিনীতেও দেশে কখনো দেখি নি। গাছপালা, বাড়িঘরদোর যেন অন্ধকারের খানিকটে শুষে নেয় বলে ডাঙ্গার অন্ধকার সমুদ্রের অন্ধকারের চেয়ে অনেকখানি হাল্কা। এখানে দিনের বেলাকার নীল সমুদ্র আর নীল আকাশ রাত্রিবেলায় যেন এক হয়ে মিশে গিয়ে জমে উঠে গড়ে তুলেছে এক ঘনকৃষ্ণ অন্ধ-প্রাচীর, না—আরো কাছে এসে আমার চোখে মাখিয়ে দিয়ে-গেছে কৃষ্ণাঞ্জন।

শুধু চিলিক মেরে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে প্রপেলারের তাড়ায় ভেসে-ওঠা ফেনা আর বুদ্বুদ। ঐ ফেনাটুকু মাঝে মাঝে না দেখতে পেলে মনে ভয় জাগত অন্ধ হয়ে গিয়েছি, জলসাঘরের দিকে ছুটে গিয়ে আলো দেখে সেখান থেকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে হত।

জাহাজের হৃৎপিণ্ড যেন ধপ্ ধপ্ করছে—তাই অষ্টপ্রহর একটা একটানা মৃদু শিহরণ জাহাজের সর্বাঙ্গে লেগেই আছে। সে শিহরণ এমনিতে দেহেমনে অস্বস্তি জাগায় কিন্তু আজ এই মৃত্যু-অন্ধকারে সে স্পন্দন যেন আমার চৈতন্যবোধকে গভীরতম সুষুপ্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখল।

কান্নার শব্দ?

তাজা হাওয়া পাওয়ার জন্য কে যেন সুদূর জলসাঘরের একখানি জানালা খুলে দিয়েছে। তারই ক্ষীণ আলোতে দেখি একটি মেয়ে রেলিঙে মাথা রেখে কাঁদছে।

এ মেয়ে সিঙ্গাপুর গিয়েছিল তার স্বামীর সঙ্গে হনি-মুন যাপন করতে। সেখানে স্বামী হঠাৎ মারা যায়। দেশে ফিরে যাচ্ছে একা॥

মেশেদিনী

আরেক জাহাজে একটি মহিলা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বয়স, এই ধরুন চল্লিশের সামান্য এদিক-ওদিক। লিপস্টিক, রুজ, পাউডার মাখলে অনায়াসে পঁয়ত্রিশ বলে চালিয়ে নিতে পারতেন। মুখ আর রঙ দেখে বোঝা গেল ইনি খাঁটি মেম নন, কিন্তু ঠিক কোন্ দিশী সেটা অনুমান করতে পারলুম না। পরনে পুরনো ধরনের লম্বা ফ্রক আর গায়ে লম্বা-হাতা ব্লাউজ। চোখে মুখে ভারী একটা প্রশান্তির ভাব লেগে আছে—একটুখানি কেমন যেন উদাস-উদাস ধরনেও স্কুল

বলা হয় না।

কিন্তু তাঁর চেহারা, বেশভূষা, ধরনধারণ সেইটে আসল কথা নয়। তিন চার দিন যেতে না যেতেই লক্ষ্য করলুম, এযাবৎ তাঁকে কারো সঙ্গে একটি মাত্র কথাও বলতে শুনি নি। সমস্ত দিন লাউঞ্জের এক কোণে একা বসে বসে কাটান; তাঁর টেবিলে অন্য কাউকে এসে কথা বলতেও দেখি নি। ওঁর চেয়ে দেখতে খারাপ, বয়সে বেশী, এমন রমণীরাও যখন প্রৌঢ়দের নেকনজর পাচ্ছেন, দু'দণ্ড রসালাপ করাবার অবকাশও পাচ্ছেন, তখন ইনিই বা জাহাজ-যজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে সঙ্গরসের উপেক্ষিতা কেন?

কাউকে জিজ্ঞেস করার মত সাহসও খুঁজে পাই নে। উনি আমার মা হতে পারেন, বেশী জিজ্ঞেসবাদ করলে ঠোঁটকাটারা হয়তো বলে বসবে, 'ইডিপস কম্‌প্‌লেক্স' কিংবা ঐ ধরনেরই কিছু একটা।

তখন হঠাৎ একদিন দেখি, আমারই পরিচিত এক সহযাত্রী লাউঞ্জের ভিতর দিয়ে যাবার সময় ওঁকে নমস্কার করলেন, উনিও উত্তর দিলেন। তাঁকে তখন সুবিধেমত এটা, ওটা, পাঁচটা কথার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, মহিলাটি কারো সঙ্গে কথা কন না কেন? ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করে কথা বলবেন? উনি তো ফার্সী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা জানেন না। ওঁর বাড়ি মেশেদ্।' তারপর বললেন, 'আপনি না কাবুলে ছিলেন? সেখানকার ভাষা পশতু না ফার্সী কি যেন?'

আমি বললুম, 'ফার্সী অনেকখানি ভুলে গিয়েছি; তবে এককালে ফার্সীর মাধ্যমে কাবুলে ইংরিজি পড়িয়েছি।'

আর যাবে কোথায়। আমাকে হিড়হিড় করে হাতে ধরে টেনে নিয়ে চললেন সেই মহিলার দিকে—যেন জলে-ডোবা মানুষকে দম দেবার জন্য বদ্যি খুঁজে পেয়েছেন। আমাকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে এমন একখানা মিষ্টি হাসি ছাড়লেন, যেন তিনি এখ্‌খুনি আমাকে আপন হাতে গড়ে তৈরি করেছেন। নোবেল-প্রাইজ-পাওয়া ব্যাটাকেও বোধ হয় বাপ এতখানি দেমাকের সঙ্গে দুনিয়ার সামনে পেশ করে না।

তারপর বললেন শুধু একটি কথা—'ফার্সী!'

মহিলাটিও এই হুল্লোড়ের মাঝখানে একটুখানি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছেন। সামলে নিয়ে শুধালেন, 'আপনি ফার্সী বলতে পারেন?'

আমি সবিনয় বললুম, 'এককালে পারতুম।'

ভারী একটা পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'বসুন।'

তারপর বললেন, 'আমি যে বেশী কথা কইতে ভালবাসি তা নয়, তবে এই পাঁচ দিন ধরে একটি কথাও বলতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছি। আমি সমস্ত জীবন কাটিয়েছি ইরানের মেশেদ শহরে। তারপর গেল আট বছর লণ্ডনে।'

আমি শুধালুম, 'ইংরিজি শেখেন নি সেখানে?'

বললেন, 'না, লণ্ডনে তো আমি ইচ্ছে করে যাই নি। আমার স্বামী মেশেদে সর্বস্বান্ত হয়ে লণ্ডন গেলেন তাঁর কাকার কাছে। আমরা ইহুদি,

জানেন তো, আমরা ব্যবসা করি দুনিয়ার সর্বত্র। সেখানে ও'র দু'পয়সা হয়েছে, কিন্তু আমাদ্বারা আর ইংরিজি শেখা হল না। ইরান ইহুদিরা যে দু'চারজন লণ্ডনে আছেন, তাঁদের সঙ্গেই মেলামেশা করি, কথাবার্তা কই। তবে হাট করতে গিয়ে "গ্রীন পীজ, কলি-ফ্লাওয়ার, টাপেন্স, ত্রাপেন্স-হে পেনি" বলতে পারি, ব্যস।'

আমি বললুম, 'ইংরিজি তো তেমন কঠিন ভাষা নয়, আর আপনি যে, দু'চারটে ইংরিজি বললেন সেগুলো তো খুব শুদ্ধ উচ্চারণে।'

মহিলাটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কি করে শিখি বলুন? আমার মন পড়ে আছে সেই মেশেদ শহরে। লণ্ডন সাফসুৎরো জায়গা, বিজলি বাতি, জলের কল, খাওয়াদাওয়া, থিয়েটার সিনেমা সবই ভালো—কোথায় লাগে তার কাছে বুড়ো গরিব মেশেদ? তবু যদি জানতুম একদিন সেই মেশেদে ফিরে যেতে পারবো, তাহলেও না হয় লণ্ডনটার সঙ্গে পরিচয় করার চেষ্টা করতুম, কিন্তু যখনই ভাবি ঐ শহরে আমাকে একদিন মরতে হবে, আমার হাড় ক'খানা বাপ-পিতামোর হাড়ের কাছে জায়গা পাবে না, তখন যেন সমস্ত শহরটা আমার দুশমন, আমার জল্লাদ বলে মনে হয়।'

আমি বললুম, 'আপনার এমন কি বয়স হয়েছে যে আপনি মরার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন?'

'তেমন কিছু নয়, জানি, কিন্তু যখন এ কথাও জানি যে, লণ্ডনেই মরতে হবে, তখন যেন বয়সের আর গাছ-পাথর থাকে না।'

আমি শুধালুম, 'মেশেদে ফিরে যাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব? আপনি না বললেন, আপনাদের দু'পয়সা হয়েছে।'

মহিলাটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন। বুঝলুম, সব কিছু আমাকে প্রথম পরিচয়েই বলবেন কি না, তাই নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করছেন। শেষটায় বললেন, 'দুঃখ তো সেইখানেই। আজ আমাদের যা টাকা হয়েছে, তাই নিয়ে আমরা মেশেদের পুরনো ভিটে, জমিজমা সব কিছু কিনতে পারি, নূতন ব্যবসা ফাঁদতে পারি।'

আবার নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'দুঃখ তো সেইখানেই। আমার স্বামী যেতে চান না। লণ্ডন তাঁর ভালো লেগে গিয়েছে। ভূতের মত খাটেন, পয়সা কামান আর মোটর-হোটেল, রেস্তরাঁ-ক্লাব, কনসার্ট-কাবারে করে করে বেড়ান। আমার উপরও চোটপাট, আমিও কেন সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ করি না।'

বললেন, 'বুঝলেন—এখন তিনি লণ্ডনের প্রেমে; বুড়ী মেশেদকে বেবাক ভুলে গিয়েছেন।

জাহাজে যে ক'দিন ছিলুম রোজ দু'একবার ও'র কাছে গিয়ে বসতুম। ভদ্রমহিলা নিজের থেকেই একদিন বললেন, 'আপনি যেন না আবার ভাবেন আমি আপনার এক বোঝা হয়ে উঠলুম। যাঁদের সঙ্গে হৈহল্লা করতে আপনি ভালোবাসেন তাঁদের বাদ দিয়ে আমার সঙ্গে বেশী সময় কাটাবার কোনো

প্রয়োজন নেই।'

আমি আপত্তি জানালুম।

তবু তিনি শান্তভাবে লাউঞ্জে আপন কোণে বসে থাকতেন; কথা বলার জন্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনো চেষ্টাই করতেন না। আমি কাছে গেলেই মিষ্টি হেসে বলতেন, 'বসুন'; তার পর শুধাতেন, 'কি খাবেন বলুন।' জাহাজে খাবার ব্যবস্থা কুলীন শ্বশুরবাড়ির মত, কাজেই এস্থলে 'খাবার' বলতে পানীয়ই বোঝায়।

আমি একদিন বললুম, 'প্রতিবারেই আপনি আমাকে কিছু একটা খেতে বলেন কেন, বলুন তো?'

অবাক হয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য! আপনি মেশেদে অর্থাৎ লণ্ডনে আমার বাড়িতে এলে আপনাকে ভালোমন্দ খেতে দিতুম না?'

আমি বললুম, 'কিন্তু এটা তো আপনার বাড়ি নয়।'

তিনি বললেন, 'সে কি কথা! আমার কাছে এলেন তার মানে আমার বাড়িতে এলেন।'

তারপর বললেন, 'কিন্তু এখানে দিই বা কি? আচ্ছা বলুন তো, আপনি জাহাজের এই বিলিতি রান্না খেতে ভালোবাসেন?'

আমি বললুম, 'এ জাহাজের রান্নার খুশনাম আছে। আমি কিন্তু আমাদের দিশী রান্নাই পছন্দ করি।'

হেসে বললেন, 'তবে আপনার রসবোধ আছে! এই আইরিশ স্টু আর বাঁধাকপি-সেদ্ধ মানুষ কি করে খায় খোদায় মালুম। সেদিন আবার পোলাও রেঁধেছিল—মাগো! ছিরি দেখে ভিরমি যাই।'

আমি শুধালুম, 'মেশেদের লোক পোলাও খায়?'

বললেন, 'হায়, জাহাজে আপন রান্নাবান্নার ব্যবস্থা নেই তা না হলে আপনাকে এ্যাসা পোলাও খাইয়ে দিতুম যে জীবনভর তার সোয়াদ জিভে লেগে থাকত। ভালো কথা, আপনি তো বোম্বাই যাচ্ছেন সেখানে আপনাকে আচ্ছাসে পোলাও খাইয়ে দেব।'

আমি বললুম, 'আমি তো ভেবেছিলুম আপনি মিশর যাচ্ছেন।'

তিনি বললেন, 'ওঃ, আপনাকে বলি নি বুঝি, আমি বোম্বাই যাচ্ছি—আমার মেয়ের সেখানে বিয়ে হয়েছে। যে ভদ্রলোক আপনাকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন তিনি আমার স্বামীর বন্ধু। উনি বিপদে-আপদে সাহায্য করতে পারবেন বলেই এই জাহাজে যাচ্ছি।'

তারপর একটুখানি লাজুক হাসি হেসে বললেন, 'আমি যে দিদিমা হতে চললুম।'

তারপর রোজই গল্প হত তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে। আমাকে কতবার জিজ্ঞেস করতেন, বোম্বাইয়ে ভালো ডাক্তার-বদ্যির ব্যবস্থা আছে কি না। আমি বলতুম, লণ্ডনের মত না, তবে ব্যবস্থা মেশেদের চেয়ে নিশ্চয়ই ভালো। ইঙ্গেক জর্মনিতে পাস-করা ইহুদী ডাক্তারও বোম্বাইয়ে আছেন।

বললেন, 'ও কথা বলবেন না, মশাই ; মেশেদে আমাদের যে বুড়ী ধাইমা ছিলেন তাঁর হাতে কখনো কোনো পোয়াতী মরে নি, কোনো বাচ্চা কোনো জখম নিয়ে জন্মায় নি। আর তাঁর সব কেরদানি তো শুধুমাত্র দু'খানা খালি হাত দিয়ে —ডাক্তারদের যন্তরপাতির তো উনি ধার ধারতেন না।'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে এখনো এ রকম ধাই আছেন তবে বোম্বাই শহর, সেখানে সায়েব-সুবোদের ব্যাপার।'

উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আপনি ঠিক ধরেছেন কিন্তু আজকের দিনের বড় শহরে কেউ আর একথা মানে না। আমার মেয়েকে চিঠিতে ঐ কথা লিখেছিলুম, সে তো হেসেই উড়িয়ে দিল।'

চুপ করে থেকে বললেন, 'আর দেবেই না কেন ? ওর ছেলেবেলা ও মেশেদে কাটিয়েছে কিন্তু মেশেদের জন্য তো ওর এতটুকু দরদ নেই। আমার স্বামীরই মত, লণ্ডন-প্যারিসের নামে অজ্ঞান।'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'আপনি এ নিয়ে এত শোক করেন কেন ? সে সব কাল গেছে, জমানা বদলে গিয়েছে ; এখনও মানুষ আঁকড়ে ধরে থাকবে নাকি মেশেদ কারবালা, কান্দাহার হিরাত ?'

বললেন, 'কেন, আপনি তো প্যারিস ভিয়েনা লণ্ডন বার্লিন দেখেছেন—তবু তো ফিরে যাচ্ছেন কোথাকার এক ছোট শহরে।'

আমি ঘাড় চুলকে বললুম, 'আমার যে মা রয়েছেন।'

বললেন, 'একই কথা ; মা যা মায়ের শহরও তা।'

* * *

বোম্বাইয়ে জাহাজ ভিড়েছে। এক সুন্দরী তরুণী আর ছোকরাকে দেখে আমার পরিচিতা মহিলা আকুল হয়ে উঠলেন। তাঁরা জাহাজে উঠতেই তিন-জনে জড়াজড়ি কোলাকুলি। আমি একটুখানি কেটে পড়লুম।

তা হলে কি হয়, আমার নিষ্কৃতি নেই। আমাকে পাকড়ে ধরে নিয়ে মেয়ে জামাইকে বার বার বলেন, 'এই আমার বন্ধু দিল-জানের দোস্ত, আমার সঙ্গে ফার্সী কথা কয়েছে, ফুর্তি-ফার্তি হৈ-হল্লা ছেড়ে দিয়ে।'

মেয়ে যতই জিজ্ঞেস করে, জাহাজে ছিলে কি রকম, খেলে কি, বাবা কি রকম আছেন, কে বা শোনে কার কথা, সত্য-সত্যই জাহাজে যেন 'সমুদ্রে রোদন'। তিনি বার বার বলেন, 'বুঝলি, নয়মি, এঁকে আচ্ছাসে খাইয়ে দিতে হবে। পোলাওর সব মালমসলা আছে তো বাড়িতে ?'

ভেবেছিলুম হোটেলে উঠব। মহিলা শোনামাত্র আমাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন তাঁদের সঙ্গে, আমাকে কড়া নজরে রাখলেন কাস্টম অফিসে, যেন আমি চোরাই মদ—পাছে কাস্টমস্ আমাকে পাকড়ে নিয়ে যায়।

তিন দিন তাঁদের সঙ্গে থেকে অতি কষ্টে নিষ্কৃতি পাই।

সে তিন দিন কি রকম ছিলুম ? মাছ যে রকম জলে থাকে। ভুল বলা হল ; মাছকে যদি শুধান, 'কি রকম আছো ?' তবে সে বলবে, 'সৈয়দের ব্যাটা যে রকম ইহুদী পরিবারে ছিল।'॥

কোন্-ভিনারের মা

বরোদায় চাকরি নেবার কয়েকদিন পরেই ডাঃ এর্নস্ট্ কোন্-ভিনারের (অর্থাৎ ভিয়েনার Cohn) সঙ্গে আলাপ হয়। যদিও নাম থেকে বোঝা যায়, 'কোন্' পরিবার এককালে ভিয়েনায় বসবাস করতেন তবু ইনি বার্লিনেই জন্মান, পড়াশুনো করে সেখানে নামজাদা অধ্যাপক হন এবং হিটলার ইহুদীদের উপর চোট-পাট আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সস্ত্রীক লণ্ডন চলে যান। বুড়ো মহারাজ তৃতীয় সয়াজীরাও তাঁকে সেখান থেকে পাকড়াও করে নিয়ে এসে বরোদা যাদুঘরের বড়-কর্তা বানিয়ে বসিয়ে দেয়।

লোকটির পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ এবং তাঁর স্ত্রীও এতখানি লেখাপড়া জানতেন যে তিনি তাঁর স্বামীকে পর্যন্ত কাজকর্মে সাহায্য করতে পারতেন। সয়াজীরাওয়ের পাঠানো 'ভিনাস দি মিলো,' মাইকেল এঞ্জেলোর তৈরী 'মোজেস' ও 'মুমূর্ষু দাসের' প্লাস্টার-কাস্ট যেদিন বার্লিন থেকে বরোদা এসে পৌঁছল, সে দিন ফ্রাউ কোন্-ভিনারের কী উত্তেজনা-উৎসাহ! স্টেশনে গিয়ে সেই বিরাট বিরাট বাক্স নিজে তদারকি করে নামালেন, আহার নিদ্রা শিকেয় তুলে দিয়ে কাস্ট্-গুলোকে যাদুঘরে সাজালেন,—সে সময় তিনি যাদুঘরে একটানা চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন,—তারপর ফোলা-ফোলা লাল-লাল চোখ নিয়ে বেরলেন, আমাদের খবর দিতে, প্রভুরা বহাল-তবিয়তে যাদুঘরে আসর জমিয়ে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। পাছে আমি হুজুরদের কিমৎ ঠিকমত মালুম না করতে পেরে তেনাদের 'তাচ্ছিল্য' করি, তাই আমাকে তাঁর মোটরে তুলে নিয়ে গিয়ে হুজুরদের সঙ্গে নিজে পরিচয় করিয়ে দিলেন। হুজুরদের নাম-গোত্র, হাল-হকিকৎ, হাড়-হদ্দ এমনি গটগট করে বয়ান করে দিলেন যে, তার থেকেই বুঝতে পারলুম যে এঁর এলেমের এক কাহন পেলেও আমি সুবে বোম্বাই-বরোদা-আহমদাবাদের 'কলা-বাজারে' বাকী জীবন বেপরোয়া হয়ে দাবড়ে বেড়াতে পারব।

আর হ্যার ডক্টর কোন্-ভিনারের পাণ্ডিত্য আমাকে ফলিয়ে বলতে হবে না। নন্দন-শাস্ত্র এবং বিশ্ব-স্থাপত্যের বিভিন্ন শৈলী সম্বন্ধে তিনি যেসব কেতাব লিখে গিয়েছেন, সেগুলো নাৎসী-পতনের পর ফের ছাপা হতে শুরু হয়েছে।

স্থাপত্যে পণ্ডিত অথচ বাল্যকালে তিনি লেখাপড়া শেখেন রাব্বিদের (ইহুদী পুরুষ-পণ্ডিত) টোলে। তাই ইহুদি ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর; অথচ ইহুদীদের আচার-ব্যবহার, তাদের কঞ্জুসি নিয়ে তিনি ঠাট্টা-মস্করা করাতে ইহুদীর শত্রু ক্রীশ্চানের চেয়েও ছিলেন বাড়া। সেসব রসিকতা একদিন মোকা-মাফিক ছাড়বার বাসনা আমার আছে।

স্বামী স্ত্রী দুজনেরই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পুত্র-কন্যা হয় নি, অথচ দুজনেরই হৃদয় ছিল স্নেহে ভরা। 'দেশে'র পাঠক এই ইঙ্গিত থেকেই টক্ করে বুঝে যাবেন, আমি তাঁর ন'সিকে সুযোগ নিতে কসুর করি নি। যতদিন কোন্-ভিনাররা এদেশে ছিলেন, ততদিন জর্মন বই, মাসিক, খবরের কাগজের জন্য আমাকে কিছুমাত্র দুর্ভাবনা করতে হয় নি।

'সে বছরে ফাঁকা, পেনু কিছু টাকা' ধরনে কি করে যে কিছু টাকা আমার হাতে '৩৮ ('ইংরেজিতে') জমে গিয়েছিল, সেটা নিতান্ত আমি বলছি বলেই আজ আমার বিশ্বাস হয়—হায়, এখন যা অবস্থা, '৩৮-এর মুজতবা আলীকে পথে পেলে 'দাদা, বাছা' বলে তার কাছ থেকে দু-পয়সা হাতিয়ে নিতুম।

তা সে কথা যাকগে। সে জমানো টাকাটা হাতে বড্ড বেশি চুলকোচ্ছিল বলে বাসনা হল জর্মনিতে গিয়ে সে-টাকাটা পুড়িয়ে আসি। বন্ধুবান্ধব সে দেশে মেলা, ওদিকে হিটলার যা নাচন-কুদন আরম্ভ করেছে, কখন না দুম করে লড়াই লেগে যায়, আর তাঁরাও সেই বেপ্যাঁচে পড়ে প্রাণটা হারান।

বরোদা ছোট্ট জায়গা—তাই খাসা জায়গা। তিন দিনের ভিতর পাসপোর্ট হয়ে গেল। বোম্বাই কাছে ; ট্রাঙ্ককল করে জাহাজের টিকিট কাটা হয়ে গেল —আর গরম সুটমুট তো ছিলই। শিকের হাঁড়ি থেকে নামিয়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে তৈরি করে নিলুম।

কোন্-ভিনারদের বললুম, জর্মনি যাচ্ছি।

শুনে দুজনেই চমকে উঠলেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন। বুঝলুম, দেশের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে—যে-দেশ আবার দেখবার সৌভাগ্য হয়ত তাঁদের জীবনে আর কখনো আসবে না। আর কিছু বুঝি না বুঝি, বিদেশে দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে বুকটা যে কি রকম তেলে-ফেলা বেগুনের মত ছ্যাঁৎ করে ওঠে, সেটা বিলক্ষণ বুঝি ; এবাবতে আমি বিস্তর পোড়-খাওয়া গরু। চুপ করে রইলুম।

কোন্-ভিনার শুধালেন, 'আপনি কি বার্লিন যাবেন ?'

আমি বললুম, 'এবারে জর্মনি যাচ্ছি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে। তারা তামাম জর্মনি ছড়িয়ে। বন্ন্, কলোন, হানোফার, বার্লিন অনেক জায়গায়ই যেতে হবে।'

কোন্ ভিনার বললেন, 'আমরা বার্লিন ছাড়ি '৩৩এ। এদেশে আসি '৩৫এ। এখানে আসার পর আমার পরিচিত কেউ বার্লিন যায় নি ; আমার বুড়ী মাকে এই তিন বৎসরের ভিতর কেউ গিয়ে বলতে পারে নি যে সে আমাকে দেখেছে, আমি ভালো আছি। আমি ছাড়া আমার মায়ের এ সংসারে আর কেউ নেই। আপনি যদি—'

আমি বমলুম, 'আমি অতি অবশ্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব ; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

খানিকটা কিন্তু-কিন্তু করে কোন্-ভিনার শেষটায় বললেন, 'তবে দেখুন, একখানা পোস্টকার্ড লিখে তার পর যাবেন। আমার মার বয়স আশীর কাছাকাছি। আপনি যদি হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হন তবে তিনি জোর শক্ পাবেন। সেটা সামলাবার জন্য--'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি খবর দিয়েই যাব।'

কোন্-ভিনার বললেন, 'আর দেখুন, আমার যে হার্ট-ট্রাবল সেটা একদম চেপে যাবেন। কি হবে বুড়ীকে জানিয়ে ? আমার বাবাও হার্টের রোগে মারা যান।

আমি বললুম, 'বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি ঠিক ধরতে পেরেছি। এ-জিনিস সবাই করে থাকে। আমি ওঁকে বলব, আপনারা দুজনেই আরামে দিন কাটাচ্ছেন। এই তো?'

পবননন্দনপদ্ধতিতে এক লম্ফে বার্লিন পেঁছিই নি। বোম্বাই, জেনওয়া, জিনীভা, লেজাঁ, বন্ন্, কলোন, ডুসেলডর্ফ, হানোফার হয়ে হয়ে শেষটায় বার্লিন পেঁছিলুম। পূর্বেই নিবেদন করেছি, বিষ্ণুচক্রে কর্তিত খণ্ড খণ্ড সতীদেহের ন্যায় আমার বন্ধুবান্ধব ছড়িয়ে আছেন দেশ-বিদেশে।

৩২এ নাৎসিরা রাস্তায় কম্যুনিস্টদের উপর গুণ্ডামি করতো, ৩৪এ তারা ছিল দম্ভী—এবারে ৩৮এ গিয়ে দেখি, তাদের গুণ্ডামিটা চলছে ইহুদীদের উপর। তার বর্ণনা অনেকেই পড়েছেন, আমাকে আর নূতন করে বলতে হবে না।

পোস্টকার্ডে লিখলুম, 'আমি এর্নস্ট কোন্-ভিনারের মিত্র; বরোদা থেকে এসেছি, আপনার সঙ্গে বুধবার দিন সকাল দশটায় দেখা করতে আসব।'

যে মহল্লায় কোন্-ভিনারের মা থাকতেন আমি সে পাড়ায় পূর্বে কখনো যাই নি। যে বিরাট চক-মেলানো বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হলুম, সেখানে অন্তত চল্লিশটা ফ্ল্যাট থাকার কথা। অথচ অবাক হলুম, জর্মন বাড়ির দেউড়িতে যে রকম সচরাচর সব পরিবারের নাম আর ফ্ল্যাটের নম্বর লেখা থাকে এখানে তার কিছুই নেই। ওদিকে দেউড়ির চেহারা দেখে মনে হল, এককালে নেমপ্লেট-গুলো দেউড়ির পাশের দেয়ালে লাগানো ছিল। যে দু'একটি লোক আনাগোনা করছে তাদের চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল এরা ইহুদী,—অনুমান করলুম, সমস্ত বাড়িটাই ইহুদীদের—এবং চোখেমুখে কেমন যেন ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব। আমার দিকে তাকালও সন্দেহের চোখে, আড়নয়নে।

বুড়ীর ফ্ল্যাটের নম্বর আমি জানতুম। একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, 'বারো নম্বর ফ্ল্যাট যেতে হলে কোন্ সিঁড়ি দিয়ে ক'তলায় যেতে হয় বলতে পারেন?' 'না' বলে লোকটা কেটে পড়ল। আরো দু-তিনজনকে জিজ্ঞেস করলুম, সবাই বলে 'না'।

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হলুম, কারণ আমার অজানা ছিল না যে ইহুদীরা পাড়াপ্রতিবেশীর খবর রাখে সবচেয়ে বেশী—এবং বিশেষ করে প্রতিবেশী যদি আপন জাতের লোক হয়।

তখন হঠাৎ আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। মনে পড়ল, দশ বৎসর পূর্বে কাবুলেও আমার ঐ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেখানেও রাস্তায় কেউ কারো বাড়ি বাৎলে দেয় না। কারণ অনুসন্ধান করাতে এক বিচক্ষণ কাবুলী বলেছিলেন, 'বলতে যাবে কেন? তুমি যদি লোকটার বন্ধু হও, তবে তার বাড়ি কোথায়, সে-কথা তো তোমার জানা থাকার কথা। হয়ত তুমি স্পাই, কিংবা রাজার কাছ থেকে এসেছ তাকে তলব করতে। সেখানে হয়ত তার ফাঁসি হবে। লোকটার বাড়ি বাৎলে দিয়ে আমি তার

অপমৃত্যুর গৌণ কারণ হতে যাব কেন ?'

এখানে ইহুদীরাও ঠিক সেই পন্থাই ধরেছে। হয়ত আমি নাৎসি স্পাই—কি মতলবে এসেছি কে জানে ?

শেষটায় অনেক ওঠা-নামা করে বারো নম্বর ফ্ল্যাট খুঁজে পেলুম—ফ্ল্যাটের নম্বর পর্যন্ত ইহুদীরা সরিয়ে ফেলেছে। ঘণ্টা বাজাতে দরজার একটা কাচের ফুটো (এ ফুটোটা আবার পিতলের চাক্তি দিয়ে ভিতর থেকে ঢেকে রাখা হয়) দিয়ে কে যেন আমায় দেখে নিলে। আমি একটু চেঁচিয়ে আমার পরিচয় দিলুম।

একটি তরুণী—তারও মুখে উত্তেজনা আর ভীতি—দরজা খুলে দিল। আমি ঢুকতেই তড়িঘড়ি দরজা বন্ধ করে দিল।

আমাকে নিয়ে গেল ড্রয়িং-রুমে। সেখানে দেখি এক অথর্ব থুরথুরে বুড়ী কৌচের এক কোণে কৌচেরই চামড়ার সঙ্গে হাত আর মুখের শুকনো চামড়া মিলিয়ে দিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। আমি বললুম, 'করেন কি, করেন কি, আমি এর্নস্টের বন্ধু, আমার সঙ্গে লৌকিকতা করতে হবে না।'

তবু বুড়ী অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। দুখানা হাড্ডি-সার ফালি ফালি হাত দিয়ে আমার দু-বাহু ধরে বললেন, 'বারান্দায় চলুন—সেখানে আলোতে আপনাকে ভালো করে দেখব।'

বাইরে বসিয়ে আমাকে তাঁর ঘোলাটে চোখ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন।

তারপর হঠাৎ ঝর ঝর করে দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল—আমি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েছিলুম, হঠাৎ যে এ রকম দু'চোখ ভেঙে জল নেমে আসবে তার কণামাত্র পূর্বাভাস পাই নি।

চোখ মুছে বললেন, 'মাপ করবেন, আমি কাঁদছিলুম না, আমার চোখ দিয়ে যখন-তখন এ রকম জল নেমে আসে। আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারি নে। আমি এখন কাঁদব কেন ? আমি কত খুশী। এর্নস্ট কি রকম আছে ? তার বউ ?'

আমি বললুম, 'বড় আরামে আছেন। জানেন তো, ভারতবর্ষ খারাপ দেশ নয়। এর্নস্টের কাজও শক্ত নয়। ভালো বাড়িঘর পেয়েছেন। আর জানেন তো এর্নস্টের স্বভাব—দু'বছর হয়েছে মাত্র এরই মধ্যে অনেক বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে নিয়েছেন। আপনার বৌমা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমাদের লাঞ্চ-ডিনার খাওয়ান। আমাকে বড্ড স্নেহ করেন।'

দেখি বুড়ী কাঁপছেন আর বার বার রুমাল বের করে চোখ মুছছেন।

আমার হাত দুখানি ধরে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আমি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছি—কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছি নে। আমার বুকের ভিতর কি যেন হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কাল আবার আসতে পারবেন ? না,—হয়ত আপনার অনেক কাজ ?'

আমি বুঝতে পারলুম, বুড়ী নিজেকে সামলাবার জন্য সময় চান। বললুম,

'নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি কাল আসব। আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আমার তো এখানে কোনো কাজ-কর্ম নেই ; ছুটি কাটাতে এসেছি মাত্র।'

বানিয়ে বানিয়ে গল্প জমাচ্ছি না, তাই যদি বিবরণটি নন্দনশাস্ত্রসম্মত স্বরূপ গ্রহণ না করে তবে আশা করি সুশীল পাঠক অপরাধ নেবেন না। কোন্-ভিনারের মা'র বেদনা নিয়ে সুন্দর গল্প রচনা করা যায় জানি, কিন্তু আমার মনের উপর সে এমনই দাগ কেটে গেছে যে সেটাকে গল্পের খাতিরে ফের-ফার করতে আমার বড্ড বাধো বাধো ঠেকে। সুরসিক পাঠক সেটা হয়ত বুঝতে পারবেন না, তবে সহৃদয় পাঠকের সহানুভূতি পাব সে আশা মনে মনে পোষণ করি।

দ্বিতীয়বারে বুড়ী অতটা বিচলিত হলেন না। এবারেও কাঁদলেন তবে জর্মনি বিজ্ঞানের দেশ বলে তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিলেন ; বললেন, চোখের কাছের যে স্যাক্ থেকে জল বেরোয়, বুড়ো বয়সে মানুষ নাকি তার উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে। হবেও বা, কিন্তু বিদেশে ছেলের কথা ভেবে মা যদি অঝোরে কাঁদে তবে তার জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন ?

শুধালেন, 'এস্‌পেরেগাস্ খাবেন—একটুখানি গলানো মাখনের সঙ্গে ?'

আমি তো অবাক। এস্‌পেরেগাস্ মানুষে খায় পশ্চিম বাঙলায় যে রকম আসল খাওয়া হয়ে গেলে টক খাওয়া হয়। বলা নেই কওয়া নেই, সকাল বেলা দশটার সময় সুস্থ মানুষ হঠাৎ টক খেতে যাবে কেন ?

মজাটা সেইখানেই। আমি এস্‌পেরেগাস্ খেতে এত ভালোবাসি যে রাত তিনটের সময় কেউ যদি ঘুম ভাঙিয়ে এস্‌পেরেগাস্ খেতে বলে তবে তক্ষুনি রাজী হই। ভারতবর্ষে এস্‌পেরেগাস্ আসে টিনে করে—তাতে সত্যিকার সোয়াদ পাওয়া যায় না—তাজা ইলিশ নোনা ইলিশের চেয়েও বেশী তফাৎ। সেই এস্‌পেরেগাসের নামেই আমি যখন অজ্ঞান তখন এখানকার তাজা মাল !

মা-ই বললেন, 'আমি যখন এর্নস্টের কাছ থেকে খবর পেলুম, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, তখন বউমাকে লিখলুম, আপনি কি খেতে ভালোবাসেন সে খবর জানাতে। বউমা লিখলে পুরো লাঞ্চ খাওয়াতে হবে না, শুধু এস্‌পেরেগাস্ হলেই চলবে। সৈয়দ সাহেব মোষের মত এস্‌পেরেগাস্ খান—বেলা-অবেলায়।'

বুড়ী মধুর হাসি হেসে বললেন, 'পুরো লাঞ্চ এখন আমি আর রাঁধতে পারি নে, বউমা জানে। তাই আমার মনে কিন্তু-কিন্তু রয়ে গিয়েছে, হয়ত আমাকে মেহন্নত থেকে বাঁচাবার জন্য লিখেছে আপনি বেলা-অবেলায় এস্‌পেরেগাস্ খান।'

আমি বললুম, 'আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'দেশে'র চতুর পাঠকদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখে আর কস্য লভ্য যে আমি পেটুক। উল্টে তাঁরা বুঝে যাবেন, মিথ্যেবাদীও বটে।

এস্‌পেরেগাসের পরিমাণ দেখে আমার চোখ দুটো পটাং করে সকেট্ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। মহা মুশকিল সেগুলো কার্পেট থেকে কুড়িয়ে নিয়ে

সকেটে ঢুকিয়ে এস্‌পেরেগাস্‌ গ্রাস করতে বসলুম।

জানি, এক মণ বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু প্লীজ, আধ মণ না মানলে আমাকে বড্ড বেদনা দেওয়া হবে। সুকুমার রায়ের 'খাই-খাই' খানে-ওয়ালাও সে-খানা শেষ করতে পারত না।

আমি ঐ এক বাবদেই আমার মাকে খুশী করতে পারতুম—গুরুভোজনে। ধর্মসাক্ষী, আর সব বাবদে মা আমাকে মাফ্‌ করে দিয়েছেন। কোন্‌-ভিনারের মা পর্যন্ত খুশী হলেন, তাতে আর কিমাশ্চর্যম্‌!

হায় রে দুর্বল লেখনী—কি করে কোন্‌-ভিনারের মায়ের এস্‌পেরেগাস্‌ রান্নার বর্ণনা বতরিবৎ বয়ান করি! অমিত্রাক্ষর ছন্দে শেষ কাব্য লিখেছেন মাইকেল, শেষ এস্‌পেরেগাস্‌ রেঁধেছেন কোন্‌-ভিনারের মা।

আহারাদি শেষ হলে পর কোন্‌-ভিনারের মা বললেন, 'আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

আমি বললুম, 'আদেশ করুন।'

তিনি বললেন, 'আপনি যদি না করতে পারেন, তবে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হব না।'

একটি অপরূপ হিরে লাগানো সোনার আংটি বের করে বললেন, 'নাৎসিরা এখন আর কোনো দামী জিনিস জর্মনির বাইরে যেতে দেয় না—সে নিয়ে তাদের উপর আমার কোনো ক্ষোভ নেই—আমি কি করে জানবো দেশের মঙ্গল কিসে। কিন্তু এ আংটিটা এর্নস্টের প্রাপ্য। তার বাপঠাকুদ্দা চোদ্দপুরুষ এই আংটিটা পরে বিয়ে করেছিলেন; এ আংটিটা তাকে দেবেন।'

আমার আঙুলে ঠিক লেগে গেল। আমি বললুম, 'আপনাকে ভাবতে হবে না।'

একটা সোনার চেনে ঝোলানো জড়োয়া পদক দিয়ে বললেন, 'এটা এর্নস্টের বাপ আমাকে বিয়ের রাতে বাসরঘরে দিয়েছিলেন, (পঞ্চাশ বছর পরে সেই পরবের স্মরণে তিনি একটুখানি লাজুক হাসি হাসলেন) এটা বউমার প্রাপ্য। এটা আপনি তাকে দেবেন।'

আমি কলার খুলে গলায় পরে নিয়ে বললুম, 'নিশ্চিন্ত থাকুন।'

কোন্‌-ভিনারের মা পই পই করে বললেন, 'কাস্টম্‌সের বিপদে পড়লে জানলা দিয়ে ফেলে দেবেন কিংবা ওদের দিয়ে দেবেন। আমি কোন শোক করব না। ছেলে, বউকে আমি চিঠিতে এ বিষয়ে কিছুই জানাচ্ছি নে। তাদেরও কোনো শোক করতে হবে না।'

বরোদা ফিরে আমি কোন্‌-ভিনারকে আংটি দিলুম, তাঁর বউকে পদক দিলুম।

* * *

ছ'মাস পরে বুড়ী মারা যান। কোন্‌-ভিনার এক বছর পরে মারা যান। তাঁর স্ত্রী এখন কোথায় জানি নে।

কোদণ্ড মুখহানা

(জীবনী)

দ্বিতীয়বার বিলেতে যাওয়ার সময় জাহাজে চড়ে যে অনুভূতিটা হয়, তার সঙ্গে দোজবরের মনের অবস্থা তুলনা করা যেতে পারে। ঔৎসুক্য, আশঙ্কা সব কিছুরই তখন কমতি ঘটে, বাড়িতে থাকে শুদ্ধমাত্র হুঁশিয়ারিটা, অর্থাৎ প্রথমবারে যে-সব ভুল করেছি, আবার যেন সেগুলো নতুন করে না করতে হয়। প্রথমবারের উৎসাহের চোটে বউকে কুমার জীবনের দু'একটা রোমাণ্টিক কাহিনী বলে ফেলে যে মারাত্মক ভুল করেছিলুম, এবারে আর সেটি করব না। প্রথমবার বিলেতে যাওয়ার সময় প্রকাশ করে ফেলেছিলুম যে পকেট লাইট-ওয়েট চেম্পিয়ান, এবারে আর সে পাঁচালি না, এবার ব্লাফ দিয়ে স্টুয়ার্ড, কেবিনবয় সকলের কাছ থেকে পুরোমাত্রায় খাতিরযত্ন উশুল করে মামুলী টিপ দিয়েই মোকামে পেঁছাব।

তারই ব্যবস্থা করতে করতে খানার ঘণ্টা বেজে গেল। প্রথমবার বিলেতে যাবার সময় ঘণ্টা শুনে জেলের কয়েদীর মত হন্তদন্ত হয়ে ছুট মেরেছিলুম খানা-কামরার দিকে, এবারে গেলুম ধীরে-সুস্থে, গজ-মন্থরে। এবারে ভয় নেই, ভরসাও নেই!

ভেবেছিলুম, গিয়ে দেখব, সায়েব-মেমের হৈ-হল্লার এক পাশে নেটিভ্‌রা মাথা গুঁজে ছুরি-কাঁটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে এমনি ব্যস্ত যে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাবার ফুরসৎ পাচ্ছেন না, কিন্তু যা দেখলুম, তাতে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

উত্তম বিলিতি কাটের ডবল-ব্রেস্ট কোট, মানানসই শার্টকলার, শিষ্ট-সংযত টাই-পরা এক শ্যামবর্ণের দোহারা গঠন দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক তুর্কী টুপির ট্যাসেল দুলিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে গল্প বলে আসর জমিয়ে তুলেছেন আর আটজন ভারতীয় অন্নগেলা বন্ধ করে গোগ্রাসে তাঁর গল্প গিলছে। আমি টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক অতিশয় সপ্রতিভভাবে গল্প বলা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। ন্যাপকিনে হাত মুছতে মুছতে মৃদু হেসে বললেন, 'এই যে আসুন, ডাক্তার সাহেব, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলুম। টেবিলের মাথাটা আপনার জন্যেই রেখেছি, আর তো সব ছেলে-ছোকরার দল! এদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই।' বলে বেশ গট গট করে বোস্, চাটুজ্যে, শুক্ল, মিশ্র, চৌধুরী ইত্যাদি আটজন ভারতীয়ের নাম অবলীলাক্রমে বলে যেতে লাগলেন।

লোকটি গুণী বটে! দশ মিনিট হল যাবার ঘণ্টা পড়েছে। এরি মধ্যে আটজন লোকের সঙ্গে শুধু যে আলাপই করে নিয়েছে তাই নয়, সকলের নাম বেশ স্পষ্ট মনেও রেখেছে।

সব শেষে বললেন, 'আমার নাম মুখহানা।'

এ আবার কোন্ দিশী নাম রে বাবা! পরনে সুট্, মাথায় তুর্কীর টুপি। গড়গড় করে ভুল-শুদ্ধে-মেশানো ইংরিজি বলছে। মিশরের লোক? উহুঁ! সিংহলী? কি জানি। মুসলমান তো নিশ্চয়ই—তুর্কী টুপি যখন রয়েছে।

দু'খানা ফর্ক হাতে তুলে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এঁদের রাস্‌ল্ পাশার গল্প শোনাচ্ছি।' বলে গোড়ার দিকটা যে আমি শুনতে পাই নি, তার জন্যে যেন মাপ চাওয়ার মৃদু হাসি হেসে বললেন, 'আশ্চর্য লোক রাস্‌ল্ পাশা। প্রথম তো মিশর থেকে তাড়ালেন হসীস। তারপর এসে জুটল ককেইন। সে যে কি অদ্ভুত কায়দায় মিশরে ঢুকতো, তার সন্ধান না পেয়ে সি. আই. ডি. যখন হার মানলো, তখন রাস্‌ল্ পাশাই কায়দাটা বের করলেন। কি করে যে লক্ষ্য করলেন, ভিয়েনা থেকে টেবিলের পায়ার ভিতরে করে গুপ্তি ককেইন আসছে, সেটা তাকে না জিজ্ঞেস করে সি. আই. ডি. পর্যন্ত ঠাহর করতে পারে নি। রাস্‌ল্ পাশাই বুঝিয়ে বললেন, "ভিয়েনার চেয়ে কাইরোর কাঠের আসবাব অনেক বেশী মিহিন, সস্তাও বটে। তার থেকেই বুঝলুম, নিশ্চয়ই কোনরকম শয়তানির খেল রয়েছে। একটা টেবিলের পায়া ভাঙতেই ককেইন বেরিয়ে পড়ল।" বুঝুন, লোকটার কড়া চোখের তেজ। কাস্টম অফিসে কি মাল আসছে-যাচ্ছে, তাতে যেন এক্সরে হয়ে ঢুকছে বেরুচ্ছে।'

তারপর গল্প ক্ষান্ত দিয়ে নিপুণ হাতে দু'খানি ফর্ক দিয়ে মাছের কাঁটা বাছতে লাগলেন। ভদ্রলোকের খাওয়ার তরিবৎটা দেখবার মত হেকমৎ—যেন পাকা সার্জনের অপারেশন। এবং তার চেয়েও তারিফ করবার জিনিস তাঁর গল্প করা এবং সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে যাওয়ার মেকদার জ্ঞান। খাওয়ার সময় যারা গল্প বলতে ভালোবাসে, তাদের বেশীর ভাগই খাওয়াটা অবহেলা করে শেষের দিকে হড়হড় করে সব কিছু গিলে ফেলে। এ ভদ্রলোক দুটোই একসঙ্গে চালালেন ধীরে-সুস্থে, তাড়াহুড়ো না করে। আমি বললুম, 'আপনি দেখছি মিশরের অনেক কথাই জানেন।' তাঁর মুখে তখন মাছ। কথা না বলে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। ভাবখানা এই 'একটু দাঁড়ান, গ্রাসটা গিলি, তারপর বলব।'···বললেন, 'জানব না? আমি আঠার বছর কাইরোতে কাটালুম যে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মিশর ছাড়লেন কবে?'

তিনি বললেন, 'ছাড়বো কেন, এখনও তো সেখানেই আছি।'

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলুম। বললুম, 'বিলাত থেকে ফেরার মুখে কিছুদিন মিশরে কাটানো আমার বাসনা। কাইরোতেই থাকব ভাবছি।'

প্লেটের মাছের দিকে তাকিয়েই বললেন, 'হুঁ।'

আমি তো অবাক। এরকম অবস্থায় দেশের লোক অন্ততপক্ষে বলে, আসবার খবরটা দেবেন, সহৃদয় লোক নানাপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। এ ভদ্রলোকের কথাবর্তা চালচলন দেখে তো মনে হয়েছিল, ইনি কাইরোর মত পাণ্ডববর্জিত দেশে স্বদেশবাসীকে লুফে নিন আর নাই নিন, গতানুগতিক ভদ্রতার সম্বর্ধনাটা অন্তত করবেন। তাই তাঁর দরদহীন 'হুঁ'-টার ভেজাকম্বল আমার সর্বাঙ্গে যেন কাঁপন লাগিয়ে দিল। আর পাঁচজনও যে একটু আশ্চর্য হয়েছেন স্পষ্ট বুঝতে

পারলুম। তারপর গালগল্প তেমন করে আর জমলো না।

খাওয়ার পর উপরে এসে ডেকচেয়ারে শুয়ে বিরস বিবর্ণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় সেই ভদ্রলোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার মুখে তিনি ঈষৎ অবহেলার ভাব লক্ষ্য করলেন কিনা জানি নে, তবে বেশ সপ্রতিভভাবেই আমার পাশের ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'আপনি আমায় মাপ করুন।' আমি বললুম, 'সে কি কথা, কি হয়েছে?' বললেন, 'আমি ভারতবাসী, তাই ভারতীয়দের প্রতি আমার একটু অভিমান আছে। এই আঠার বৎসর ধরে আমি মিশর ভারতবর্ষ করে আসছি। প্রতিবারই দু'চারজন ভারতীয় উৎসাহের সঙ্গে কাইরো আসবে বলে প্রতিজ্ঞা করে—আজ পর্যন্ত কেউ আসে নি। আপনি আসবেন কিনা জানি নে; তবে স্ট্যাটিস্টিক্স যদি পাকাপাকি বিজ্ঞান হয়, না আসার সম্ভাবনাই বেশী। তাই আমার অভিমান, এখন কেউ কাইরো যাবার প্রস্তাব করলে আমি গা করি নে।'

তারপর তিনি হঠাৎ খাড়া হয়ে বসলেন। বেশ একটু গরম সুরে বললেন, 'আশ্চর্য হই বার বার স্বদেশবাসী ছাত্রদের দেখে। বিলেতে ডিগ্রী পাওয়া মাত্রই ছুট দেয় দেশের দিকে, সেই ক্যাশ সার্টিফিকেট ভাঙাবার জন্যে। কতবার কত ছেলেকে বুঝিয়ে বলেছি, মিশরীয় সভ্যতা ভাল করে দেখবার জিনিস, ওর থেকে অনেক কিছু শেখবার মত আছে, এমন কি নেমন্তন্ন করেছি আমার বাড়িতে ওঠবার জন্যে কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কি হবে এদের দিয়ে বুঝতে পারি নে।'

আমি চুপ করে শুনে গেলুম। কি আর বলব? তারপর বললেন, 'আমি নিজে লেখাপড়া করবার সুযোগ-সুবিধে পাই নি। বাবা অল্প বয়সে মারা যান বলে। তাই—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'সে কি কথা? আপনি তো চমৎকার ইংরিজি বলছেন।

মুখহানা মুচকি হেসে বললেন, 'ইংরেজ চাষা আমার চেয়ে ভাল ইংরিজি বলে। তাই বলে সেও শিক্ষিত নাকি? আপনিও এই কথাটা বললেন? আপনি না হের ডক্টর!'

এক মাথা লজ্জা পেলুম।

বললেন, 'তবু আপনার নেমন্তন্ন রইল। ইউরোপ থেকে ফেরবার মুখে আসবেন? তবে আলেকজ্যান্ড্রিয়ায় নেমে আমাকে তার করবেন। আমার টেলিগ্রাফী ঠিকানা "মোহিনী টী", আমার চায়ের ব্যবসা।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'মিশরের লোক কি চা খায়?'

বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন, 'আগে খেত না। এখন তার বাপ খায়। আমি খাইয়ে ছেড়েছি। আপনি কিন্তু ঠিকই জিজ্ঞেস করেছেন—আগে তারা শুধু কফি খেত।'

আমি আরও আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'আপনি খাইয়ে ছেড়েছেন, তার মানে?'

খুব একগাল হেসে নিয়ে বললেন, 'তাহলে আপনার সামনে একটু উঁচু ঘোড়া

চড়ে নিই। আপনাদের তো লেখাপড়ার হাই-জম্প লঙ-জম্প। আমার ব্যবসায়ে। বলব সব ?'

আমি বললুম, 'ভারতের লোক মিশরে চা বেচছে, একথা শুনে কার না আনন্দ হয় ? আপনি ভাল করে সব কিছু বলুন।'

মুথহানা বললেন, 'তবে শুনুন। আমার বাড়ি কুর্গে। বাবা অল্প বয়সে মারা যান, আগেই বলেছি। তাই ১৯১৬ সনে ঢুকে পড়লাম কুর্গ পল্টনে, জানেন তো, কুর্গের লোক আর সব ভারতীয়ের চেয়ে আলাদা। রাইফেলটা, লড়াইটার নাম শুনলে ভয় পায় না। আমাদের পল্টনের সঙ্গে সঙ্গে আমি গেলুম আলেকজ্যান্ড্রিয়া। তারপর তান্তা দামনহুরু জগাজিগ্ করে করে শেষটায় কাইরো। আড়াই বছর ছিলুম কাইরোতে। তারপর লড়াই থামল। মহাত্মা গাঁধী শুরু করেছেন অসহযোগ আন্দোলন। ইংরেজের উপর আমারও মন গিয়েছে বিগড়ে—বিশেষ করে লড়াইয়ের সময় কালো-ধলায় তফাৎ করার বাঁদরামি দেখে দেখে। ভাবলুম, কি হবে দেশে ফিরে গিয়ে ? তার চেয়ে এখানে যদি জগলুল পাশার দলে ভিড়ে যেতে পারি, তবে ভারতবর্ষের আন্দোলনের সঙ্গে এদের স্বাধীনতা আন্দোলন মেলাবার সুবিধে হলে হয়েও যেতে পারে।

'পড়ে রইলুম কাইরোয়। পল্টন থেকে খালাস পাওয়ার সময় যা-কিছু টাকা-কড়ি পেয়েছিলুম, তাই দিয়ে বাঁধলুম ছোট একটি বাসা—অর্থাৎ ফ্ল্যাট। জগলুলের দলের সঙ্গে যোগাযোগও হল, কিন্তু মুশ্কিলে পড়লুম অন্নবস্ত্রের সমস্যা নিয়ে। ওঁরা অবশ্য আমার এ-সব ভাবনা পার্টির কাঁধে তুলে নিতে খুশী হয়েই রাজী হতেন, কিন্তু হাজার হোক ওঁরা বিদেশী ওঁদের টাকা আমি নেব কেন ? তাই ফাঁদতে হল ব্যবসা। খুললুম চায়ের দোকান। পার্টির মেম্বাররাই হলেন প্রথম খদ্দের। ওঁরা আমার ফ্ল্যাটে চা খেয়ে খেয়ে চায়ের তত্ত্ব সমঝে গিয়েছিলেন।

'তখন লাগল আমাতে কফিতে লড়াই। আর সে লড়াই এমনি মারাত্মক হয়ে দাঁড়ালো যে, বাধ্য হয়ে আমাকে পলিটিক্স ছাড়তে হল। নেংটি পরে অসহযোগ করতে পারে গাঁধী, আমি পারি নে। অবশ্য লড়াইয়ের লুট তখন কিছু কিছু আসতে আরম্ভ করেছে—অর্থাৎ দু'পয়সা কামাতে শুরু করেছি। পার্টি-মেম্বারদের চাটা-আঁসটা ফ্রি খাওয়াই, তাইতেই তাঁরা খুশী। টাকা-কড়িও মাঝে-মাঝে—কিন্তু সেকথা যাক।'

আমি দুটো শরবতের অর্ডার দিলুম। মুথহানা আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'আপনি এখনো কামাতে শুরু করেন নি—আমি কারবারী, বিলটা আমিই সই করি।'

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললুম, 'সামান্য দু'পয়সা—।'

হেসে বললেন, 'ইক্সেক্যুস্লি। বেশী হলে দিতুম না।'

আমি শুধালুম, 'আপনার সঙ্গে কফির লড়াইটা কতদিন চলেছিল ?'

'বহু বৎসর। এখনো চলছে। কিন্তু পয়লা রোঁদে মার খেয়েই বুঝতে পারলুম, মাত্র একখানা চায়ের দোকান সমস্ত দেশের কফির সঙ্গে কখনই লড়তে

পারবে না। তাই আরম্ভ করলুম চায়ের পাতা বিক্রি। কিন্তু ব্রুকবণ্ড লিপ্টন বিক্রি করে আমার লাভ হয় কম, আর যে ইংরাজকে দেখলে আমার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে ধুঁয়ো বেরোয়, তার হয়ে মায় প'বারো। কাজেই আনাতে হল চায়ের পাতা আসাম থেকে, দার্জিলিং থেকে, সিংহল থেকে। কিন্তু ব্লেণ্ডিঙের জানি নে কিছুই চায়ের স্বাদও ভাল করে বুঝতে পারি নে—ছেলেবেলা থেকে খেয়েছি কফি, কারণ কুর্গের লোক মিশরীদের মতোই কফি খায়। তখন জিহ্বাটাকে স্বাদকাতর করবার জন্য বাধ্য হয়ে ছাড়তে হল সিগার, খাবারদাবার থেকে বর্জন করতে হল লঙ্কা আর সর্বপ্রকারের গরমমসলা।'

আমি বললুম, 'এর চেয়ে অল্প কৃচ্ছ্রসাধনে তো মিশরের রাজকন্যে পাওয়া যেত।'

'তা যেত। কিন্তু আমি তখনও কফির ড্রাগনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছি। আরেকটা কথা ভুলবেন না। মিশরীয়রা যদি ভারতের কফি খেত, তাহলে আমি ভারতীয় চা'কে ভারতীয় কফির পেছনে লেলিয়ে দিতুম না। ভায়ে ভায়ে লড়াই আমি আদপেই পছন্দ করি নে। যাক্ সেকথা! আমি দেশে থেকে হরেক রকম চা আনিয়ে ব্লেণ্ড করে ব্র্যাণ্ড ছাড়লুম, তারই নাম দিলুম "মোহিনী টী", মোহিনী আমার মায়ের নাম।'

বলে যেন বড় লজ্জা পেলেন। আমি তো বুঝলুম না এতে লজ্জার কী আছে। কফির সঙ্গে একা লড়নেওয়ালা, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ঘড়েল-ব্যবসায়ী মায়া-দরদহীন কারবারের মাঝখানে যে মায়ের কথা স্মরণ রেখেছে, এ যেন মিশরীয় মরুভূমির মাঝখানে সুধাশ্যামলিল মরুদ্যান। কিন্তু আমাকে কোনও কথা বলতে না দিয়েই তিনি যেন লজ্জা ঢাকবার জন্যেই উঠে দাঁড়ালেন। 'আরেক দিন হবে' এরকম ধারা কি যেন খানিকটে বলে আস্তে আস্তে আপন কেবিনের দিকে রওয়ানা হলেন।

আমার তখন খেয়াল হল মোহিনী নামটার দিকে। মুসলমান মেয়ের নাম মোহিনী হল কি করে? আর হবেই না কেন? বাংলা দেশে যদি 'চাঁদের মা' 'সুরুযের মা' হতে পারে, কুর্গের মেয়ের 'মোহিনী' হতে দোষ কী?

* * *

আস্তে আস্তে মুথহানা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারলুম। কিন্তু সব চেয়ে বেশী দুঃখ হল একদিন যখন শুনলুম, কফিকে খানিকটে হার মানিয়ে তিনি যখন মোহিনীকে চালু করতে সক্ষম হয়েছেন, তখন বাজারে এসে জুটল লিপ্টন আর ব্রুকবণ্ড। তারা তাঁর পাকা ধানে মই দিলে না বটে, কিন্তু ধানের বেশ খানি-কটা বড় ভাগ তুলে নিয়ে খেতে লাগল। মুথহানা বললেন, 'আমি হার মানি নি বটে, কিন্তু এদের সঙ্গে লড়বার মত পুঁজি আমার গাঁটে নেই। ভারতবর্ষের দু' একজন চায়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ করে দেখলুম, তাঁরা আমার লড়াইটাকে বুনো মোষ তাড়া করার পর্যায়ে ফেলে দিয়েছেন—নাইলের জলে আপন রেঙ্গ ডোবাতে চান না।

অথচ ব্যক্তিগতভাবে কোনও ইংরেজের সঙ্গে তাঁর কোনও দুশমনি নেই।

জাহাজ ভর্তি ইংরেজের প্রায় সব কটাই দেখি তাঁর সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা কয়। এ-লাইনের সব কটা জাহাজ তিনি ভাল করে চেনেন বলে কি ভারতীয় কি ইংরেজ সকলেরই ছোটখাটো সুখ-সুবিধা অনায়াসে করে দিতে পারেন। ভদ্রলোক যেন প্যাসেঞ্জার আর জাহাজ-কর্তাদের মাঝখানে বেসরকারী লিয়েজোঁ অফিসার।

কিন্তু তাঁর আসল কেরামতি স্বপ্রকাশ হল আদন বন্দরে এসে।

আদন বন্দরে কোনও প্রকারের শুল্ক নেই বলে আদনের আরব ব্যবসায়ীরা দুনিয়ার হরেক রকম জিনিস জাহাজে বেচতে আসে। আর মেমসাহেবরাও এ তত্ত্বটা জানেন বলে হন্যে হয়ে থাকেন দেশের পাঁচজনের জন্য আদন বন্দরে সস্তায় সওগাত কিনবেন বলে।

ডেক-চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপ করে দরকষাকষি দেখছিলুম—আর সব ভারতীয়েরা আদন দেখতে গেছেন, প্রথমবারে আমিও গিয়েছিলুম—এমন সময় হেলেদুলে মুথহানা এসে উপস্থিত। আর যায় কোথায়? সব মেম একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, 'আসুন, মিস্টার মুথহানা। এই আরবদের হাত থেকে আমাদের বাঁচান।'

মুথহানা আশ্চর্য হবার ভান করে বললেন, 'সে কি মেদাম, ইংরেজ হল ব্যবসায়ীর জাত। তাকে ঠকাচ্ছে আরব? আর ব্যবসায়ে কানা আমি ভারতীয় বাঁচাবো সেই ইংরেজকে? ড্রাগনকে বাঁচাবো ডেমসেলের হাত থেকে?'

তারপর ছোটালেন আরবী ভাষার তুবড়ী। সঙ্গে সঙ্গে কখনও ব্যঙ্গের হাসি, কখনও ঠাট্টার অট্টহাস্য, কখনও অপমানিত অভিমানের জলদ গর্জন, কখনও সর্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়ার ভয়ে দুর্বলের তীক্ষ্ণ আর্তরব, কখনও রুদ্রের দক্ষিণ মুখের প্রসন্ন কল্যাণ অভয়বাণী, সর্বশেষে দু'চার পয়সা নিয়ে ছেলে-ছোকরার মত কাড়াকাড়ি। আমি গোটাপাঁচেক স্ন্যাপশট্ নিলুম।

কিন্তু আরবরা বেহদ্দ খুব। হুঁ। লোকটা দরদস্তুর করতে জানে বটে। এর কাছে ঠকেও সুখ। তার উপর মুথহানা কপচাচ্ছেন মিশরের আরবী—অতি খানদানী, তার সর্বশরীরে নীল নদের মত নীল রক্ত, আদনের আরবী তার সামনে সুকুমার রায়ের—

"কানের কাছে নানান্ সুরে
নামতা শোনায় একশো উড়ে।"

দরদস্তুর, কারবার-বেসাতি শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি মুগ্ধ হয়ে বললুম, 'কি চমৎকার আরবী বলতে পারেন আপনি।'

মুথহানা বললেন, 'আবার! মিশরের যে-কোনোও গাড়োয়ান আমার চেয়ে ভাল আরবী বলতে পারে এবং গাড়োয়ানের মতই আমি না পারি আরবী লিখতে, না পারি পড়তে।'

আমি বললুম, 'খানিকটে নিশ্চই পড়তে পারেন। মধ্যবিত্ত ঘরের সব মুসলমানই তো ছেলেবেলায় কুরান পড়তে শেখে।' মুথহানা বললেন, 'তুর্কী টুপি দেখে আপনিও আমাকে মুসলমান ঠাউরে নিয়েছেন, কিন্তু আমি তো

মুসলমান নই।' তারপর একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, 'হিন্দুই বা বলি কি প্রকারে? হিন্দু ধর্মের কি-ই বা জানি, কি-ইবা মানি।'

তারপর বললেন, এবারে যখন মাকে দেখতে গেলুম কুর্গে, তখন গাঁয়ের মুসলমানরা আমার খানিকটা জমি কিনতে চাইল মসজিদ গড়ার জন্য। আমি বললুম, 'এক-রত্তি জমির জন্য আর পয়সা নেব না। মুসলমান দেশের নুন-নিমক খাই, না হয় দিলুম তাদের জাতভাইদের মসজিদ বানাবার জায়গা।' ওদিকে মহীশূর দরবারে কে গিয়ে লাগিয়েছে আমি নাকি 'আজী প্রভোকাতর', কম্যুনাল রায়ট লাগাবার তালে ইংরেজ আমাকে দেশে পাঠিয়েছে। কী মুশ্‌কিল! এল এক ডেপুটি তদন্ত করার জন্যে। আমাকে দেখেই শুধাল, 'আপনি হিন্দু, আপনার মাথায় তুর্কী টুপি কেন?' আমি বললুম, 'আপনি হিন্দু, আপনার পরনে কেরেস্তানি সুট কেন? আপনি যদি বিলেতে না গিয়েও সুট পরতে পারেন তবে মিশরে আঠারো বৎসর থাকার পরও কি আমার তুর্কী টুপি পরার হক্ বর্তালো না?' আশ্চর্য, আপনিই বলুন তো, সিংহের মাথায় "লর্ড" পরালে যদি মানুষ ইংরেজ না হয় তবে আমার মাথায় তুর্কী টুপি চড়ালেই আমি মুসলমান হয়ে যাব কেন? যে দেশে থাকবে, সে দেশের পাঁচজনকে হিন্দীতে যাকে বলে 'আপনাতে' হবে অর্থাৎ আপন করে নিতে হবে। তার জন্য বেশভূষা, আহার-বিহার, সব বিষয়েই মনকে সংস্কারমুক্ত না রাখলে চলবে কেন? কিন্তু আপনাকে এসব বলার কি প্রয়োজন? আপনিও তো অনেক দেশ দেখেছেন।'

এমন সময় আবব কারবারীরা এসে আমাদের কাছে দাঁড়াল। মুখহানা চেয়ার থেকে উঠে তাদের সঙ্গে হাত মেলালেন। কথা কইলেন এমনভাবে যেন জন্ম-জন্মান্তরে পরম আত্মজন! বুঝলুম, কারবারীরা এসেছিল বিশেষ করে তাঁর কাছ থেকেই বিদায় নেবার জন্যে। যাবার সময় বলে গেল, এ জাহাজে তাদের অর্থলাভ হয় নি বটে কিন্তু বন্ধুলাভ হল।

তারপর যে কদিন তিনি জাহাজে ছিলেন, প্রায় সমস্ত সময়টা কাটালেন গাদা গাদা চিঠিপত্র টাইপ করে। কিন্তু লৌকিকতার স্মিতহাস্য, সী সিকদের তত্ত্বতাবাশ, পাঁচজনের সাতটা ফরমাইশ-সুপারিশ করাতে তৎপর। আর তুর্কী টুপির ট্যাসেল দুলিয়ে দুলিয়ে খানা-টেবিল যে বিলক্ষণ তপ্ত-গরম রাখলেন, সে-কথা আমি না বললেও এন্‌কর লাইন জাহাজ কোম্পানী হলপ খেয়ে বলবে।

সুয়েজবন্দরে তিনি নেমে গেলেন—জাহাজ অন্ধকার করে। এর চেয়ে ভাল বর্ণনা আমি চেষ্টা করে খুঁজে পেলুম না। এমন সব পুরনো অলঙ্কার আছে যার সামনে হালফ্যাশান হামেশাই হার মানবে।

ইউরোপে দশ মাস কেটে গেল এটা-সেটা দেখতে দেখতে। তার প্রথম চার মাস কাটল কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক পণ্ডিত অজিত বসুর সঙ্গে। তিনি সস্ত্রীক ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড, জর্মনি, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ঘুরলেন যক্ষ্মা-হাসপাতাল দেখে দেখে—আমি ছিলুম দোভাষী হয়ে। কবি সাদী বলেছেন, 'কয়লাওয়ালার সঙ্গে দোস্তী করলে গায়ে কিছু না কিছু কয়লার গুঁড়ো লাগবেই,

আতরওয়ালার সঙ্গে আশনাই হলে গায়ে কিঞ্চিৎ খুশবাই লাগবেই।' বিয়াল্লিশটা স্যানাটরিয়া ঘুরে আমার গায়ে কয়লা না আতর লাগল সে সমস্যা এখনও সমাধান করতে পারি নি তবে যক্ষ্মার যে বিশেষ কোনও চিকিৎসা নেই সে কথাটা দোভাষী-গিরি করে বেশ ভাল করেই হৃদয়ঙ্গম হল।* ডাক্তারে ডাক্তারে কথা বলার সময় সাধারণত সত্য গোপন করে না।

তারপর একদিন শুভ প্রাতে ভেনিস বন্দরে পেঁছিলুম। শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে লিডোতে সাঁতার কেটে, সিনমার্ক দর্শন করে, চন্দ্রালোকে গণ্ডোলা চড়ে, টুরিস্ট ধর্মের তিন আশ্রম পালন করার পর ভেনিস থেকে সন্ন্যাস নিলুম। তিন দিন পরে আলেকজ্যাণ্ডিয়া বন্দর। সেখান থেকে কাইরোর ট্রেনে চাপবার পূর্বে তার করলুম, 'মোহিনী টী'কে।

এ দশ মাস ইচ্ছে করেই মুখহানাকে কোনও চিঠিপত্র লিখি নি। স্থির করে-ছিলুম ভদ্রলোককে তাক লাগিয়ে দেব। আর পাঁচটা ভারতীয়ের তুলনায় বাঙালী যে প্রতিজ্ঞা পালনে জান-কবুল, সে কথাটা হাতে-নাতে দেখিয়ে দেব—"বাঙালীর বাত নড়ে তো বাপ নড়ে"।

কাইরো স্টেশনে নেমে কিন্তু তাক লাগল আমারই। যে-লোকটি নিজেকে মুখহানা বলে পরিচয় দেয় তার সঙ্গে জাহাজের মুখহানার যে কোনোখানে মিল আছে সে কথা আপন স্মৃতিশক্তিকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস না করে মানবার উপায় নেই। ওঁর গায়ে সুটটি পরা ছিল যেন সার্জেনের হাতে রবারের দস্তানা —এর গায়ে সুট ঝুলছে যেন ভিখিরির ভিক্ষের ঝুলি। ওঁর মুখে ছিল উজ্জ্বল হাসি, ওঁর ছিল পুরুষ্টু টোল-খেকো বাচ্চা ছেলের তুলতুলে গাল, এর দেখি কপালের ঢিপি আর দুই ভাঙা গালের উনুনের ঝিঁক। উঁচু কলারের মাঝখানে এই যে কণ্ঠা প্রথম দেখলুম, সেটাকে তিন ডবল সাইজ করে দিলেও মাঝখানের ফাঁক ভরবে না!

আর সেই চোখ দুটি গেল কোথায়? কেউ হাসে দাঁত দিয়ে, কেউ হাসে ঠোঁট দিয়ে, বেশীর ভাগ লোক মুখ আর গাল দিয়ে—মুখহানা হাসতেন সুদ্ধ দুটি চোখ দিয়ে। আর তার ঝিলিমিলি এতই অদ্ভুত যে, তখনই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে জোয়ার জলের চাঁদের ঝিকিমিকি।

এঁর বয়স তো এখনও আটত্রিশ পেরোয় নি। এ বয়সে তো চোখে ছানি পড়ে না।

ট্যাক্সি ডাকলেন। আমার তো আবছা-আবছা মনে পড়ল, নিজের গাড়ির কথা যেন কোনও কথার ফাঁকে আপন অনিচ্ছায় জাহাজে বলেছিলেন। কি জানি, হয়ত গাড়ি কারখানায় গিয়েছে।

কন্তারা-তুল-দিক্কা স্টেশন থেকে দূরে নয়। ফ্ল্যাট পাঁচতলায়। মুখহানা ড্রয়িংরুমের সোফার উপর নেতিয়ে পড়ে প্রাণপণ হাঁপাতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনার কি হয়েছে বলুন।' বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'কিছু না,

* ১৯৩৩-৩৪ এর কথা: এখন অবস্থা অন্য রকম।

একটু কাশি।' এই মুথহানা সেই মুথহানা। আমি চুপ করে গেলুম।

স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। নাম হেলেনা। সাইপ্রিস দ্বীপের গ্রীক মেয়ে। গ্রীক ছাড়া জানেন অতি অল্প কিচেন-আরবী আর তার চেয়েও কম ইংরিজি। আমি জানি গ্রীক ব্যাকরণের শব্দরূপ ধাতুরূপ—ক্লাস নাইনের ছোকরা যেমন উপক্রমণিকা জানে। অনুমান করলুম, গ্রীক রমণী বিদেশীর মুখে ভুল উচ্চারণে আপনার ভাষার ধাতুরূপ শোনার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হবে না। তাই আরবী ইংরিজির গুরু চণ্ডালী দিয়ে যতটা পারি ভদ্রতা রক্ষা করলুম। মুথহানা গ্রীক বললেন অক্লেশে।

দুবার যে ভুল করেছি সে ভুল আর করলুম না। শুধু জিজ্ঞেস করলুম, 'গ্রীক শিখতে আপনার ক'বৎসর লেগেছিল?' বললেন, এই আঠারো বছর ধরে শিখছি। এখানকার কারবারী মহলে গ্রীক না জেনে ব্যবসা করা কঠিন।' ব্যাস, সুদ্ধ প্রশ্নের উত্তরটুকু। জাহাজে হলে এরই খেই ধরে আরো কত রসালাপ জমত।

খানা-কামরা নেই। ড্রইংরুমে টেবিল সাফ করে খানা সাজানো হল। একটি ন'দশ বছরের ছোকরা, ছুরিটা, কাঁটাটা এগিয়ে দিল। মোট খাটুনিটা গেল হেলেনার উপর দিয়ে। বুঝলাম রেঁধেছেনও তিনিই। চমৎকার পরিপাটী রান্না।

খাওয়ার সময় টেবিলে বসলেন মুথহানার বিধবা শালী তাঁর ছোট মেয়ে নিয়ে। আভাসে ইঙ্গিতে অনুমান করলুম, এঁরা তাঁর পুষ্যি।

ইতিমধ্যে আমার মনে আরেক দুর্ভাবনার উদয় হল। হাত ধুতে যাবার সময় চোখে পড়েছে মাত্র দু'খানা শোবার ঘর। আমি তবে শোবো কোথায়? হোটেলে যাবার প্রস্তাব মুথহানার কাছে পাড়ি-ই বা কি প্রকারে? ভদ্রলোক যে-রকম ঠোঁট সেলাই করে নীরবতার উইয়ের ঢিবির ভিতর শামুকের মত বসে আছেন তাতে আমি সূচ্যগ্রও ঢোকাবার মত ভরসা পেলুম না। তবে কি ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করব, মমিকে যেরকম এদেশে কাঠের কফিনে পুরে রাখে অতিথিকেও তেমনি রাত্রে কাঠের বাক্সে তালাবন্ধ করে রাখার রেওয়াজ আছে কিনা!

আহরাদির পর হেলেনা আমার প্রথম সিগারেটটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে রাত্রের মত বিদায় নিলেন। খনিকক্ষণ পরে রান্নাঘরে বাসনবর্তন ধোয়ার শব্দ শুনতে পেলুম।

মুথহানা সোফায় শুয়ে ছিলেন। আমাকে বললেন, 'পাশে এসে বসুন, কথা আছে।' আমি আরেকটি সিগারেট ধরালুম। বললেন, 'আপনি আমার দেশের লোক, আপনাকে সব কথা বলতে লজ্জা নেই। সংক্ষেপেই বলব, আমার বেশী কথা বলতে কষ্ট হয়।

'জাহাজে আপনার সঙ্গে অনেক কথাই খোলাখুলি বলেছিলুম। তার থেকে হয়ত আপনি আন্দাজ করেছিলেন, আমার দু'পয়সা আছে, বাড়ি-গাড়িটাও আছে, আর এখন দেখছেন আপনাকে শুতে দেবার মত আমাদের একখানা ফালতো কামরা পর্যন্ত নেই। হয়ত আপনি ভাববেন, আমি ধাপ্পা দিয়েছিলুম

আপনি কখনো মিশরে আসবেন না এই ভরসায়।'

আমি বাধা দিতে যাচ্ছিলুম কিন্তু মুথহানা তাঁর হাড্ডিসার হাতখানা তুলে আমাকে ঠেকালেন। বললেন, 'না ভেবে থাকলে ভালই। আপনাদের শরৎ-বাবুর এক উপন্যাসে—আমি মাতৃভাষা কানাড়ায় পড়েছি, যে অবিশ্বাস করে লাভবান হওয়ার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকা ভাল। যাক সে কথা।' বলে বেশ একটু দম নিয়ে কি বলবেন সেটা যেন মনের ভিতর গুছিয়ে নিলেন।

'সংক্ষেপেই বলি। যে গ্রীক রাস্কেলটার হাতে আমি আমার ব্যবসা সঁপে দিয়ে দেশে গিয়েছিলুম, ফিরে দেখি সে সব কিছু ফুঁকে দিয়েছে। বাড়িভাড়া দেয় নি, ওভার ড্রাফ্‌ট নিয়েছে, শেষটায় স্টকের চা পর্যন্ত জলের দরে বিক্রি করে দিয়েছে। এখানে ওখানে কত ছোটোখাটো ধার যে নিয়েছে, তার পুরো হিসাব এখনও আমি পাই নি। আমার নাম জাল করেছে যখনই দরকার হয়েছে। আপনি ভাবছেন আমি এরকম লোকের হাতে সব কিছু সঁপে দিয়ে গেলুম কেন? কী করে জানব বলুন? দশ বৎসর ধরে সে আমার সঙ্গে কাজ করছে, বিয়েরটা সিগারেটটা পর্যন্ত স্পর্শ করত না। আর সব কিছু ফুঁকে দিয়েছে—' একটুখানি হেসে বললেন, 'ফাস্ট উইমেন আর স্লো হর্সের পিছনে।'

নিজে দুর্দৈবের কাহিনী বলার ভিতরেও রসিকতা করতে পারেন যাঁর মনের কোণে—হয়ত নিজের অজানাতেই ধনজনের প্রতি জন্মলব্ধ বৈরাগ্য সঞ্চিত হয়ে আছে। 'বহু দেশ ঘুরেছি' এ কথাটা বলতে আমার সব সময়েই বাধো বাধো ঠেকে, কিন্তু এখানে বাধ্য হয়ে সে কথাটা স্বীকার করতে হল, মুথহানার এই দুর্লভ গুণটির পরিপ্রেক্ষিত দেখবার জন্য।

জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনার স্ত্রীও জানতে পারেন নি?' বললেন, 'তিনি তখন সাইপ্রিসে, বাপের বাড়িতে। কিন্তু আজকের মত থাক এ-সব কথা। আমার সংসারের অবস্থা দেখে আপনি বাকীটা আন্দাজ করে নিতে পারবেন।

'শুয়ে শুয়ে তাই নিয়ে কিন্তু অত্যধিক দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি আবার সব কিছু গড়ে তুলবো। এই আপনার চোখের সামনেই। এখন শুয়ে পড়ুন, আমি ওমরকে ডেকে দিচ্ছি। সে আপনার বিছানা ঐ কোণে দিভানটার উপর করে দেবে। কষ্ট হবে—।' আমি বাধা দিলুম। মুথহানাও চুপ করে গেলেন।

সেই ছোকরা চাকরটি এসে বেশ পাকা হাতে বিছানা করে দিল। বুঝলুম, মুথহানার অতিথিদের জন্য প্রায়ই তাকে এরকম বিছানা করে দিতে হয়।

ঘর থেকে বেরুবার সময় মুথহানা শেষ কথা বললেন, 'আমি কিন্তু সব কিছু আবার গড়ে তুলব। আমি অত সহজে হার মানি নে।' একমাত্র জর্মন বৈজ্ঞানিকদের গলায় আমি এরকম আত্মবিশ্বাসের অকুণ্ঠ ভাষা শুনেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুথহানার গলা থেকে বেরুল একটু খুসখুসে আওয়াজ।

অতি অল্প, কিন্তু আমার ভাল লাগল না।

শুনেছি রাজশয্যায় নাকি যুবরাজেরও প্রথম রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। সত্যি মিথ্যে জানি নে, কিন্তু কাইরোতে যে হবে না সে বিষয়ে আমার মনে দ্বিধা

নেই। আধো ঘুম আধো জাগরণে সেই পাঁচতলার উপর থেকে শুনেছিলুম সমস্ত রাত ধরে ফারাও-প্রজাদের ফুর্তির পিছনে ছুটোছুটি হুটোপুটির শব্দ।

কলকাতা ঘুমোয় এগারোটায়, বোম্বাই বারোটায় আর কাইরো দেখলুম অন্ধকারে ঘুমোতে ভয় পায়। সকাল বেলা আটটার সময় বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখি, কাইরো শহর রাত বারোটার ভাতঘুমে অচেতন। স্থির করলুম, একদিন ভোরের নমাজের সময় মসজিদে গিয়ে দেখতে হবে ইমাম (নমাজ পড়ানেওয়ালা) আর মুয়াজ্জিন (আজান দেনেওয়ালা) ছাড়া কজন লোক মসজিদে সে সময় হাজিরা দেয়। অনুমান করলুম ব্যাপারটা—দত্তের প্রবন্ধ লেখার মত। তিনি লেখার ইমাম আর কম্পজিটর পড়ার মুয়াজ্জিন। কিন্তু যাক এসব কথা—আমি কাইরোর জীবনী লিখতে বসি নি।

সেই অসুস্থ শরীর নিয়ে মুথহানা পরের চিন্তায় মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন সকালবেলা থেকে। দেখি, দুনিয়ার যত বিপদগ্রস্ত লোক আস্তে আস্তে তাঁর ড্রইংরুমে জড়ো হতে আরম্ভ করেছে। বেশীর ভাগ ভারতীয়, প্রায় সকলেরই পাসপোর্ট নিয়ে শিরঃপীড়া। এদের সকলেই দর্জি—এ দেশে আর্মি কনট্রাক্টার-দের সঙ্গে এসেছিল চাকরি নিয়ে। কনট্রাক্টাররা চলে যাওয়ার পর এখানেই ঘর বেঁধেছে—কাইরোর অতি সাধারণ মেয়েও পাঞ্জাবী দর্জির হৃদয়খানা খান্‌খান্‌ করে ফেলতে পারে। কারো কারো হৃদয় ইতিমধ্যে জোড়া লেগে গিয়েছে অর্থাৎ নেশা কেটে গিয়েছে। এখন কেটে পড়তে চায়, কিন্তু পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেছে—মুথহানা যদি ব্রিটিশ কন্‌সুলেটে গিয়ে একটুখানি সুপারিশ করেন। কারো বা মিশরে বসবাস করার মেয়াদ পেরিয়ে গেছে—মুথহানা যদি মিশরে বিদেশী দপ্তরে গিয়ে একটুখানি ধস্তাধস্তি করে আসেন। কেউ বা তার পাসপোর্টখানা কালো-বাজারে ইহুদীকে বিক্রি করে দিয়েছিল (ইহুদী কেমিকাল দিয়ে তার ফটো মুছে ফেলে প্যালেস্টাইনী জাতভাইয়ের জন্য তাই দিয়ে জাল পাসপোর্ট বানিয়ে ধর্ম আর অর্থ দুইই সঞ্চয় করবে), এখন মুথহানা যদি কোনও মালজাহাজের কাপ্তেনকে বলে কয়ে কিংবা 'টু পাইস' দিয়ে তাকে চোরাই মালের মত দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেন।

দু-একজন পয়সাওয়ালা পাঞ্জাবী কনট্রাক্টারও এলেন। মুথহানা যদি রেজিমেন্টের কর্নেলের সঙ্গে দেখা করে একখানা নতুন বুইক ভেট দিয়ে আসেন। না অন্য কোনও রকম লুব্রিকেশনের খবর তিনি বলতে পারেন ?

দুপুর বেলা খাবার সময় মুথহানাকে দু'একখানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেই বুঝতে পারলুম, জাহাজে যে-রকম তিনি প্যাসেঞ্জার ও কর্তাদের মাঝখানের বেসরকারী লিয়েজাঁ অফিসার ছিলেন এখানেও তিনি তেমনি দুঃস্থ ভারতীয় ও মিশরী, ইংরেজ সর্বপ্রকার কর্তাব্যক্তির মধ্যিখানের অনাহারী লিয়েজোঁ অফিসার।

শরীর সুস্থ থাকলে বনের মোষ তাড়ানোটা বিচক্ষণ জনের কাছে নিন্দনীয় হলেও স্বার্থের পক্ষে সেটা ভালো, কিন্তু এই দুর্বল শরীর নিয়ে ভদ্রলোক কেন যে হয়রান হচ্ছেন সে-কথার একটু ইঙ্গিত দিতেই মুথহানা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আ-আমি কি করব ? আমি যে এখানকার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের

সেক্রেটারি।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'মেম্বার কারা?'

'ঐ দর্জির পাল আর দু-চারটে ভ্যাগাবণ্ড।'

'আর কেউ সেক্রেটারি হতে পারে না?'

'সব টিপসইয়ের দল। কনসুলেটে গিয়ে ইংরিজিতে কথা বলবে কে?'

'তাহলে প্রেসিডেণ্ট হচ্ছেন না কেন?'

'প্রেসিডেণ্টের পক্ষে কন্‌সুলেটে ছুটোছুটি করা কি ভাল দেখায়? এসোসিয়েশনের তো একটা প্রেস্টিজ দেখানো চাই।'

'প্রেসিডেণ্ট কে?'

'এক বুড়ো দর্জি। ইংরিজিতে নাম সই করতে পারে।'

আমি আর বাক্যব্যয় করলুম না। এরকম লোককে কোনো প্রকারের সদুপদেশ দেয়া অরণ্যে রোদন—এবং সেই অরণ্যেই যেখানে সে মোষ তাড়াচ্ছে, শুনেও শুনবে না।

মুথহানা আপিসে চলে গেলেন। আমি হেলেনাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'মুথহানার এই কাশিটা কবে হল এবং কি করে?'

হেলেনা বললেন, 'খেটে খেটে। ভারতবর্ষ থেকে ফিরে এসে যখন দেখলেন কারবার একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন গাড়ি বেচে দিয়ে বড় বাড়ি ছেড়ে এখানে এসে উঠলেন। তারপর নূতন করে ব্যবসা গড়ে তোলবার জন্য এই দশ মাস ধরে দিন নেই রাত নেই চব্বিশ ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করছেন। বাড়ি ফেরেন রাত দুটো, তিনটে, চারটে। কথা শোনেন না, ফিরে এসে ঠাণ্ডাজলে স্নান করেন, কখনও কখনও আবার খেতেও রাজী হন না, বলেন ক্ষিদে নেই। আগে তিনি সব সময় আমার কথামত চলতেন, এই নূতন করে কারবার গড়ে তোলার নেশা যবে থেকে তাঁকে পেয়েছে তখন থেকে তিনি আর আমার কোনও কথা শোনেন না। এর চেয়ে তিনি যদি অন্য কোনো স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়েও আমাকে অবহেলা করতেন, আমি এতটা দুঃখ পেতুম না। তবু তো তিনি সুস্থ থাকতেন!'

আমি কথাটার মোড় ফেরাবার জন্য বললুম, 'জ্বর-টর হয়েছিল?' বললেন, 'প্রায় মাস তিনেক আগে তিনি ভেঙে পড়েন। দিন পনেরো শুয়ে ছিলেন, আর সেই পনেরো দিনেই যেন শরীর থেকে সব মাংস-চর্বি খসে পড়ে গেল। আর জানেন, তিনি কখনও ডাক্তার ডাকান নি।'

আমি বললুম, 'এ কথা তো বিশ্বাস করা যায় না।'

হেলেনা উঠে চলে গেলেন। আমি থামালুম না। একা একা যতক্ষণ খুশি কাঁদা যায়।

চায়ের সময় আমি মুথহানাকে বেশ পরিষ্কার, জোর গলায় বললুম, তিনি যদি ভাল ডাক্তার না ডাকান, তবে আমি কাল সকালেই বিছানা-পত্র নিয়ে তাঁর বাড়ি ত্যাগ করব। তিনি যদি অভিমান করতে পারেন, ভারতীয়েরা প্রতিজ্ঞা করেও কাইরো আসে না বলে, তবে আমি অভিমান করতে পারি

যে-ভারতীয় স্বদেশবাসীর সামান্যতম অনুরোধ পালন করে না, তার মুখদর্শন না করলেও আমার চলবে।

ডাক্তার এল। যক্ষ্মা। বেশ এগিয়ে গেছে। এক্সরে না করেই ধরা পড়ল।

তারপর যে এগারো মাস আমি কাইরোতে কাটালুম তার স্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না। ওমর খৈয়াম বলেছেন :—

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়
শেষ নবান্ন হবে যে ধান্যে, তারো বীজ আছে তায়।
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই
বিচারকর্তা প্রলয় রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই ॥

—সত্যেন দত্ত।

আর আইনস্টাইনও নাকি বলেছেন, পৃথিবীর সব কিছু চলে এক অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে। ওমর খৈয়াম ছিলেন আসলে জ্যোতির্বিদ—কাজের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি রুবাঈয়াৎ লিখেছেন মাত্র—এবং আইনস্টাইনের চোখও উপরের দিকে তাকিয়ে। এই দুই পণ্ডিত গ্রহনক্ষত্রের নিয়ম-মানা দেখে যা বলেছেন, আমি মুথহানার জীবনে তাই দেখতে পেলুম।

কত অনুনয়বিনয়, কত সাধ্যসাধনা, কত চোখের জল ফেললেন হেলেনা—আমার কথা বাদ দিচ্ছি—না, না, না, তিনি তাঁর কারবার ফের গড়ে তুলবেনই। ডাক্তার পই পই করে বলে গিয়েছেন, কড়া নজর রাখতে হবে তিনি যেন নড়াচড়া না করেন—কিন্তু থাক্, ডাক্তরের বিধানের কথা তুলে আর কি হবে, মধ্যবিত্ত কোন বাঙালী পাঠক সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষভাবে যক্ষ্মার সঙ্গে পরিচিত নয়—সব কিছু উপেক্ষা করে তিনি বেরুতেন রোজ সকালে চায়ের কারবারে। তাও না হয় বুঝতুম তিনি যদি শুধু অফিসে ডেক-চেয়ারে শুয়ে থাকতেন। কতদিন মর্নিং-কলেজ থেকে ফেরার মুখে দেখেছি মুথহানা চলেছেন ক্লান্ত, শ্লথ গতিতে, দ্বিপ্রহর রৌদ্র উপেক্ষা করে, বড়-বড় খদ্দেরের আফিসে আরও কিছু চা গছাবার জন্য। বাড়ি ফিরতেন রাত আটটা, ন'টা, দশটায়।

খৈয়াম আইনস্টাইন ঠিকই বলেছেন সব কিছু চলেছে এক অদৃশ্য অলঙ্ঘ্য নিয়মের বেত্রাঘাতে। মুথহানা-পতঙ্গ ধেয়ে চলেছে কারবারের আগুনে আপন পাখা পোড়াবে বলে।

খুক্ খুক্ তখন অদম্য হয়ে উঠেছে। শালী টের পেয়ে মেয়েকে নিয়ে পালালেন। সুভাষিতে আছে, 'পরান্নং দুর্লভং লোকে' কিন্তু সে পরান্ন যদি যক্ষ্মার বীজাণুতে ঠাসা থাকে, তবে তা সর্বথা বর্জনীয়।

হেলেনা কিন্তু হাসিমুখে বোনকে গাড়িতে তুলে দিলেন।

আশ্চর্য এই মেয়ে হেলেনা! মুথহানাকে যা সেবা করলেন, তার কাছে মনে হয়, বাঙালী মেয়ের সেবাও হার মানে। অন্য কোনও দেশে আমি এ জিনিস দেখি নি, হয়ত এরকম দুর্যোগ চোখের সামনে ঘটে নি বলে।

ঘুম থেকে উঠে কতবার তিনি মুখহানার শরীর মুছে দিতেন, সে শুধু তাঁরাই বলতে পারবেন যাঁরা যক্ষ্মা রোগীর সেবা করেছেন। ডাক্তার নিশ্চয়ই বারণ করেছিলেন, তবু হেলেনা মুখহানার সঙ্গে এক খাটেই শুতেন। আমি তাই নিয়ে যখন হেলেনাকে একদিন অত্যন্ত কাতর অনুনয়বিনয় করলুম, তখন তিনি বললেন, 'আমি কাছে শুয়ে তাঁর বুকের উপর হাত রাখলে তিনি কাশেন কম, ঘুম হয় ভাল।' আমি বললুম, 'এ আপনার কল্পনা।' হেসে বললেন, 'ঐ কল্পনাটুকুই তো তিনি বিয়ে করেছেন। আমি তো আর আসল হেলেনা নই।' আমি চুপ করে গেলুম।

কত-না হাঁটাহাঁটি খোঁজাখুঁজি করে তিনি নিয়ে আসতেন বাজার থেকে সব চেয়ে সেরা জাফার কমলালেবু, কী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তৈরি করতেন টমাটোর রস, রান্না করতেন স্বামীর কাছ থেকে শেখা ভারতীয় কায়দায় মাংসের ঝোল, কোপ্তা-পোলাও, মাদ্রাজী রসম্, স্নান করিয়ে দিতেন স্বামীকে আপন হাতে, মুখহানা বেশী কাশলে জেগে কাটাতেন সমস্ত রাত। তিনি নিজে রোগা, কিন্তু ধন্বন্তরী যেন তখন তাঁকে বর দিয়েছেন যমের সঙ্গে লড়বার জন্য।

কাইরোতে বৃষ্টি হয় বছরে দেড় না আড়াই ইঞ্চি, আমার মনে নেই। দিনের পর দিন মেঘমুক্ত নীলাকাশ দেখে দেখে বাঙালীর মন যেন হাঁপিয়ে ওঠে। যখনই উপরের দিকে তাকাই, দেখি নীল আকাশ প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। প্রথমবার যখন ইয়োরোপের পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম, তখন মাঝে মাঝে নীলচোখো মেমসাহেবরা আমার দিকে তাকিয়ে থাকত—এই অদ্ভুত জংলী লোকটার বিদ্‌ঘুটে চেহারা দেখে, আর অস্বস্তিতে আমার সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠত। কাইরোর সেই নীলাকাশ সেই নির্লজ্জাদের নীল চোখের মত হরবকত আমার দিকে তাকিয়ে আছে, একবার পলক পর্যন্ত ফেলে না; মেঘ জমে না, দরদের অশ্রুবর্ষণ বিদেশী বিরহীর জন্য একবারের তরেও ঝরল না।

পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ থেকে কত রকমের হাওয়া কাইরোর উপর দিয়ে বয়ে গেল, কত না মুখের বোরকা সরিয়ে ক্ষণেকের তরে নিশিকৃষ্ণ চোখের বিদ্যুৎ ঝলক দেখিয়ে দিলে, কিন্তু তাদের কেউই এক রত্তি মেঘ সঙ্গে নিয়ে এলো না। সাহারা থেকে, লাল দরিয়া পেরিয়ে, হাবশী মুল্লুকের পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে মধ্য-সাগরের মধ্যিখান থেকে চার রকমের হাওয়া বইল, যেন হলদে, লাল, কালো, নীল রঙ মেখে কিন্তু মেঘ আর জমে ওঠে না।

ভুল বললুম, মেঘ জমে উঠতে লাগল হেলেনার মুখের উপর। পূব-সাগরের পার হতে একদা যে নীল মেঘ সাইপ্রিস রমণীর চিত্তাকাশ প্রেমের বেদনায় ভরে দিয়েছিল, আজ সে মেঘ তার সমস্ত মুখও ছেয়ে ফেলল। দু'চোখের চতুর্দিকে যে কালো ছায়া জমে উঠল, সে যেন চক্রবাল-বিস্তৃত বর্ষণ-বিমুখ খরা মেঘ; আমি মেঘের দেশের লোক, আমার বাড়ি চেরাপুঞ্জির গা ঘেঁষে, ছেলেবেলা থেকে মেঘের সঙ্গে মিতালি—কিন্তু হে পর্জন্য! এ রকম মেঘ যেন আমাকে আর না দেখতে হয়।

কানাড়া ভাষায় উত্তম বিরহের কবিতা আছে, এ কথা কখনো শুনি নি। কুর্গের লোক খুব সম্ভব মেঘের দিকে নজর দেয় না। মুথহানা হেলেনার মুখের উপর জমে-ওঠা মেঘ দেখতে পেলেন না।

দ্রোণ জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস অর্জুন, তুমি লক্ষ্যবস্তু ভিন্ন অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছ কি? তোমার ভ্রাতৃগণ, তোমার আচার্য, তোমার পিতামহ?'

অর্জুন বললেন, 'না গুরুদেব, আমি শুধু লক্ষ্যবস্তু দেখতে পাচ্ছি।'

মুথহানার নজর কারবারের দিকে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার মনে ধোঁকা লাগল, মুথহানা লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন কি না। বিশেষ করে যেদিন শুনলুম, তাঁর রেস্ত নেই বলে তিনি ব্যাঙ্কের মুচ্ছুদ্দিগিরিতে মাল ছড়াচ্ছেন। সে মাল মজুদ থাকে ব্যাঙ্কেই—মুথহানা কিছুটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিক্রি করে দাম শোধ করলে আরো খানিকটা পান। ওদিকে ব্রুকবণ্ড লিপ্টন অঢেল মাল ঢেলে দিয়ে যায় দোকানে দোকানে বিনি পয়সায়, বিনি আগামে। ব্যাঙ্কের গুদোমে রাখা মাল লড়বে দোকানে দোকানে সাজানো মালের সঙ্গে!

ব্যাঙ্কের টাকার সুদ তো দিতেই হয় বুকের রক্ত ঢেলে, তার উপর গুদোম-ভাড়া। মিশরী ব্যাঙ্কের নির্দয়তার সামনে সাহারা হার মানে।

কাজেই মুথহানার মাথার ঘাম যদি ব্যবসা গড়ে তোলাকে এগিয়ে দেয় এক কদম, যক্ষ্মাকে এগিয়ে দেয় এক ক্রোশ।

ত-তত্ত্বটা মুথহানা বুঝতে পারেন নি। তিনি ব্যবসা নিয়ে মশগুল। আমি তো ব্যবসা জানি নে। কিন্তু সিগারেট যে খায় না, গন্ধ পায় সে-ই বেশী।

মুথহানার সব চেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াল ঐ পাঁচতলা বাড়ির বিরাশিখানা সিঁড়ি। সুস্থ মানুষ আমাদের ফ্ল্যাট চড়তে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যায়, ড্রইংরুম পৌঁছে প্রথম দশ মিনিট সোফার উপর নেতিয়ে পড়ে ম্যালেরিয়া রোগীর মত ধোঁকে, অথচ মুথহানাকে ভাঙতে হচ্ছে প্রতিদিন অন্তত দুবার করে এই গৌরী-শঙ্কর। একতলা বাড়ির জন্য মুথহানা যে চেষ্টা করেন নি তা নয়, কিন্তু কাই-রোতে নতুন বাড়ির সন্ধান নতুন কারবার গড়ে তোলার চেয়েও শক্ত। সেলামীর টাকা যা চায়, তা দিয়ে কলকাতায় নতুন বাড়ি তোলা যায়।

ছোকরা চাকর ওমরকে নাকি মুথহানা কোনও এক ড্রেন থেকে তুলে এনে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, তার বয়স যখন চার। মুথহানার তখন পয়সা ছিল, ওমরের তখন সেবা করেছে এক ফ্যাশনেবল আয়া আর স্বয়ং হেলেনা। আজ দশ বৎসরের ওমর নিজের থেকে ছোকরা চাকরের জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির ছেলের মত অনায়াসে সব কাজ করে, আমার ভুল আরবী ভুল আরবী শুনে মিট-মিটিয়ে হাসে আর হেলেনার গ্রীক পড়ানো থেকে পালাবার জন্য অন্ধি-সন্ধির সন্ধানে থাকে।

এইটুকু ছেলে, কিন্তু মুথহানার প্রতি তার ভক্তি-ভালবাসার অন্ত ছিল না। রান্নাঘরে কাজ করছে কিন্তু গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ দীর্ণ করে তার কান যেন গিয়ে সেঁটে আছে ফুটপাথের সঙ্গে (আমরা কেউ কিছু শুনতে পাই নি—হঠাৎ কাজ-

কর্ম ফেলে ছুটলো বেতের হালকা চেয়ার নিয়ে নিচের তলার দিকে। কি করে যে সামান্যতম খক্‌খুক্‌ শুনতে পেত, তা সে-ই জানে। প্রতি তলায় সে চেয়ার পাতবে, মুথহানা বসে জিরোবেন। এই করে করে সে মুথহানাকে পাঁচতলায় নিয়ে আসত। কেউ বাতলে দেয় নি, আবিষ্কারটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব।

মুথহানাকে কখনো দেখি নি ওমরের সঙ্গে আদর করে কথা কইতে। অল্প কথা বলতেন, না অন্য কোনও কারণে জানি নে, কিন্তু এটা জানি তাঁর চলা-ফেরাতে আচারব্যবহারের কি যেন এক গোপন যাদু লুকোনো ছিল, যার দিকে আকৃষ্ট না হয়ে থাকা যেত না—বাচ্চা ওমরও বাদ পড়ে নি।

পয়লা ট্রায়েলেই খুশ হয়ে ওমর ঈদের জোব্বা আঁকড়ে ধরেছিল। মুথহানা কিন্তু তিন-তিন বার এদিকে কাটালেন, ওদিকে ছাঁটালেন। ঈদের দিন ওমর যখন নূতন জোব্বা পরে আমাদের সবাইকে সেলাম করল, তখন মুথহানা বউয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওমর তো আমাদের ডাগর হয়ে উঠেছে, কনের সন্ধানে লেগে যাও।'

মিশরেও আমাদের দেশের মত অল্প বয়সে বিয়ে হয়। ওমর তিন লম্ফে ঘর ছেড়ে পালালো। মিশরের বাচ্চারাও বিয়ের কথা শুনলে লজ্জা পায়।

এ-রকম মানুষকে পরোপকার করার প্রবৃত্তি থেকে ঠেকানো আজরাঈলেরও (যমেরও) অসাধ্য। আমি গিয়েছিলুম ব্রিটিশ কন্‌সুলেটে পাসপোর্ট রেজিস্ট্রি করাতে। গিয়ে দেখি, মুথহানা কন্‌সুলেটের এক কেরানীকে আদি, রৌদ্র, বীর, হাস্য সর্বপ্রকারের রস দিয়ে ভিজিয়ে ফেলে কোন্‌ এক ভবঘুরের জন্য একখানা পাসপোর্ট যোগাড় করতে লেগে গেছেন। সাহেব যতই বুঝিয়ে বলে, 'ভারতীয় জন্মপত্রিকা না দেখানো পর্যন্ত আমরা কি করে জানব লোকটা ভারতীয়, আর ভারতীয় সপ্রমাণ না হলে আমরা পাসপোর্ট দেব কি করে?' মুথহানা ততই ইমান-ইনসাফ্‌ দয়াধর্মের শোলোক কপচান, কখনো সাহেবের হাত দু'খানা চেপে ধরেন, কখনো রেডক্রসে পয়সা দেবেন বলে লোভ দেখান, কখনও 'দি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন লিমিটেড, কাইরো'র প্রতিভূ হিসাবে সদম্ভে সগর্বে দু'হাতে বুক চাপড়ান!

রুমাল দিয়ে চোখের কোণ মোছেন নি—নবরসের ঐটুকুই বাদ পড়েছিল। সাহেব না হয়ে কেরানী মেম হলে সেটাও বোধ হয় বাদ পড়ত না।

সাহেব যখন শেষটায় রাজী হল, তখন দেখা গেল, লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরেটার কাছে পাসপোর্টের দাম পাঁচটি টাকা পর্যন্ত নেই। এক লহমার তরে মুথহানা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। সামলে নিয়ে অতি সপ্রতিভভাবে জেব থেকে টাকাটা বের করে দিলেন।

এ টাকা তিনি কখনও ফেরত পান নি। আমি যখন বললুম, 'টাকাটা এসোসিয়েশনের খর্চায় ফেলুন,' তখন তিনি হঠাৎ তেড়ে খেঁকখেঁকিয়ে বললেন, 'লোকটা হজে যেতে চায়। সুদিন থাকলে আমি কি শুধু পাসপোর্ট—'

আমি তাড়াতাড়ি মাপ চাইলুম। মুথহানা চুপ করে গেলেন। উঠে যাবার সময় আমার সামনে এসে মাথা নিচু করে বললেন, 'আমার মেজাজটা একটু

তিরিক্ষি হয়ে গেছে। আপনি আমায় মাফ করবেন।' আমি তাঁর হাত দুখানি ধরে বললুম, 'আপনি আমার বড় ভাইয়ের মত।'

আমি কাইরো আসার পরও মুখহানা আট মাস কারবার গড়ে তোলবার জন্য লড়াই করেছিলেন। তারপর একদিন হার মানলেন। কারবারের কাছে নয়, যক্ষ্মার কাছে।

গ্রীসের রাজকুমারীর সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজকুমারের বিয়ে। কাইরোবাসী হাজার হাজার গ্রীক আনন্দে আত্মহারা। সবাই যেন জাতে উঠে যাচ্ছে, চাঁড়াল যেন দৈবযোগে পৈতে পেয়ে যাচ্ছে। এবার থেকে গ্রীকদের সমঝে চলতে হবে। রাজপুত্তুরের শালার জাত, বাবা চালাকি নয়! আমাদের পাড়ার গ্রীক মুদিটা পর্যন্ত পিরামিডের মত মাথা খাড়া করে মোরগটার মত দোকানের সামনের ফুটপাথে গটর-গটর করে টহল দেয়, আমাকে আর সেলাম করে না। কি আর করি, রাজপুত্তুরের শালা, বাবা, চাট্টিখানি কথা নয়, আমি সেলাম করে জিজ্ঞেস করি, 'বর-কনে কিরকম আছেন?' মিশররাণী গ্রীক-রমণী ক্লিওপাত্রার দম্ভ মুখে মেখে আমার দিকে সে পরম তাচ্ছিল্যভরে তাকিয়ে বলে, 'কনগ্রেচুলেট করে তার করেছি, জবাব এলেই খবর পাবে!'

আমি তো ভয়ে মর-মর। সিন্ধী ভাষায় প্রবাদ আছে—সিংহটাও নাকি শালাকে ডরায়।

সেই বিয়ের পরবের ফিল্ম এলো কাইরোয়। গ্রীক-মেয়ের গর্ভের বাচ্চা পর্যন্ত ছুটলো সে ছবি দেখতে। আমাদের ওমর আধা-ভারতীয়, আধা-গ্রীক (যদিও রক্তে খাশ মিশরী)। সে ধরে বসলো ছবি দেখতে যেতেই হবে। আমিও সায় দিলুম। ভাবলুম মুখহানার মনটা যদি চাঙ্গা হয়। হেলেনা বায়োস্কোপ যেতে ভালবাসতেন। কিন্তু স্বামীর অসুখ হওয়ার পর থেকে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

গিয়ে দেখি 'কিউ' লম্বা হতে হতে প্যাঁচ খেয়ে 'ইউ' হয়ে তখন 'ডবল ইউ' হওয়ার উপক্রম। আমরা সবাই একটা কাফেতে গিয়ে বসলুম। ওমর কালা-বাজার থেকে টিকিট আনল।

ভিতরে গোলমাল, চেঁচামেচি, চিৎকার। বাঙালী যজ্ঞিবাড়িকে চিৎকারে গ্রীকরা হার মানায়। মুখহানা যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, আমরা লক্ষ্য করি নি। সিনেমা থেকে ফিরেই গলা দিয়ে অনেকখানি রক্ত উঠল। আমরা বিচলিত হয়ে পড়েছি দেখে হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গ্রীকগুলো হন্যে হয়ে উঠেছে। ওদের দেখলে ভাবখানা কি মনে হয় জানেন?'

আমি বললুম, 'না।'

বললেন, 'মনে হয় না, যেন বলতে চায় "হেই, ঐ ড্যাম দুনিয়াটার দাম কত বল্ তো, আমি ওটা কিনব"?'

হাসলেন না কাশলেন ঠিক বুঝতে পারলুম না। অসুখ, খিটখিটেমি আর খাপছাড়া রসিকতা—এ তিনের উদ্ভট সংমিশ্রণের সামনে আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম।

অনেক রাত অবধি ঘুম এলো না। মনটা বিকল হয়ে গিয়েছে। যক্ষ্মাতে মরে বহু লোক, তার উপর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এ মানুষটা রক্ত-সূত্র দিয়ে দিনের পর দিন মরণ-বঁধুর ডান হাতে রাখী বেঁধেই চলেছে। যে ব্যবসা-মন্ত্র এতদিন তাঁকে অন্ন-বস্ত্র ভোগ-বিলাস দিচ্ছিল, আজ যেন সে-ই হঠাৎ এক ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মত তাঁর হাতছাড়া হয়ে তাঁরই কণ্ঠরুদ্ধ করে সবলে দুই বাহু দিয়ে নিষ্পেষিত করে বিন্দু-বিন্দু রক্ত নিঙড়ে নিচ্ছে।

হঠাৎ শুনি হেলেনার কান্না। দরজা খুলে বেরুতেই দেখি, মুথহানার শোবার ঘরের দরজা খোলা আর মুথহানা ঠাস-ঠাস করে হেলেনার গালে চড় মারছেন। আমি ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরতেই তিনি যেন চৈতন্য ফিরে পেয়েছেন এরকম ভাবে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে খাটে শুইয়ে দিয়ে আপন ঘরে ফিরে এলুম।

ভোরের দিকে ঘুম ভাঙল। দেখি ঘরে আলো জ্বলছে আর হেলেনা আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে। আমি আশ্চর্য হলুম না, বললুম, 'বসুন।'

আমি স্থির করেছিলুম, সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাঁকে বুঝিয়ে বলব, তিনি যেন মুথহানাকে মাপ করেন। অসুখে ভুগে ভুগে মানুষ কি-রকম আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে, সে কথা বুঝিয়ে বলব। অন্তত এটা তো বলতেই হবে—তা সে সত্যই হোক আর মিথ্যেই হোক—সেবার পরিবর্তে ভারতবাসী আঘাত দেয় না।

কিন্তু আমাকে কিছুই বলতে হল না। হেলেনা চোখের জল দিয়ে আমাকেই অনুনয়-বিনয় করলেন আমি যেন মুথহানাকে ভুল না বুঝি। এ মুথহানা সে মুথহানা নয় যিনি তিন বৎসর ধরে তাঁকে সাধ্যসাধনা করেছিলেন তাঁর প্রেম গ্রহণ করতে। বাড়ি-গাড়ি টাকা-পয়সা, তাঁর সর্বস্ব তিনি হেলেনাকে দিয়ে তিন বৎসর ধরে বার বার তাঁকে বলেছিলেন তিনি তাঁকে গ্রহণ না করলে তিনি দেশত্যাগী হবেন।

হেলেনা বললেন, 'আপনি ভাবছেন, দেশত্যাগী হবেন শুধু কথার কথা। তা নয়। আমার মামা তো ব্যবসায়ের ভিতর দিয়ে মুথহানাকে চিনতেন দশ বৎসর ধরে। তিনিই বলেছেন, 'এই কাইরোর মত শহরে মুথহানা কোনও মেয়ের দিকে একবারের তরে ফিরেও তাকান নি। সাত বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে, টাকা-পয়সা যখন তাঁর ছিল তখন কত ফরাসী কত হাঙ্গেরিয়ান মেয়ে তাঁর পিছু নিয়েছে, কিন্তু এই সাত বছরের ভিতর একদিন একবারের তরেও আমার মনে এতটুকু সন্দেহ হয় নি যে তিনি আমায় ফাঁকি দিতে পারেন। মুথহানা তো ফাঁকির মানুষ নন।'

আমি চুপ করে শুনতে লাগলুম। বললেন, 'আজ না হয় তিনি দুরবস্থায় পড়েছেন বলে আমাকে তাঁর ব্যাঙ্কের হিসেব দেখান না, কিন্তু এমন দিনও তো ছিল যখন তিনি ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে বলতেন—"সব টাকা উড়িয়ে দাও হেলেনা, আমি তাহলে বেশী কামাবার উৎসাহ পাব।" আমার গায়ে হাত তুলেছেন? তুলুন, তুলুন। ঐ করে যদি তাঁর রোগ বেরিয়ে যায় তবে তিনি জুড়োবেন, তাঁর শরীর সেরে যাবে।'

তারপর বললেন, 'বলুন, আপনি মুথহানাকে ভুল বোঝেন নি ?'

আমি বললুম, 'না। আমি আরেকটি কথা বলতে চাই। আপনি মুথহানাকে যে সেবা করেছেন, তার চেয়ে বেশী সেবা আমার মাও আমার বাবাকে করতে পারতেন না।'

এর বাড়া তো আমি আর কিছু জানি নে। হেলেনার মুখে গভীর প্রশান্তি দেখা গেল। বললেন, 'আপনি আমায় বাঁচালেন। সব সময় ভয় মুথহানা হয়ত ভাবেন, বিদেশী মেয়ে বিয়ে করে তিনি হয়ত মনের মত সেবা পেলেন না। আমার বুকের কতটা ভার নেবে গেল আপনি বুঝতে পারবেন না।'

কথাটা ঠিক। আমি অতটা ভেবে বলিও নি। পরদিন ছুটি ছিল। মুথহানা এসে কোনও ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'কথা আছে।'

তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'স্থির করেছি, কারবার গুটিয়ে ফেলব।'

আমি আশ্চর্য হলুম, খুশীও হলুম, বললুম, 'সেই ভাল।' বললেন, 'আমি হার মানি নি ; গুটোতে হচ্ছে অন্য কারণে। আমার দম নিতে বড্ড কষ্ট হয়। আর এই কাইরোতে আমার শরীর সারবে না। কুর্গে এক মাস থাকলেই আমার শরীর সেরে যাবে।' তারপর খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'আপনি তো কখনও কুর্গে যান নি, তা না হলে আমার কথাটার মর্ম বুঝতে পারতেন। এই সাহারার হাওয়া আমি একদম সইতে পারি নে। আমার বুক যেন ঝাঁঝরা করে দেয়।'

কিছু বললুম না। কারণ জানতুম, জেনে-শুনে মিথ্যে কথা বলছেন না। সহারায় এই বালু-ছাঁকা শুকনো বাতাস দিয়ে ফুসফুস পরিষ্কার করার জন্য অগুণতি ইয়োরোপীয় যক্ষ্মা রোগী প্রতি বৎসর মিশরে আসে।

উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'জানেন হের ডক্টর, ট্যামারিণ্ড ট্রি কাকে বলে ?'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ।'

'আমার বাড়ির সামনে এক বিরাট তেঁতুল গাছ আছে। তারই ছাওয়ায় যদি আমি তিনটি দিন ডেক-চেয়ারে শুতে পারি তাহলে সব কাশি সব ব্রঙ্কাইটিস ঝেড়ে ফেলতে পারব। যক্ষ্মা না কচু! হোয়াট রট্!

আপন মনে মুচকি মুচকি হাসলেন। বললেন, 'আমি কী বোকা! এতদিন এ কথাটা ভাবি নি কেন বুঝতে পারি নে। আর কাঁজির কথা কেন মাথায় খেলে নি তাও বুঝতে পারিনে। খাবো মায়ের হাতে বানানো কাঁজি, শুয়ে থাকব তেঁতুল-তলায়, দম নেব তেঁতুল-পাতা-ছাঁকা হাওয়া! ব্যস্! তিন দিনে সব ব্যামো বাপ্ বাপ্ করে পালাবে। যক্ষ্মা! হোয়াট ননসেন্স!'

তারপর হঠাৎ কি যেন মনে পড়ল। বললেন, 'হেলেনা যে খারাপ রাঁধে তা নয়। কিন্তু কাঁজি বানানো তো সোজা কর্ম নয়! আর এ মিশরী চালে কাঁজি হবেই বা কী রে ?'

উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কারবার গুটোনোও তো কঠিন কাজ।' তারপর খুব সম্ভব ঐ কথাই ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু রাম উল্টো বুঝলেন। মুথহানা খাটতে লাগলেন টপ গিয়ারে। আমি

জেলে নই তা বলতে। পারব না, জাল ফেলাতে মেহনত বেশী না গুটোতে। তবে এ কথা জানি, নদী-পুকুরে আবর্জনা থাকে বলে জাল আকসারই হেথা হোথা জড়িয়ে যায় আর ছাড়াতে গিয়ে চোখের জলে নাকের জলে হতে হয়। মুথহানারও হল তাই।

এখন শুধু আর ওমরের চেয়ারে চলে না। দারোয়ান ধরে ধরে উপরের তলায় উঠিয়ে দিয়ে যায়। আর কথা বলা বেড়ে গিয়েছে।

'বুঝলেন হের ডক্টর, আমার মা অজ পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। নামটা পর্যন্ত সই করতে জানে না। আপনার মা জানেন?'

ভাঁড়াবার প্রলোভন হয়েছিল কিন্তু মিথ্যেবাদীর স্মরণশক্তি ভাল হওয়া চাই।

একটু যেন নিরাশ হয়ে বললেন, 'তাহলে আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না কিন্তু আমাদের অঞ্চলের সবাই জানে, হেন ব্যামো নেই মা যার দাওয়াই জানে না। আসলে কিন্তু দাওয়াই নয়, ডক্টর। মা সারায় পথ্যি দিয়ে। কচু, ঘেঁচু, দুনিয়ার যত সব বিদঘুটে আবোল-তাবোল দিয়ে মা যা রাঁধে, তা একবার খেলেই আপনি বঝতে পারবেন ওর হাতে যাদু আছে। কিন্তু ওসব কিছুরই দরকার হবে না আমার। ঐযে বললুম কাঁজি আর তেঁতুলের ছায়া! তারপর ফিরে এসে দেখিয়ে দেব ব্যবসা গড়া কারে কয়!'

একদিন লক্ষ্য করলুম, আগে বরঞ্চ মুথহানা মাঝে মাঝে গাড়িতে করে বাড়ি ফিরতেন, এখন প্রতি দিন হেঁটে। তাই নিয়ে একটুখানি মতামত প্রকাশ করলে পর মুথহানা বললেন, 'আপনাকে সব কথা খোলসা করে বলি নি, শুনুন। আমি চাই হেলেনাকে যতদূর সম্ভব বেশী টাকা দিয়ে যেতে। ওর তো কেউ নেই যে ওকে খাওয়াবে। আমি অবশ্যি শিগ্‌গিরই ফিরে আসব। কিন্তু ও বেচারী এ ক'মাস বড্ড খেটেছে, এখন একটুখানি আরাম না করলে ভেঙে পড়বে যে।'

আমি বললুম, 'ওঁকে বলেছেন যে আপনি একা দেশে যাচ্ছেন?'

মুথহানা ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'হুঁ, বড্ড কাঁদছে।'

আমি বললুম, 'দেখুন মিস্টার মুথহানা, আর যা করুন—করুন, কিন্তু দুটি টাকা বেশী রেখে যাবার জন্য ব্যামোটা বাড়াবেন না।'

বুনো শুয়োরের মত মুথহানা ঘোঁৎ করে উঠলেন। বললেন, 'যান, যান, বেশী উপদেশ কপচাতে হবে না। বিয়ে তো করেন নি যে বুঝতে পারবেন হেলানা আমার কে?'

তারপর গট গট করে রান্নাঘরে গিয়ে লাগালেন ওমরকে দুই ধমক। সে অবশ্যি এসব ধমককে থোড়াই কেয়ার করে।

ফিরে এসে বললেন, 'সৈয়দ সাহেব?'

'জী?'

'রাগ করলেন?'

'পাগলা না কি।'

বললেন, 'আমার মা'র কথা বলছিলুম না আপনাকে? অদ্ভুত মেয়ে।

বাবা যখন মারা গেলেন তখন আমার বয়স এক। বিশেষ কিছু রেখে যেতেও পারেন নি। কি দিয়ে যে আমায় মানুষ করলো, এখনও তার সন্ধান পাই নি। এই যে আমি কারবারে হার মানি নে, কন্‌সুলেটে ঘাবড়াই নে, ইংরেজ গুপ্তচরকে ডরাই নে—সে-সব ঐ মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছি। আপনি বললেন, লেখাপড়া শেখে নি—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমি কক্‌খনো বলি নি।'

চোখ দুটি অগাধ স্নেহে ভরে নিয়ে বললেন, 'যদি কোনদিন কুর্গ আসেন তবে নিজেই দেখতে পাবেন।' তারপর হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বললেন, আমি না থাকলেও আসতে পারেন—নিশ্চয়ই আসবেন। শুধু বলবেন, 'আমি মুথহানাকে চিনি,' ব্যস্‌ আর দেখতে হবে না। বুড়ী আপনাকে নিয়ে যা মাতামাতি লাগাবে। কিন্তু কথা কইবেন কি করে? মা তো কানাড়া ছাড়া আর কিছু জানে না।'

* * *

পূর্ণ তিনটি মাস আমি মুথহানার কাছ থেকে তাঁর মায়ের গল্প শুনেছি। একই গল্প পাঁচ সাত বার করে। আমার বিরক্তি ধরে নি। কিন্তু এ কথাও মানি আর কেউ বললে আমি এ কথা বিশ্বাস করতুম না। এক মাস যেতে না যেতেই আমার মনে হল, ফটোগ্রাফের দরকার নেই, গলার রেকর্ডের দরকার নেই, মুথহানার মাকে আমি হাজার পাঁচেক অচেনা মানুষের মাঝখানে দেখলেও চিনে নিতে পারব।

কুর্গ গেলে আমি প্রথম দিন কি খাবো তাও জানি, নাইতে যাবার সময় লাল না নীল কোন রঙের গামছা পাবো তাও জানি, শুধু-গায়ে চলাফেরা করলে মায়ের যে আপত্তি নেই তাও জানি এবং বিশেষ করে জেনে নিয়েছি, বিদায় নেবার সাত দিন আগের থেকে যেন রোজই যাবার তাগাদা দিই, না হলে বোম্বায়ে এসে জাহাজ ধরতে পারব না।

এ তিন মাসের প্রথম দু মাস মুথহানার জীবনে মাত্র দুটি কর্ম ছিল। ধুঁকতে ধুঁকতে ঠোক্কর খেয়ে পড়ি-মরি হয়ে এ দোকান, ও দোকান ঘুরে-ঘুরে সমস্ত দিন ব্যবসা গুটোনো, আর রাত্রে আমাকে মায়ের গল্প বলা।

তারপর মুথহানাকে শয্যা নিতে হল। এদিকে আমার পয়সাও ফুরিয়ে এসেছে। মুথহানা জানতেন, আমি একমাস পরেই দেশে ফিরব। টাকা থাকতেই আমি টিকিট কেটে রেখেছিলুম। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল আরও কিছু দিন থাকার কিন্তু তাহলে হেলেনায় হিস্যায় ভাগ বসাতে হত। সে তো অসম্ভব।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে কান পেতে অপেক্ষা করছেন, আমি কখন বাড়ি ফিরব।

'হের ডক্টর!'

'আপনি আমাকে সব সময় "ডক্টর", "ডক্টর" করেন কেন?'

'রাগ করেন কেন? আমি তো লেখাপড়া শিখি নি। আমার বন্ধু "ডক্টর", সেটা ভাবতে ভাল লাগে না? কিন্তু সে কথা যাক। বলছিলুম কি, আমার

'মা—না থাক্—'

আমি বললুম, 'আপনাকে বলতেই হবে।'

'আপনি শক্‌ট্‌ হবেন। আর কেন যে বলছি তাও জানি নে। আমার মা ব্লাউজ-শেমিজ পরেন না, শুধু একখানা শাড়ি।'

আমি বললুম, 'আমার মাও গরমের দিনে ব্লাউজ শেমিজ পরেন না।'

'আঃ, বাঁচালেন।'

* * *

কাইরো ছাড়ার দিন সাতেক আগে মুথহানা তাঁর ঘরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। খান ত্রিশেক খাম দিয়ে বললেন, 'এই ঠিকানা সব খামে টাইপ করে দিন তো।'

দেখি লো,

C. D. Muthana
Virarajendrapeth
Marcara
South Coorg. India.

বললেন, 'হেলেনা শুধু গ্রীক লিখতে পারে। তাই এই খামগুলো দেশে যাবার সময় তার কাছে রেখে যাব। আমাকে চিঠি লিখতে তাহলে তার কোনও অসুবিধে হবে না। আমিও তো শিগ্‌গিরই দেশে যাচ্ছি।'

টাইপ করছি আর ভাবছি, এর কটা খামের প্রয়োজন হবে? এ বড় অমঙ্গল চিন্তা, পাপ চিন্তা—কিন্তু শত চেষ্টা করেও মনকে তার থেকে মুক্ত করতে পারলুম না।

কাইরো ছাড়ার আগের দিন মুথহানা আমাকে ডেকে বললেন, 'ওমর বলছিল আপনি নাকি বিকেলের দিকে আজহর অঞ্চলে যাবেন। আমার জন্যে তিনখানা কুরান শরীফ কিনে আনবেন?'

আমি বললুম, 'কার জন্য কিনছেন?'

'আমার গাঁয়ের মোল্লাদের জন্য। তারা বলেছিল, ভারতবর্ষে ছাপা কুরানে নাকি বিস্তর ছাপার ভুল থাকে। কাইরোর কুরান নিয়ে গেলে তারা যা খুশীটা হবে!'

আমার ভুল অমূলক। বিদায় নেবার দিন দেখি মুথহানা ভারি খুশী-মুখ। বার বার বললেন, 'শিগ্‌গিরই ভারতবর্ষে দেখা হবে।' হেলেনা—থাক সে কথা। ও-রকম অসহায়ের কান্না আমি জীবনে কখনও দেখি নি, কখনও দেখতে হবে না, তাও জানি।

দেশে ফিরেই মুথহানাকে চিঠি লিখলুম। জবাব পেলুম না। তখন অতি ভয়ে ভয়ে তাঁর মাকে লিখলুম, 'কোদণ্ডের শরীর একটুখানি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বলে তিনি কিছুদিনের জন্য দেশে আসবেন বলেছিলেন। আপনার কথা আমাকে সব সময় বলতেন আর দেশের ঘরবাড়ির জন্য তাঁর মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল। আমি তাঁর সঙ্গে এক বৎসর একই বাড়িতে ছিলুম। আপনার কথার

সব সময় ভাবতেন আর আমাকে রোজই আপনার কথা বলতেন। কম ছেলেই মাকে এত ভালোবাসে। আপনি আমার প্রণাম নেবেন।' বহু ভেবে-চিন্তে এই কটি কথা লিখেছিলুম, পাছে আমার কোনও কথা তাঁর মনে ব্যথা দেয়।

এ চিঠিরও উত্তর পেলুম না।

তার মাস খানেক পর কাইরো থেকে খবর পেলুম, কোদণ্ড মুথহানা আমি চলে আসার তিন দিন পর ইহলোক ত্যাগ করেন।

মাদ্রাজ উপকণ্ঠের বেলাভূমি

এই যে সামনের বালুপাড়ের উপর জেলেপাড়া এর সঙ্গে মানব-সভ্যতার কোথায় যোগসূত্র—এই পাড়ার বাইরে যে সংসার তার উপরে সে কথাটা নির্ভর করে, কি পরিমাণ সহযোগিতা পায়?

এদের ঘরে যা তৈজসপত্র তা বিক্রি করলে দু টাকার বেশী উঠবে না। যে সব বাসনকোসন সামনের রাস্তার কলতলায় ধুতে নিয়ে আসে তার অধিকাংশ মাটির। দৈন্য বোধ হয় এদের চরম, কারণ হাঁড়ি-কলসীগুলোও অত্যন্ত মামুলী—তাদের আকারপ্রকারে সামান্যতম সৌন্দর্যের সন্ধান নেই। এমনই এবড়ো-থেবড়ো যে কোনো গতিকে দাঁড় করানো যায় মাত্র—ভার-কেন্দ্র বলে কোনো জিনিস বেশির ভাগ হাঁড়ি-কলসীতে নেই।

পুরুষরা কাজকর্ম করে সুদ্ধু একখানা কালো রঙের এক বিঘৎ চওড়া নেংটি আর ঘুনসি পরে। সন্ধ্যেবেলায় দেখেছি কেউ কেউ ধুতি-শার্ট পরে—বেশীর ভাগ যে জামা-কাপড় পরে সেগুলো দেখে মনে হয় যেন মাছের বদলে কুড়িয়ে-নেওয়া পরিত্যক্ত বুশ-শার্ট, বোতামহীন শর্ট। ময়লা ঝোলাঝালা শর্ট-শার্ট দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, নিতান্ত হিম বাতাসের কন্‌কনানিতে বাধ্য হয়ে পরেছে।

মেয়েরা পরেছে উত্তর ভারতে তৈরী মিলের শাড়ি। দক্ষিণ ভারতের সুন্দর সবুজ-সোনালী, মেরুন-নীল রঙের মামুলী শাড়ি কেনার পয়সা এদের নেই। এক-রঙা জামা যা পড়েছে তা সে এমনি বিবর্ণ আর রুক্ষ যে সেটা পরার কোন অর্থ বোঝা যায় না—পরার কি প্রয়োজন? আমাদের জেলেনীরা তো পরে না। দু'একজনের পায়ে আংটি, হাতে বালা, নাকে ফুল—সবই রুপোর।

এরা কেরোসিনের ডিবে জ্বালায় না, রেড়ির তেলের পিদিম এখনো বুঝে উঠতে পারে নি। আর সে জ্বালানোই বা কতক্ষণের জন্য? সন্ধ্যে ভালো করে ঘনাতে না-ঘনাতেই সাঁঝের পিদিম দেখিয়ে এরা আলো নিভিয়ে ফেলে।

এদের মাছ-ধরার জাল, খানকয়েক এবড়ো-থেবড়ো তক্তায় জোড়া কাটামারুন ভেলা, দড়াদড়ি সব কিছুই এদের নিজের হাতে তৈরী—সামান্য সীসের গুলি আর লোহার পেরেক হয়ত সভ্য মানবের কাছ থেকে কিনে নেওয়া।

এদের ছেলেমেয়েরা ইস্কুল যায় না, ব্যামো শক্ত না হলে ডাক্তার হাসপাতালের সন্ধান করে না।

শহরের সভ্যতার কাছ থেকে এই নগণ্য,—প্রায় উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ—ন্যাকড়াটুকু গুলিপেরেকটার বদলে এরা সকাল সন্ধ্যা খাটে। যে মাছ ধরে তার অতি সামান্য অংশ খায়, বেশীর ভাগ 'বিক্রি' করে দিতে হয় ঐ ন্যাকড়াটুকু, ঐ পেরেকটা আর দু'মুঠো চালের জন্য। 'বেচাকেনা'র নামে এই নগ্ন প্রবঞ্চনা চোখের সামনে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

'নগ্ন প্রবঞ্চনা?' চক্ষুষ্মান লোকের সামনে এ নগ্নতা ধরা পড়ে।

আর সবাই দেখছে সেই গল্পের রাজা যেন ফক্কিকারের জামা-কাপড় পরে শোভাযাত্রায় চলেছেন। 'সভ্যতা'র এই শোভাযাত্রার মাঝখানে সেই সরল বালকের চেঁচানো কেউ শুনতে পায় না—কিংবা চায় না।

* * *

সমুদ্রের গর্জন আর বাতাসের হাহাকারে যতক্ষণ বারান্দা মুখরিত থাকে, ততক্ষণ রাস্তার কলতলার শব্দ কানে আসে না—শুধু দেখি সমুদ্রপারের জেলেরা আসছে পথের পাশের কলতলায় নাইতে অথবা কাপড় কাচতে; মেয়েরা আসছে জল নিতে, বাসন ধুতে, কাপড় কাচতে, কাচ্চা-বাচ্চাদের নাওয়াতে, মাথা ঘষতে। কল থেকে জল বেরোয় অতি মন্দগতিতে—একটি কলসী ভরতে আধ ঘণ্টাটাক লাগে।

বেশী ভিড় না থাকলে দূর গাঁয়ের মেয়েরা শহরে যাবার মুখে মাথা থেকে চুবড়ি নামিয়ে দুদণ্ড জিরিয়ে নেয়, কলে হাত পা ধোয়।

আপিস কিংবা কারখানা যাওয়ার তাড়া থাকলে নিশ্চয়ই কলতলায় ঝগড়া-ঝাঁটি বেধে যেত। এখানে সব কিছু ধীরে-সুস্থে এগোয়। ঐ যে জেলেটা আরাম করে কলতলায় গা এলিয়ে দিয়েছে তার জন্য কলসীহাতে মেয়েটার কোনো আপত্তি আছে বলে মনে হচ্ছে না। যে কথাবার্তা হচ্ছে তা সমুদ্রের গর্জনে আর বাতাসের শনশনানিতে শোনা যাচ্ছে না।

আজ বাদলার দিন। নাইবার চাড় নেই বলে কলতলায় ভিড় কম। কাচ্চা-বাচ্চারা তো একদম আসে নি। কিন্তু কড়া গরম পড়লে এখানে রীতিমত হাট বসে যায়। কড়া গরম পড়ার মানে যে তখন হাওয়া বন্ধ, কাজেই তখন একটু আধটু চিৎকারও শোনা যায়—মেজাজও তখন কড়া হয়ে যায় বলে।

কলতলায় ভিড় কমে এসেছে। দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি, একটি জেলেনী কলসী ভরে দাঁড়িয়ে আছে—কলতলায় আর কেউ নেই যে কলসীটা মাথায় তুলে দেবে।

এমন সময় এক রিক্সা-ওলা যাচ্ছিল। রিক্সা দাঁড় করিয়ে সে কলসীটা তুলে দিয়ে ফের রিক্সা টানতে টানতে চলে গেল।

মেয়েটা একবার কৃতজ্ঞ নয়নে তাকালো পর্যন্ত না। রিক্সা-ওলাও অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সাহায্যটুকু করে গেল—যেন এরকম ধারা করাটা তার হামেশাই লেগে আছে।

একেই বলে খাঁটি ভদ্রতা।

আনিকি পাসিকিভি

এক বাঙালী দম্পতির সঙ্গে জিনীভার এক বড় হোটেলে উঠেছি। প্রথম দিনই খানাঘরে লক্ষ্য করলুম, আমাদের টেবিলের দিকে মুখ করে বসেছেন এক দীর্ঘাঙ্গী যুবতী। দীর্ঘাঙ্গী বললে কম বলা হয়, কারণ আমার মনে হল এঁর দৈর্ঘ্য অন্তত পক্ষে পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি হবে—আর আমরা তিনজন বাঙালী গড়পড়তায় পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি হই কি না-হই।

দৈর্ঘ্যের সঙ্গে মিলিয়ে সুগঠিত দেহ—সেইটেই ছিল তাঁর সৌন্দর্য, কারণ মুখের গঠন, চুলের রঙ এবং আর পাঁচটা বিষয়ে তিনি সাধারণ ইয়োরোপীয় রমণীদেরই মত।

ভদ্রতা বজায় রেখে আমরা তিনজনই যুবতীটিকে অনেকবার দেখে নিলুম। ফিস ফিস করে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ভিতরে আলোচনাও হল। তখন লক্ষ্য করলুম, আমাদের দিকে তিনিও দু'চারবার তাকিয়ে নিয়েছেন।

সেই সন্ধ্যায় বাঙালী ভদ্রমহিলাটি হোটেলের ড্রয়িংরুমে বারোয়ারী রেডিয়োটা নিয়ে স্টেশন খোঁজাখুঁজি করছিলেন; আমি একপাশে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলুম। হঠাৎ সেই যুবতী ঘরে ঢুকে সোজা মহিলাটির কাছে গিয়ে পরিষ্কার ইংরিজিতে বললেন, 'আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি? আপনি কি কোনো বিশেষ স্টেশন খুঁজছেন? আমার বেতারবাই আছে।'

পরিচয় হয়ে গেল। রোজ খাবার সময় আমাদের টেবিলেই বসতে আরম্ভ করলেন। নাম আনিকি পাসিকিভি—দেশ ফিনল্যাণ্ডে।

ফিনল্যাণ্ডের আর কাকে চিনব? ছেলেবেলায় ফিন্ লেখক জিলিয়াকুসের 'রুশ বিদ্রোহের ইতিহাস' পড়েছিলুম আর তাঁর ছেলে জিলিয়াকুসও বিখ্যাত লেখক—প্রায়ই 'নিউ স্টেটসম্যানে' উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। ব্যস্।

কিন্তু তবু যেন পাসিকিভি নামটা চেনাচেনা বলে মনে হয়। সে কথাটা বলতে আনিকি, একটুখানি লজ্জার সঙ্গে বললেন, 'আমার বাবা ফিনল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট।'

আমরা তিনজনেই একসঙ্গে বললুম, 'অ।'

আনিকির সঙ্গে আলাপ হওয়াতে আমাদের ভারি সুবিধে হল। বাঙালী দম্পতি ইংরিজি আর বাঙলা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানতেন না, কাজেই আমাকে সব সময়ই ওঁদের সঙ্গে বেরতে হত। আনিকি অনেকগুলো ভাষা জানতেন; তিনি তাঁদের নিয়ে বেরতেন আর আমি য়ুনিভার্সিটি, লাইব্রেরি, মিটিং-মাটিং করে বেড়াতুম।

সুইস খানা যদিও বেজায় পুষ্টিকর তবু একটুখানি ভোঁতা—আনিকি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা কয়ে তার পরিপাটি ব্যবস্থা করে দিলেন। শামুনিক্স্ দেখতে যাবার জন্য মোটর ভাড়া করতে যাচ্ছি—আনিকি এক দোস্তের গাড়ি ফিরি-গ্র্যাটিস-অ্যাণ্ড-ফরনাথিং যোগাড় করে দিলেন। তা ছাড়া জিনীভা, লজান, মন্ত্রো, ভিল্নভ্ (রমা রলাঁ সেখানে থাকতেন) সম্বন্ধে দিনের পর দিন নানা-প্রকারের খবর দিয়ে আমাদের ওয়াকিবহাল করে তুললেন।

সূক্ষ্ম রসবোধও আনিকির ছিল। আমি একদিন শুধালুম, 'আপনি অতগুলো ভাষা শিখলেন কি করে?'

বললেন, 'বাধ্য হয়ে। ইয়োরোপের খানদানী ঘরের মেয়েদের মেলা ভাষা শিখতে হয় বরের বাজার কর্নার করার জন্য। ইংরেজ ব্যারন, ফরাসী কাউন্ট, ইতালিয়ান ডিউক সক্কলের সঙ্গে রসালাপ না করতে পারলে বর জুটবে কি করে?'

তারপর হেসে বললেন, 'কিন্তু সব শ্যাম্পেন টক্! এই পাঁচ ফুট এগারোকে বিয়ে করতে যাবে কোন্ ইংরেজ, কোন্ ফরাসি? তাকে যে আমার কোমরে হাত রেখে নাচতে হবে বিয়ের রাতের বল ডান্সে। যা দেখতে পাচ্ছি, শেষটায় জাতভাই কোনো ফিন্‌কেই পাকড়াও করতে হবে!'

আমি শুধালুম, 'ফিন্‌রা কি বেজায় ঠ্যাঙা হয়?'

বললেন, 'ছয় ছয় তিন, ছয় ছয় হামেশাই। তাই তো তারা আর পাঁচটা জাতকে আকসার হাইজাম্পে হারায়।'

রসবোধ ছাড়া অন্য একটি গুণ ছিল আনিকির। হাজির-জবাব। কিছু বললে চট করে তার জুৎসই জবাব তাঁর জিভে হামেহাল হাজির থাকত।

একদিন বেড়াতে বেরিয়েছি তাঁর সঙ্গে। এক ডেঁপো ছোকরা আনিকির দৈর্ঘ্য দেখে তাকে চেঁচিয়ে শুধালে, 'মাদমোয়াজেল, উপরের হাওয়াটা কি ঠাণ্ডা?'

আনিকি বললেন, 'পরিষ্কার তো বটেই। তোমার বোটকা প্রশ্বাস সেখানে নেই বলে।'

আনিকির সঙ্গে আমাদের এতখানি হৃদ্যতা হয়েছিল যে তিনি আমাদের সঙ্গে লজান, মন্ত্রো, লুৎসের্ন, ইন্টেরলা কন, ৎসুরিশ সব জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন।

বিদায়ের দিন শ্রীমতী বসু তো কেঁদেই ফেললেন।

* * *

দু'এক বৎসর আমাদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার ছিল। তার পর যা হয়—আস্তে আস্তে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

তারপর বহু বৎসর কেটে গিয়েছে, এখানে এক ফিন্ মহিলার সঙ্গে আলাপ। শুধালুম, 'প্রেসিডেন্ট পাসিকিভির মেয়েকে চেনেন?'

গুম্ হয়ে রইলেন ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ। তারপর শুধালেন, 'আপনার সঙ্গে এখন কি তাঁর যোগাযোগ নেই?'

আমি বললুম, 'বহু বৎসর ধরে নেই।'

বললেন, 'তিনি চার মাস ধরে হাসপাতালে। পেটের ক্যানসার। বাঁচবেন না। আপনি একটা চিঠি লিখুন না। অবশ্য অসুখের কথা উল্লেখ না করে। জাস্ট, এমনি, হঠাৎ যেন মনে পড়েছে।'

সে রাত্রেই লিখলুম।

দিন চারেক পরে আরেক পার্টিতে সেই ফিন্ মহিলার সঙ্গে দেখা। শুধালেন, 'চিঠি লিখেছেন?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

বললেন, 'দরকার ছিল না। কাল দেশের কাগজে পড়লুম, মারা গেছেন।'

বিদেশে

প্রায়ই প্রশ্ন শুনতে হয়, 'সব চেয়ে কোন্ দেশ ভাল ?'

'মাই কানট্রি রাইট অর রঙ, মাই মাদার ড্রান্ক্ অর সোবার্' জাতীয় পাঁড় লোক হলে তো কথা নেই, চট করে বলবে, তার দেশই সব চেয়ে ভালো। কিন্তু আপনি যদি সে গোত্রের প্রাণী না হন তবে কি উত্তর দেবেন ? কেউ যদি প্রশ্ন শুধায়, 'সব চেয়ে খেতে ভালো কি ?' তা হলে যে রকম মুশকিলে পড়তে হয়।

তখন উল্টে শুধাতে হয়, 'ভালো দেশ' বলতে তুমি কি বোঝো ? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আবহাওয়া, আহারাদি, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, সৌন্দর্যের পূজা, ধন-দৌলত, আতিথেয়তা, তুমি চাও কোনটা ?' 'সব কটা মিলিয়ে হয় না ?' 'আজ্ঞে না।'

তবু যদি কেউ পিস্তল উঁচিয়ে বলে, 'এখুনি তোমায় এদেশ ছাড়তে হবে ; কোথায় যাবে বলো !' (যাঁদের ভ্রমণে শখ তাঁরা অবশ্য উল্লসিত হয়ে বলবেন, 'পিস্তল ওঁচাতে হবে না, একবার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেই হল') তা হলে বোধ হয় সুইটজারল্যাণ্ডের নামই করব।

ধরে নিচ্ছি খর্চাটা আপনিই দিচ্ছেন—কারণ খর্চা যদি না দেন তবে তো সক্কলের পয়লাই ভাবতে হবে কোন্ দেশে গেলে দু' মুঠো অন্ন জুটবে। তা হলে 'সাউথ সী আয়লেণ্ড' বা আফ্রিকার এমন কোন দেশের কথা ভাবতে হবে যেখানে এন্তার কলা-নারকেল রয়েছে, জীবন সংগ্রাম কঠোর নয়—বেঘোরে প্রাণটা যাবার সম্ভাবনা কম। সেদিক দিয়ে অবশ্যি মালদ্বীপ সব চেয়ে ভালো। ওদেশে কেউ কখনো শখ করে যায় নি তাই 'অতিথি' শব্দটা মালদ্বীপের ভাষায় ঝাঁ চকচকে নূতন হয়ে পড়ে আছে, কখনো ব্যবহার হয় নি। মালদ্বীপের প্রত্যেকটি দ্বীপ এত ছোট যে, যে-কেউ যে-কোনো মুহূর্তে আপন বাড়ি ফিরে যেতে পারে—অতিথি হতে যাবে কে কার বাড়ি ? এখানে অবশ্য পালা নেমন্তন্নের কথা উঠছে না। তাই কেউ যদি কখনো পাকে-চক্রে মালদ্বীপ পেঁছিয় তবে তাকে এর বাড়িতে ওর বাড়িতে এ দ্বীপে ও দ্বীপে দু'দিন চারদিন থাকতে গিয়ে হেসেখেলে বছর তিনেক কেটে যায়। আমার জীবনে আমি মাত্র একটি মালদ্বীপ-বাসীর সঙ্গে কাইরোতে পরিচিত হই। প্রতিবার দেখা হলেই ভদ্রলোক মালদ্বীপ যাবার আমন্ত্রণের কথাটি আমায় স্মরণ করিয়ে দিতেন।

তাই বলছিলুম, খর্চা যখন আপনিই দিচ্ছেন তবে সুইটজারল্যাণ্ড সই। সুইটজারল্যাণ্ডের মত আক্কা দেশ ইউরোপে আর নেই—সেখানকার খর্চা যদি আপনি বরদাস্ত করতে পারেন তবে আর সর্বদেশ তো ফাউ। টুক করে প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা ঘুরে আসতে পারবেন। খর্চা সুইটজারল্যাণ্ডে থাকলে যা বার্লিন ঘুরে এলেও তা।

স্বপ্নেই যখন খাচ্ছেন, তখন ভাত কেন পোলাওই খান (সিন্ধী প্রবাদে বলে, 'স্বপ্নের পোলাওই যখন রাঁধছো তখন ঘি ঢালতে কঞ্জুসি করছো কেন ?'), স্বপ্নেই যখন ভ্রমণ করছেন তখন থার্ড ক্লাস কেন, গোটা জাহাজ চার্টার করে ড্য

লুক্স কেবিনে কিম্বা প্রেশারাইজড্ স্লেনে করে জিনীভা চলে যান।

লেক অব জিনীভার পারে একটি ছোট, অতি ছোট কুটির (শালে) ভাড়া নেবেন আর একটি রাঁধুনি যোগাড় করে নেবেন।

শুনেই নাভিশ্বাস উঠলো তো? বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, তার ছুরি-চামারি ঠেকাবে কে? হিসেবে আলুর সের আড়াই টাকা দেখিয়ে বলবে না তো, 'কত্তা, দাঁওয়ে মেরেছি, না হলে আসলে দাম তিন টাকা?'

এই হল সুইটজারল্যাণ্ডের প্রথম সুখ। ছুঁচোমো, ছ্যাঁছড়ামো ওদেশ থেকে প্রায় উঠে গিয়েছে। সুইটজারল্যাণ্ডের হোটেলেও তাই। আক্রা বটে—বসবাস খাই-খরচের জন্য হয়ত দৈনিক কুড়ি টাকা নিল কিন্তু তার পরও আপনাকে মাখনটাতে ফাঁকি, মুর্গীটাতে জুচ্চোরি এসব করে না। আপনার খাওয়া দেখে যদি তার সন্দেহ হয় আপনি পেট ভরে খান নি তবে এসে বলবে, 'আপনি বিদেশী, এ রান্না আপনার হয়ত পছন্দ হয় নি। আপনি কি খেতে চান বাৎলে দিন, আমরা সে রকম রেঁধে দেব।'

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আপনার রাঁধুনী আপনাকে ফাঁকি দেবে না।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই বিছানার পাশের বোতামটি টিপবেন। পাঁচ মিনিটের ভিতর গরম কফি, মুরমুরে রুটি আর শিশির-ভেজা মাখনের গুলি। রাঁধুনী বলবে, 'স্যর, চমৎকার ওয়েদার। আপনি বেরুচ্ছেন তো? আমি বাজার চললুম।'

লেকের পারে এসে একখানা বেঞ্চিতে বসবেন। খবরের কাগজটি পাশে রেখে তার উপর হ্যাট চাপা দেবেন।

আহা, কী গভীর নীল জল জিনীভা লেকের। লেকের ওপারে যে আল্প্স সেও যেন নীল, আর তার মাথায় মাথায় সাদা সাদা বরফের টুপি। তার উপর চূড়োর কাটা-কাটা সাদা ঝালরে সাজানো আকাশের ঘন নীল চন্দ্রাতপ। আর আকাশ-বাতাস, হ্রদের জল, পাহাড়ের গা, বরফের টুপি সব কিছু ভরে দিয়েছে কাঁচা হলুদের সোনালি রোদ। সকাল বেলায় বাতাস একটু ঠাণ্ডা; কিন্তু প্রতিক্ষণে আপনার গালে কানে আদর করে সে বাতাস কুসুম-কুসুম গরম হতে থাকবে। ওভার-কোটের বোতামগুলো খুলে দিয়ে পাইপটা ঠাসতে আরম্ভ করবেন। হয়তো গুন্‌গুন্ করতে আরম্ভ করবেন, 'আমি চিনি, চিনি, চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।'

নীল জলের উপর দিয়ে সাদা জাহাজের এ-পার ও-পার খেয়া। জলের উপর আল্প্সের কালো ছায়া পড়েছে, ফাঁকে ফাঁকে নীল জল, তার উপর সাদা জাহাজ। সেই আল্পনার উপর জাহাজের চাকার তাড়ায় ভেঙে পড়ছে লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের চুমকি। যেন কোন্ খেয়ালি বাদশা টাকশাল থেকে এইমাত্র বেরনো টাকা নিয়ে খোলামকুচির খেলা লাগিয়েছেন।

পাল তুলে দিয়ে চলেছে জেলের নৌকো। অতি ধীরে অতি মন্থরে। জাল টেনে তোলার সময় রোদ এসে পড়ছে ভেজা জালে। কালো জাল যাদুর ছোঁয়া লেগে রুপোর জাল হয়ে গেল।

এই রকম রুপোর জাল দিয়ে আপনার প্রিয়া তার খোঁপা জড়াতো না ?

তৎক্ষণাৎ বুকটা চড়চড় করে ইস্-পার-উস্-পার ফেটে যাবে। কোন্ মূর্খ বলে দেশ-ভ্রমণে অবিমিশ্র আনন্দ ?

রববারে জিনীভার লোকের পাড় আরও চমৎকার।

বিস্তর নরনারী জাহাজ চড়ে বেরিয়েছে ফুর্তি করতে। এসব জাহাজ 'ইম্পিশাল'—লম্বালম্বি লেকের এপার ওপার হয়। সমস্ত দিন জাহাজে কাটিয়ে উত্তম আহারাদি করে (হে বাঙালী, লেকের মাছ খেতে চমৎকার

বাপ রে সে কি বিরাট মাছ উদর আণ্ডাময়
মুখে দিলে মাখন যেন জঠর ঠাণ্ডা হয়),

জাহাজের ব্যাণ্ডের সঙ্গে টাঙ্গোর ধাগিনাতি নাকধিন আর ওয়াল্ট্সের ধা ধিন না, ধা তিন না নেচে, কিংবা মাউথ-হারমনিয়াম বাজিয়ে, ছোঁড়াছুঁড়িদের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করে, কিংবা জাহাজের এক কোণে আপন মনে বসে খুদাতালার আসমান-পানি, পাহাড়-পর্বত দেখে দেখে সমস্ত দিনটা দিব্য কেটে যায়।

সুইসরা ইংরেজের মত গেরেমভারী লোক নয়। যদি দেখে, আপনি বিদেশী, এক কোণে একা বসে আছেন তবে কোনো একটু ছুতো ধরে আপনার সঙ্গে আলাপ করে নেবেই নেবে। অবশ্য আপনি যদি খেঁকিয়ে ওঠেন তবে আলাদা কথা, কিন্তু আপনি তো বদরসিক নন—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনি 'পঞ্চতন্ত্র' পড়েন—আপনি খুশী হয়েই সাড়া দেবেন।

কিন্তু সুশীল পাঠক, এই বেলা তোমাকে বলে রাখি। দেশভ্রমণের ষোল-আনা আনন্দই বরবাদ-পয়মাল যদি তুমি সে দেশের ভাষায় কথা কইতে না পারো। ভুল বললুম, বলা উচিত ছিল, যদি বুঝতে না পারো। কথা কইবার প্রয়োজন অত বেশী নয়, সুইস যদি দেখে যে তুমি তার ভ্যাচর ভ্যাচর বুঝতে পারছো, মাঝে মাঝে মোকা-মাফিক 'হুঁ' 'হুঁ' করছো কিংবা বুড়া রাজা প্রতাপ রায়ের মত সমে সমে মাথা নাড়ছো তা হলেই সে খুশী।

সুইস কেন, পৃথিবীর প্রায় সব জাতের লোকই বিদেশী সম্বন্ধে কৌতূহলী। বিশেষ করে মেয়েদের উৎসাহ এ বাবদে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী। অথচ মেয়েরা লাজুক তাই তারা পুরুষকে অগ্রদূত হিসাবে পাঠায় কলেকৌশলে আলাপ জমাবার জন্য। তার পর

'দীন যথা যায় দূরে, তীর্থ দশরশনে
রাজেন্দ্র সঙ্গমে—'

কিংবা কালিদাসের বজ্রমণি সমুৎকীর্ণ হওয়ার পর সূত্র যে রকম সুড়ুৎ করে উৎরে যায় (সংস্কৃতটা আর ফলালুম না, ভুল হয়ে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা), মেয়েটি আপনার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেবে।

সাবধানী পথিক, ভয় পেয়ো না। যে মেয়েটি আপনার সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্য ছোঁড়াটাকে পাঠিয়েছিলেন সে ফালতো। তার বোন ছোকরাটির ফিয়াঁসে। বোন সঙ্গে আছে, সে বেচারী একা একা কি করে ?

চামড়া আর চুলের রঙ তাজ্জব জিনিস।

আমরা ফর্সা রঙের জন্য আকুল, যার চুল একটুখানি বাদামী তার তো দেমাকে মাটিতে পা পাড়ে না। আর বেশীর ভাগ উত্তর এবং মধ্য ইয়োরোপীয় বাদামী চামড়া আর কালো চুলের জন্য জান্ কোরবানী দিতে কবুল।

চট করে একটা ঘটনার উল্লেখ করে নেই। এ ঘটনা অধমের জীবনে একাধিকবার হয়েছে।

এরকম এক জাহাজে এক কোণে একা বসে আছি। আমার থেকে একটু দূরে এক পাল ইস্কুলের মেয়ে মাস্টারনীর সঙ্গে ফুর্তি করতে জাহাজে চেপেছে। সবাই আপন আপন স্যাণ্ডউইচ বাড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। স্যাণ্ডউইচগুলো টেবিলের মধ্যিখানে বারোয়ারি করে রাখা হয়েছে, আর জাহাজ থেকে তারা অর্ডার করেছে লেমনেড।

কী চেঁচামেচি! 'দেখ দেখ, ফ্রিডির মা কি রকম খাসা বেকন্-স্যাণ্ডউইচ পাঠিয়েছে,' ফ্রিডি লজ্জায় টমাটো হয়ে বলছে, 'না না, মাস্টার্ড ছিল না বলে স্যাণ্ডউইচ ভালো হয় নি,' 'ক্লারার মা'র পাঠানো স্যালাডটা খা ভাই, জানিস ওঁর বাগানে যা লেটিস আর টমাটো হয়!' আর টীচার শুধু বলছেন, 'চুপ চুপ, অত করে চ্যাঁচাতে নেই। লোকে কি ভাববে?'

ধর্ম সাক্ষী লোকে কিছু ভাবে না। বরঞ্চ ওরা না চ্যাঁচালে পাঁচজন অস্বস্তি অনুভব করত; ভাবত কালা-বোবাদের ইস্কুল পিক্‌নিকে বেরিয়েছে।

সব কটা মেয়ে—ইস্তেক টীচার—আড়নয়নে ভদ্রতা বজায় রেখে আপনার কালো চুল আর বাদামী রঙের দিকে তাকাবে।

পরের স্টেশনে হুড়মুড় করে সবাই নেমে গেল। আমার মনটা উদাস হয়ে গেল।

তখন দেখি একটি আট ন'বছরের মেয়ে টেবিলের তলায় লুকিয়ে ছিল, গুড়ি গুড়ি আমার কাছে এসে কার্টসি করে (অর্থাৎ দু হাতে ফ্রক একটুখানি তুলে হাঁটু ভেঙে) বললে, 'গুটেন্ টাখ্) সুপ্রভাত) !'

আমি চিবুকে হাত দিয়ে আদর করে বললুম, 'গুটেন্ টাখ্, মাইন জুসেন (সুপ্রভাত, মিষ্টি মেয়ে)।'

লজ্জার কাঁচুমাচু হয়ে, চুলের ডগা পর্যন্ত লাল করে বললে, 'আপনি রাগ করবেন না?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয় না।'

'তবে বলুন তো, আপনি কি দিয়ে চুল কালো করেছেন! আমি কাউকে বলবো না, তিন সত্যি।'

আমি তখন তার সোনালি চুলের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে। বললুম, 'ডার্লিং, তোমার কী সুন্দর সোনালি চুল!'

গাল ফুলিয়ে বললে, 'রাবিশ, আমি কালোচুল চাই।'

কিছুতেই বোঝাতে পারি নে, আমি চুলে রঙ মাখাই নি।

শেষটায় হঠাৎ বুদ্ধি খেলল। কোটের আস্তিন সরিয়ে দেখালুম আমার লোমও কালো। বললুম, 'ওগুলো তো আর বসে বসে কালো করি নি।'

বিশ্বাস তখন তার হল। মুখে গভীর বিষাদ মেখে, মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে জাহাজ থেকে নেমে গেল।

দু'টাকা জোর ন'সিকে দিয়ে টিকিট কেটে বসেছেন। এমন আর কি আক্কা হল? সমস্ত দিন কাটাতে গেলে বায়স্কোপেও তার চেয়ে বেশি খরচা হত।

হুবহু গোয়ালন্দী জাহাজ। কেবিনের বালাই নেই—সব খোলা ডেক। রেলিঙের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চারজনের বসবার মত ছোট ছোট টেবিল সাজানো। নীল সাদায় ডোরা কাটা করকরে টেবিল ক্লথ। ক্লিপ দিয়ে টেবিলের সঙ্গে সাঁটা, পাছে হাওয়াতে ভর করে পক্ষীরাজের মত ডানা মেলে লেকের 'হে-পারে' চলে যায়।

'হে-পারে?' চট করে মনটা পদ্মার দিকে ধাওয়া করলো তো?

আমারও মনে পড়েছিল পদ্মার-কথা। জীবনে কতবার প্রদোষের আধা-আলো-অন্ধকারে চাঁদপুর থেকে জাহাজে করে গোয়ালন্দের দিকে রওয়ানা হয়েছি। বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তিতে সর্বদেহমন অবসন্ন—বাড়ি ছাড়ার সময় মা অমঙ্গলের চোখের জল ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি, সে কথা বার বার বুকের ভিতর কাঁটার মত খোঁচা দিচ্ছে, বহু চেষ্টা করেও মন থেকে সেটাকে সরাতে পারছি নে।

পদ্মার সূর্যোদয় মনের অনেকখানি বেদনা প্রতিবারই কমিয়ে দিয়েছে। রেলিঙের পাশে বসে, তারই উপর মাথা কাৎ করে তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে, যেখানে কালো-সাদার মাঝখানে আস্তে আস্তে গোলাপী আভা ফুটে উঠছে। পদ্মার জল রাঙা হয়ে গেল, মহাজনী নৌকোর পাল ফুলে উঠে মাঝখানটায় গোলাপী মেখে নিয়েছে, দূরের পাখি আর এ-পৃথিবীর পাখি বলে মনে হচ্ছে না, কোন নন্দনকাননের মেহদি পাতার রস দিয়ে যেন ডানা দুটি লাল করে নিয়েছে।

ঐ তো সূর্য ঐ তো সবিতা!

জাহাজ জোর ফালতো স্টীম ছাড়ছে। তারই উপর ক্ষণে ক্ষণে রামধনুর রঙ খেলে যাচ্ছে। মাঝি-মাল্লাদের চেঁচামেচি কেমন যেন আর কর্কশ বলে মনে হচ্ছে না। পাশে মোল্লাজীর নমাজ পড়া শেষ হয়েছে। সুর করে কোরান পড়তে আরম্ভ করেছেন। হাওয়াতে তাঁর দাড়ি দুলছে, পাগড়ীর ন্যাজ দুলছে। বর-যাত্রীর দল যাচ্ছে, না কনে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, কে জানে—একমাথা সিঁদুর-মাখা একটি মেয়ে ঘন ঘন শাঁখ বাজাচ্ছে। হিঁদু বাড়িতে তো শাঁখ শুনেছি সন্ধ্যেবেলায়, ভোরেও বাজায় নাকি? কে জানে?

উত্তমার্ধ নগ্ন, জাহাজের রশির মত মোটা ধবধবে পৈতে-ঝোলানো এক ব্রাহ্মণ বললেন, 'দেখো তো, মিয়া, ঠিক ঠিক রাজবাড়ির টিকিট দিয়েছে তো? যা ভিড় ছিল, কি দিতে কি দিয়ে বসছে কে জানে? চশমাটাও হারিয়ে গিয়েছে।'

রসভঙ্গ হল অস্বীকার করি নে, কিন্তু কাতর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ; অবহেলা অবিনয় করলে মর্শীদ-মুরুব্বীর মারাত্মক অভিসম্পাত লাগবে। বেশ করে দেখে নিয়ে বললুম, 'আজ্ঞে (আগে হলে একথা বলার প্রয়োজন হত না যে, মুরুব্বীরা ছেলেবেলাই আমাদের পই-পই করে শিখিয়েছিলেন, হিন্দু গুরুজনদের সঙ্গে কথা কইতে হরদম 'আজ্ঞে'—বাঙাল ভাষায় 'আইগা' বলতে হয়) ঠিকই দিয়েছে ; আপনাকে ঠকাতে যাবে কোন্ পাষণ্ড ?'

ব্রাহ্মণ ভারী খুশী। আমার পাতা বিছানাতে পরম পরিতৃপ্তিভরে গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

তরকারি-বেচনে-ওলা গেছে জাহাজ ইস্টিশানে টিকিট কাটতে—

'বাবু অ—অ—অ, অ—বাবু, নারান্‌জোর (নারায়ণগঞ্জ) এ্যাখ্‌খান টিকস্ দিবাইন নি ?'

বাবু বললেন, 'ছ আনা।'

তরকারি-ওলা বললে, 'বাবু অ—অ—অ, চারি আনায় অইব না ?'

বাবু পশ্চিম বাঙলার লোক, ওনাদের মেজাজ আমাদের দ্যাশে এলে একটুখানি মিলিটারি হয়ে যায়। খেঁকিয়ে বললেন, 'দে ব্যাটা দে, ছ' আনা দে।'

গভীর বেদনা সহকারে তরকারি-ওলা বললে, 'বাবু অ—অ—, তুমি আমার দোকানে রোজ রোজ আও। কলাডা মুলাডা কিনো। দরদাম করো। আর আমি আইলাম তোমার দোকানে এগ্ দিন। দরদাম করতা গেলাম—তুমি অমন খাটাশের মতন মুখডা করলা ক্যান্ ?'

মনে আমার সন্দেহ জাগছে, চতুর পাঠক বিশ্বাস করতে চান না জিনীভার জাহাজে বসে আমার এ 'নারানজী' (নারায়ণগঞ্জী) গল্প সত্যই মনে পড়েছিল কি না।

কেন পড়েছিল বলছি।

ইয়োরোপের সব দেশের ভিতর সুইটজারল্যাণ্ডই সবচেয়ে 'এক দরে বিক্রি'। সেখানে দরদস্তুর করতে গেলে (আমি বাঙাল, তাই করেছিলুম) সুইস এমনই বোকার মত তাকায়, কিংবা খেঁকিয়ে ওঠে যেন তাকে আমি ড্যাম্ মিথ্যেবাদী বলে সন্দ করছি।

অথচ দেখুন, ইয়োরোপীয়রা আমার দেশে হামেশাই দরদস্তুর করে। আমি যদি তরকারি-ওলার মত ওদেশে একবার গিয়ে দরদস্তুর করি, তবে ওরা 'খাটাশের মত মুখ করবে ক্যান ?'

ইতিমধ্যে মধ্য দিনের তপ্ত হাওয়া আমার মন উদাস করে দিয়েছে। মেঘের ডাকে, নব বরষণে বাঙালীর মন কেমন যেন গভীর বেদনায় ভরে যায়, আর সে মনটা উদাস হয়ে যায় দুপুর বেলায় আকাশের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ যেন বুকে বেজে ওঠে, আমি এ সংসারের নই, এখানকার সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু ওরকম ধারা মন খারাপের দাওয়াই জাহাজে মজুদ। হঠাৎ অর্কেস্ট্রা

বেজে উঠল ঃ

'গোলাপবাগানে, সান্‌সুসির গোলাপবাগানে—'

কি হয়েছিল ?

'সেই গোলাপবাগানে আমি মেরিকে চুমো খেয়েছিলুম—

প্রথম চুম্বন তো মানুষ জীবনে কখনো ভুলতে পারে না।'

ট্রেনে বসে আছেন ; চট করে আপনার সঙ্গে কেউ আলাপ জমাতে যাবে না—আপনি হয়ত চুপ করে বসে থাকাটাই পছন্দ করেন। কিন্তু ফুর্তির জাহাজে যখন বসেছেন, তখন নিশ্চয়ই ফুর্তি করতে চান—বাঙলা কথা। একা বসে বসে ফুর্তি হয় না, তাই কেউ যদি আপনার সঙ্গে পরিচয় করে সুখদুঃখের গল্প জুড়তে চায়, তা হলে আপনার আপত্তি না থাকারই কথা এবং আশ্চর্য, মানুষ অনেক সময় পরদেশীর সঙ্গে যতখানি প্রাণ খুলে কথা কইতে পারে, স্বদেশবাসীর সঙ্গে ততটা পারে না। প্রাণের কোণে বছরের পর বছরের জমানো কোনো এক গভীর বেদনা আপনি লজ্জায় কখনো কাউকে স্বদেশে প্রকাশ করেন নি ; হঠাৎ একদিন দেখতে পাবেন, অজানা-অচেনা বিদেশবিভূঁইয়ে এক ভিনদেশীর সামনে আপনি আপনার সব দুঃখ কাহিনী উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। তার সঙ্গে জীবনে আপনার আর কখনো দেখা হবে না—সেই কারণেই হয়ত আপনার হৃদয়ের আঁকুবাঁকু তার বুকের উপর চেপে বসা জগদ্দল পাথর সরিয়ে ফেলে নিষ্কৃতির গভীর আরাম পায়। ইয়োরোপের লোক তাই কোনো এক গোপন বেদনা নিয়ে যখন হন্যে হবার উপক্রম করে, তখন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যায়—সেখানে বেদনার বোঝা নামিয়ে দিয়ে সে আবার সুস্থ মানুষ হয়ে সংসারের দুঃখ-কষ্টের সামনাসামনি হয়।

বোধ হয়, ঐ একই কারণে কখনো কখনো মানুষ বিদেশে স্বদেশবাসীর কাছেও তার বেদনার দ্বার খুলে দেয়।

একদা প্রাগ শহরে দেখি, এক ভারতীয় বৃদ্ধ—খুব সম্ভব দাক্ষিণাত্যের—রাস্তায় বেকুবের মতন দাঁড়িয়ে আছেন। মুখের ফ্যাল-ফ্যাল ভাব দেখে অনুমান করলুম, হয়ত রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন, কিংবা হয়ত পার্সটাও গেছে। কাছে গিয়ে শুধালুম 'ব্যাপার কি ?'

ভদ্রলোক তো আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন আর কি। শুধু যে হোটেল হারিয়ে বসেছেন তাই নয়, হোটেলের নামটা পর্যন্ত বেবাক ভুলে গিয়েছেন।

কি করে তাঁর হোটেল খুঁজে পেলুম সে এক নয়, পাঁচ—মহাভারত। দ্বিজেন্দ্রলাল তো আর মিছে বলেন নি, 'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লংকা করিল জয়।' লংকা রাক্ষসের দেশ, প্রাগে ভদ্রসন্তানের বসবাস। আমার মত লেখাপড়ায় পাঁঠা বঙ্গ সন্তানের মাথায় এসব ফন্দিফিকির বিস্তর খেলে—সাক্ষাৎ শার্লক হোম্‌স্‌ আর কি—সে কথা 'দেশে'র পাঠককে হাইজাম্প-লঙজাম্প দিয়ে বোঝাতে হবে না।

কিন্তু আমি মনে মনে পাঁচশবার তাজ্জব মানলুম, এই নিরীহ তামিল ব্রাহ্মণের

প্রাগে আসার কি প্রয়োজন? তখনকার দিনে প্রতি শহরে মেলা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স বসত না যে, তিনি ভেটেরানারির 'রিণ্ডারপেস্ট' কিংবা ভারত বিদেশে ক' শ' মণ গাঁজাগুলি চালান করতে পারবে, তাই নিয়ে পাণ্ডববর্জিত প্রাগে ভারতের প্রতিভূ হয়ে আলোচনা করতে আসবেন।

হোটেলে পেঁছিতে দেখি, সেখানেও আরেক কুরুক্ষেত্র। এরকম নিরীহ বিদেশী প্রাণী হোটেলের লোকও কখনো দেখে নি—প্রাগ তো প্যারিস নয়—তাই তারা ব্যাকুল হয়ে পড়েছে দশটায় বেরিয়ে লোকটা আটটা অবধি ফেরে নি কেন? তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য আমি সেখানে শার্লক হোম্‌সেরই কদর পেলুম।

ভদ্রলোক চেপে ধরলেন, তাঁর সঙ্গে খানা খেতে যেতে হবে।

অপেরার টিকিট আমার কাটা ছিল—প্রাগের অপেরা ডাকসাইটে—কিন্তু আমার মনে হল, 'প্রাগে তামিল ব্রাহ্মণ' যে-কোনো অপেরার টাইটলকে হার মানাতে পারে।

বললেন, 'খানাটা কিন্তু আমার ঘরেই হবে—ডাইনিংরুমে না।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

ঘরে ঢুকেই তড়িঘড়ি সুট খুলে ফেলে ধুতি বের করে মাদ্রাজী কায়দায় সেটাকে লুঙ্গি বানিয়ে পরলেন, গায়ে চাপালেন শার্ট, আর কাঁধে ঝোলালেন তোয়ালে।

চেয়ারে বসে খাটে দু-পা তুলে দিয়ে বললেন, 'আঃ!'

এরকম দরাজ-দিল লোক আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি।'

ওয়েটার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে যখন বলে, এটা আনবো কি, সেটা আনবো কি, তিনি মাথা দুলিয়ে বলেন, 'ইয়েস, ইয়েস, ব্রিং, ব্রিং।'

বড় হোটেল। সেখানে 'আ লা কার্তে' অন্তত একশ' পদ রান্না হয়, তিনশ' রকমের মদ মজুদ আছে। আমি বাধা দিতে গেলে তিনি বলেন, 'কি জ্বালাতন, ভালো করে খেতে দেবে না কি?'

অথচ তিনি খেলেন, আলু-কপি-মটর-সেদ্ধ, রুটি-মাখন, স্যালাড্ আর চা। বললেন, 'বুড়ো বয়সে আর মাছ-মাংসটা ধরে কি হবে?'

তবে তিনি নিশ্চয়ই এই প্রথম ইয়োরোপ এসেছেন। যে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বৃদ্ধবয়সে অন্যকে মাংস খাওয়ায় সে যৌবনে এলে নিজেও চেখে নিত।

ক্রমে ক্রমে পরিচয় হল। আই সি এস থেকে পেন্সন নিয়েছেন। ওদিকে শাস্ত্রী ঘরের ছেলে—বিস্তর সংস্কৃত সুভাষিত মুখস্থ। একটানা নানা রকমের গল্প বলে যেতে লাগলেন—প্রধানত শঙ্কর রামানুজের জীবনের চুটকিলা ঘটনা নিয়ে। ইংরেজিতে যাকে বলে, 'লাইটার সাইড'। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনে যেতে লাগলুম।

তবে কি রাতের অন্ধকার যেমন যেমন ঘনাতে লাগে, মানুষের মনের অন্ধকার ঘর তার দরজা আসতে আস্তে খুলে দেয়? আমরা আহারাদির পর বেলকনিতে ডেকচেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়েছি, চোখ আকাশের দিকে। চতুর্দিকের ফ্লাটের

আলো আর রাস্তার বাতি নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের তারা জ্বল-জ্বল করে ফুটে উঠছে। চেনা ঘরদোরের তুলনায় মানুষ তেমন কিছু ক্ষুদ্র জীব নয়, কিন্তু বিরাট গম্ভীর আকাশের মূর্তি যখন তারায় তারায় ফুটে ওঠে, তখন তার ক্ষুদ্র হৃদয় আর তার ক্ষুদ্রতর লৌকিকতা, সংকীর্ণতা কেমন যেন আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে যায়।

কোনো ভূমিকা না দিয়ে বৃদ্ধ হঠাৎ বললেন, 'যার সঙ্গে আলাপচারি হয়; সে-ই ভাবে, এ-বুড়ো ইয়োরোপে এসেছে কি করতে? কি যে বলব, ভেবে পাই নে।'

এ তো তিনি আমাকে বলেছেন না, আপন মনে ভাবছেন এবং হয়ত তাঁর অজানাতেই গলা দিয়ে সে ভাবনা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। আমি যে শুধু চুপ করলুম, তাই নয়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও প্রায় বন্ধ করে আনলুম, যাতে তার চিন্তাধারা কোনো প্রকারের টক্কর না খায়।

না, ভুল বুঝেছি। তিনি আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

বললেন, 'দেশের অনেকেই জানে, কিন্তু কেউ আমাকে কখনো জিজ্ঞেস করে নি। এদেশে জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দিই নে। কিন্তু তোমাকে বলি। এতে অসাধারণ কিংবা কেলেঙ্কারির কিছুই নেই—থাকলে মানুষ চুপ করে থাকে না, সব সময়েই ফলিয়ে বর্ণনা করে আপন সাফাই গায়।

'আমি বড় সুখী ছিলুম। স্ত্রী, দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। দুটি ছেলেই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে এম. এ.-তে, সংস্কৃতে আর ইকনমিক্সে। মেয়েটির বিয়ে ঠিক —জামাইয়ের চেহারা কন্দর্পের মত।

'চাকরি জীবনে মাদুরা, কাঞ্চী, তাঞ্জোর বহু জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু পৈতৃক ভদ্রাসনে যাবার কখনো সুযোগ হয় নি; আমিও গ্রাম ছেড়েছি, ষোল বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পরেই।

'হঠাৎ গৃহিণী চেপে ধরলেন—আমি তখন সবেমাত্র পেন্সন নিয়েছি—তিনি তাঁর শ্বশুরের ভিটে দেখতে যাবেন। ছেলেরাও বলে যাবে, মেয়েটার তো কথাই নেই। আমি অনেক করে বোঝালুম, সেখানে এটা নেই, ওটা নেই, সেটা নেই, সাপ আছে, খবরের কাগজ নেই, মশা আছে, পাইখানার ব্যবস্থা নেই, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, তারা যাবেই যাবে। আমারও যে সামান্য দুর্বলতা হয় নি, সে কথা হলফ করে বলতে পারব না।

'বিশ্বেস করবে না, বাবা, তারা গ্রাম দেখে মুগ্ধ। আমি তো ট্রেনে পই পই করে গ্রামটাকে যতদূর সম্ভব কালো করে এঁকেছিলুম, তাদের শক্‌টা যেন বড্ড বেশি কঠোর কঠিন না হয়। তারা গাইলে উল্টো গান। ইঁদারা থেকে জল তুললো হৈ-হৈ করে—মাদ্রাজে কলের জল বন্ধ হলে এরাই 'দি হিন্দু' কাগজে কড়া কড়া চিঠি লিখত—, মেয়েটা দেখি, ছোট ছোট ইঁট নিয়ে বাস্তু-ভিটের গর্তগুলো বন্ধ করছে, গৃহিণী শুকনো তুলসীতলায় অনবরত জল ঢালছেন।

'বড় আরাম পেলুম। গৃহিণীর কথা বাদ দাও, তিনি সতী-সাধ্বী, কিন্তু

আমার 'মর্ডান' ছেলেমেয়েরাও যে আমার চতুর্দশ পুরুষের ভিটেকে তাচ্ছিল্য করল না, তাই দেখে আমার চোখে জল ভরে এল।

'আমার ছেলেবেলায় যারাই গ্রাম থেকে চলে যেত, তারা আর ফিরে আসত না। আমার বাবা তাই আমাকে কতবার বলেছেন, তার ঠিক নেই, 'বেণু-গোপলা, দেশের ভিটেমাটি অবহেলা করিস নি, আর যা কর কর!"

'চাকরির ধান্দায় আমি তাঁর সে আদেশ পালন করতে পারি নি। এখন দেখি, আমার ছেলেমেয়েরা তাঁর সে আদেশ পালন করছে। বসে বসে প্ল্যান কষছে, কোথায় রজনীগন্ধা ফেটাবে, কোথায় পাঁচিল তুলবে, কোথায় নাইট স্কুল খুলবে। আমার গৃহিণী সার্থক গর্ভধারিণী।'

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন। আমি আরো বেশি চুপ। বললেন, 'এর পর আর বলার কিছু নেই, তাই সংক্ষেপে বলি। মাত্র দুদিন কেটেছে; তিন দিনের দিন সকাল বেলা মেয়েটার কলেরা হল, ঘণ্টাখানেকের ভিতরে ছেলে দুটোরো। লোক ছুটিয়ে মাদ্রাজে তার করলুম। আরো লোক ছুটলো এখানে-সেখানে ডাক্তার-বদ্যির সন্ধানে। দশ ঘণ্টার ভিতরে তিনজনই চলে গেল। গৃহিণীর চোখের সামনে।

'তিনি গেলেন তার পরদিন। কলেরায় না অন্য কিছুতে বলতে পারি নে। আমি তখন সম্বিতে ছিলুম না।'

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, 'থাক, আর না।'

আমার আপত্তি যেন শুনতে পান নি। বললেন, 'মাদ্রাজে ফিরে আসার কয়েকদিন পরে আমার ব্যাংকার আমার স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা কইতে চাইলে—সে জানতো আমাদের টাকা-পয়সার বিষয় আমি কিছুই জানি নে। তার কাছ থেকে শুনলুম, গৃহিণী ভালো ভালো শেয়ার কিনে লাখ তিনেকের মত জমিয়েছিলেন।

'তাই বেরিয়ে পড়েছি। টমাস কুক যেখানে নিয়ে যায়, সেখানেই যাই।

'ওদের ছবি দেখবে? চলো, ঘরের ভিতর যাই।'

মনোজ বসুর ভাষায় জাহাজে বসে 'কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে' চলে গিয়েছিলুম, হঠাৎ হুশ হল আমি পদ্মায় নই, প্রাগে নই আমি বসে আছি জিনীভা লেকের জাহাজে।

জাহাজে অর্কেস্ট্রা গানের পর গান বাজিয়ে যাচ্ছে আর ডেকের মাঝখানে বিস্তর লোক টাঙ্গো, ওয়াল্‌ট্‌স্‌, ফক্স ট্রট নাচছে। আর সে কত জাতবেজাতের লোক—, বড় বড় চেক কাটা কোট-পাতলুন-পরা মার্কিন (আমাদের মারোয়াড়ী ভাইয়ারা যে রকম 'বড়া বড়া বুট্টাদার' নক্সা পছন্দ করেন) নিখুঁৎ, নিপুণ, লিপস্টিক-রুজ-মাখা তন্বঙ্গী ফরাসিনী, গাদা-গোদা হাব্দা-হোব্দা জর্মন আর ডাচ্‌, গায়ে কালো নেট্‌ আর লেসের ওড়না জড়ানো বিদ্যুৎনয়নী হিস্পানী রমণী, আপন হাব্বাইয়ের দম্ভে-ভরা একটুখানি আলগোছে-থাকা ইংরেজ আর তাদের উঁচু-নীচুর-টক্করহীন হকির বাঘিনী, টেনিস—পাগলিনী স্পোর্টস রমণী।

এই হরতেন রুইতেন সায়েব বিবির তাসের দেশে নিরীহ ভারতসন্তান কল্কে পাবে কি ?

তা পায়—আকসারই পায়।

তার প্রধান কারণ, আর পাঁচটা ইয়োরোপীয় এবং মার্কিন জাত সুইটজারল্যাণ্ডে এসেছে ফুর্তি করতে, এদেশের মেয়েদের সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে। তার কলকৌশল—নাচের ভিতর দিয়ে, ভাষার অজ্ঞতার ভান করে, দামী দামী মদ খাইয়ে—এরা বিলক্ষণ জানে এবং কাজে খাটাতে কিছুমাত্র কসুর করে না। এদের সম্বন্ধে তাই সুইস বাপ, ভাই, মা দিদি এমন কি মেয়েরাও একটুখানি সাবধান।

ভারতীয় মাত্রই যে এদের তুলনায় 'ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির' এ-কথা আমি বলব না। কিন্তু ইয়োরোপ বাসের প্রথম অবস্থায় ভারতীর মদ খেত কিংবা খাওয়াতে জানে না, নাচতে পারে না এবং সবচেয়ে বড় কথা তার ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে সে কণামাত্র তালিম পায় নি বিদেশিনীর সঙ্গে কি করে দোস্তী-ইয়ার্কি জমাতে হয়।

আমি 'ৎসুরিশ সংবাদ' পড়ছিলুম। পড়া শেষ হতে কাগজখানা টেবিলের উপর রাখামাত্রই আমার পাশের টেবিলের এক ছোকরা এসে আমাকে 'বাও' করে বললে, 'আমার "বাজেল সংবাদে"র বদলে আপনার 'ৎসুরিশ সংবাদ'খানা এক মিনিটের জন্য পেতে পারি কি ?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।'—এ ছাড়া আপনি আর কি বলবেন ?

কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল আলাপ জমাবার জন্য সরকারী রাস্তা ধরেই সে যাত্রা শুরু করেছে। কারণ এতক্ষণ ধরে সে তার সঙ্গের দু'টি মেয়ের সঙ্গেই গল্পগুজব বা নাচ-গান করছিল—কাগজ পড়ার ফুর্সৎ কই ?

তবু কাগজখানা যখন নিয়ে গিয়েছে তখন দু' মিনিট পড়ার ভান করতে হয়। তাই করল। ফেরৎ দেবার সময় ধন্যবাদ জানিয়ে হেসে বলল, 'আজকাল কিস্সু নূতন খবর মেলে না।'

আমি বললুম, 'একদম না ; সব যেন দড়কচ্চা মেরে গিয়েছে।'

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললো, 'যা বলেছেন।'

এরপর আপনাকে অবশ্যই বলতে হয়, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ; বসুন।'

কিন্তু কিন্তু করে বসবে, তারপর আরো দু' মিনিট না যেতেই বলবে, 'তার চেয়ে চলুন না আমাদের টেবিলে। আমার সঙ্গে দু'টি বান্ধবী রয়েছেন। তাঁরা বড্ড একলা পড়ে গেলেন।'

আপনি বলবেন, 'রাম রাম ! বড্ড ভুল হয়ে গেল আপনাকে ঠেকিয়ে রেখে।'

'ছোকরা বলবে, 'সে কি কথা, সে কি কথা !'

এই হল প্রধান সরকারী পন্থা, আলাপ-পরিচয় করার—অবশ্য আরো বহু গলিঘুঁচিও আছে।

বড়টির নাম গ্রেটে, ছোটটি ট্রুডে। ছেলেটার নাম পিট্। পিট্ বলবে, 'কিছু একটা পান করুন।'

আমি বললুম, 'এইমাত্র কফি খেয়েছি ; এখন আর থাক—অনেক ধন্যবাদ।'

এইবারে যে আলাপচারি আরম্ভ হবে তার চৌহদ্দি বাতানো সরল কর্ম নয়। সাধু-সন্ন্যাসীরা সত্যি পেরেকের বিছানায় দিনের পর দিন কাটাতে পারেন কিনা, গোখরোর বিষ ওঝা নামাতে পারে কিনা, কিংবা যোগাভ্যাস করে মাটি থেকে তিন ইঞ্চি উঠে যেতে কাউকে কখনো আমি দেখেছি কিনা?

ছেলেটা যদি দর্শনের ছাত্র হয় তবে হয়ত ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসবে, মেয়েটির যদি বাজনায় শখ থাকে তবে আপনাকে শুধিয়ে বসবে, ভারতীয় সঙ্গীতে ক'রকমের তাল হয়।

এসব তাবৎ প্রশ্নের সদুত্তর কে দেবে? ব্রজেন শীল, সুনীতি চাটুয্যে, বিশ্বকোষ, সুকুমার রায়ের 'নোটবুক', গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা সব মিলিয়ে ককটেল্ বানালেও ঐ প্রশ্নমরু তাকে বেমালুম শুষে নেবে।

বিদেশী একথা বোঝে না যে, তার ঠিক যে জিনিসে কৌতূহল আপনার তাতে মহব্বৎ নাও থাকতে পারে। তার উপরে আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, আমরা ইস্কুল-কলেজে যে তালিম পাই তাতে ক্রুসেডের তারিখ মুখস্থ করানো হয়—অজন্তা, ধ্রুপদ শেখানো হয় না।

তবে অতি অবশ্য স্বীকার করবো, একটি প্রাতঃস্মরণীয় প্রতিষ্ঠান আমি চিনি যিনি এসব প্রশ্নের উত্তম উত্তম উত্তর দিতে পারেন।

হেদোর ওতর-পূব কোণের 'বসন্ত রেস্টুরেন্ট'। সেখানে আমরা সুবো-শাম রাজা-উজীর কতল করি, হেন সমস্যা, হেন বখেড়া নেই যার ফৈসালা আমরা পত্রপাঠ করে দিতে পারি নে।

'বসন্ত রেস্টুরেন্টে'র আমি আদি ও অকৃত্রিম সভ্য। তস্য প্রসাদাৎ আমি হরমুল্লুকে হর-সওয়ালের জবাব দিতে পারি।

বিদেশীদের সম্বন্ধে ভারতীয়ের কৌতূহল কম। কলকাতায় বিস্তর চীনা থাকে; আমি আজ পর্যন্ত একজন বাঙালীকেও দেখি নি, যিনি উৎসাহী হয়ে চীনাদের সঙ্গে আলাপচারি করেছেন। মাত্র একটি বাঙালী চিনি, যিনি ছেলে-বেলা থেকে কাবুলীওয়ালাদের সঙ্গে ভাব করে দোস্তী জমিয়েছিলেন—কাবুলীরা এখন এদেশে দুর্লভ হয়ে যাওয়াতে তাঁর আর শোকের অন্ত নেই।

ইয়োরোপীয়রা সংস্কৃত যে রকম পড়ে, আরবী চীনা ভাষারও তেমনি চর্চা করে। তাই আমার মনে সব সময়েই আশ্চর্য বোধ হয়েছে যে, ভারতীয় সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল সবচেয়ে বেশি কেন?

পিটুকে জিজ্ঞেস করাতে সে বললে, 'পণ্ডিতেরা কেন ভারতপ্রেমী হন, সে কথা আমরা বলতে পারবো না, তবে আমার মত পাঁচজন সাধারণ লোকের কথা কিছু বলতে পারি।

'প্রাচ্যের তিন ভূখণ্ডের সঙ্গে আমাদের কিছুটা পরিচয় আছে। ভারত, আরবভূমি আর চীন। তুর্কদেরও আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, কিন্তু তারা অনেকখানি ইয়োরোপীয় হয়ে গিয়েছে, আর তিব্বত সম্বন্ধে কৌতূহল পুষে আর লাভ কি? তিব্বতীরা তো এদেশে আসে না।

'আরবরা সেমিটি, চীনারা মঙ্গোলীয়। এদের ধরনধারণ এত বেশি আলাদা

যে, এরা যেন অন্য লোকের প্রাণী বলে মনে হয়। অথচ ভারতীয়রা আর্য—তাই তারা চেনা হয়েও অচেনা। এই ধরুন না, যখন চীনা বা আরব ফরাসী-জর্মন বলে, তখন কেমন যেন মনে হয় ভিন্ন যন্ত্র বাজছে। অথচ ভারতীয়রা যখন ঐ ভাষাগুলোই বলে তখন মনে হয় একই যন্ত্র বাজছে, শুধু ঠিকমত বাঁধা হয় নি।

'আরেকটা কারণ বোধ হয় খ্রীষ্টের পরই—সময়ের দিক দিয়ে নয়, মাহাত্ম্যে—মহাপুরুষ বলতে আমরা বুদ্ধদেবের কথাই ভাবি। এখন অবশ্য অনেকখানি মন্দা পড়েছে, কিন্তু এককালে এখানে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে প্রচুর বই বেরিয়েছিল। তার কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক ভগবানে বিশ্বাস হারায়, অথচ একথা জানত না যে, ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও শুধু যে ধার্মিক জীবনযাপন করা যায় তাই নয়, ধর্মপত্তন করা চলে। তাই যখন বুদ্ধের বাণী এদেশে প্রথম প্রথম প্রচার হল, তখন বহু লোক সে বাণীতে যেন হারানো-মাণিক ফিরে পেল। কেউ কেউ তো আদমশুমারীর সময় নিজেদের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলে জাহির করল।

'এযুগে গাঁধী পরম বিস্ময়ের বস্তু। অস্ত্রধারণ না করে বিদেশী ডাকুকে তাড়ানো যায় কিনা জানি নে। কিন্তু গাঁধীর প্রচেষ্টাটাই বিশ্বজগৎকে একদম আহাম্মুখ বানিয়ে দিয়েছে। আমি অনেক ধার্মিক ক্রীশ্চানকে চিনি, যাঁরা গাঁধীর নাম শুনলেই ভক্তিতে গদগদ হন। একজন তো বলেন, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন খ্রীষ্ট এবং মাত্র একটি লোক সে ধর্ম স্বীকার করেছেন, তিনি গাঁধী।'

ট্রুডে বললে, 'টেগোরের নাম করলে না?'

'পিট্ বললে, 'টেগোরকে চেনে এদেশের শিক্ষিত লোক। তার কারণও রয়েছে। এযুগে সাধারণ লোক পড়ে প্রধানত খবরের কাগজ। খবরের কাগজে গাঁধীর কথা দুদিন অন্তর অন্তর বেরয়, কিন্তু টেগোরের কথা বেরয় তিনি যখন এদেশে আসেন।'

ট্রুডে বললে, 'আর বুদ্ধদেবের কথা বুঝি খবরের কাগজে নিত্যি নিত্যি বেরয়, না তিনি প্রতি বৎসর এখানে স্কেট করতে আসেন?'

গ্রেটে বললে, 'ছিঃ, বুদ্ধদেবকে নিয়ে ওরকম হাল্কা কথা কইলে বুদ্ধদেবের দেশের লোক হয়ত ক্ষুণ্ণ হবেন।'

আমি বললুম, 'আদপেই না। আমাদের দেশে দেবতাদের নিয়ে মজার মজার গল্প আছে।'

পিট্ বললে, 'বুদ্ধদেব যে একশ' বছরের স্টার্ট পেয়ে বসে আছেন।'

ট্রুডে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনাদের ঠাকুর-দেবতাদের নিয়ে যে সব মজার গল্প আছে, তারই একটা বলুন না।'

আমি শিব বেজায়গায় একবার বর দিয়ে যে কি বিপদে পড়েছিলেন, আর শেষটায় বিচক্ষণ নারদ তাঁকে কি কৌশলে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, সেই গল্পটি বললুম।

তিনজনেই হেসে কুটিকুটি।

ট্রুডে জিজ্ঞেস করলে, 'শিব কি ডাক্তর দেবতা?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়। তবে কি না তিনি শ্মশানে থাকেন, ভূতের নৃত্য দেখেন, কাপড়চোপড়ও সব সময় ঠিক থাকে না। দেবতাদের পার্লিমেণ্টে সচরাচর যান না।'

সবাই অবাক হয়ে শুধায়, 'তবে তিনি ডাঙর হলেন কি করে?'

এখানেই আমি হামেশাই একটু বিপদে পড়ে যাই। নীলকণ্ঠের বৈরাগ্য যে এদেশের ঘোর সংসারী মনকেও মাঝে মাঝে ব্যাকুল করে তোলে, সেটা ইয়োরোপীয়রা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। 'আরো চাই', আরো চাই'য়ের দেশে 'কিছু না', 'কিছু না'র তত্ত্ব বোঝাই কি প্রকারে? আমি যে বুঝেছি তা-ও নয়।

তবে ইয়োরোপের সর্বত্রই মেয়েরা হরপার্বতীর বিয়ের বর্ণনা শুনতে বড় ভালোবাসে। বিশেষ করে যখন বরযাত্রায় বলদের পিঠে শিবকে দেখে মেনকা চিৎকার করে তাঁকে খেদিয়ে দেবার জন্যে আদেশ দিলেন, আর যখন শুনলেন তিনিই বর এবং ভিরমি গেলেন—তখন মেয়েরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

আমি তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে উত্তেজনাটা বাড়ানোর জন্য ধীরে ধীরে একটি সিগ্‌রেট ধরাই।

'তারপর, তারপর?' সবাই চেঁচায়।

জানি অসম্ভব। তবু তখন এ-ক'টি ছত্র অনুবাদ করার চেষ্টা করি।

ভৈরব সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত আঁখি
দেখে, তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রীহয়াছে ঢাকি
প্রাতঃসূর্য রুচি।
অস্থিমালা গেছে খুলে মাধবীবল্লরী মূলে
ভালে মাখা পুষ্পরেণু—চিতাভস্ম কোথা
গেছে মুছি।
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি-পানে—
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনি গানে
কবির পরাণে॥

* * *

এ দৃশ্য আমি একমাত্র সুইটজারল্যাণ্ডেই দেখেছি।

পশ্চিমের সূর্য হেলে পড়েছে আর তার লাল আলো এসে পড়েছে পাহাড়ের গায়ের বাড়িগুলোর হাজার হাজার কাচের সার্শীতে। সার্শীগুলো লালে লাল হয়ে গিয়ে একাকার—মনে হয় বাড়িগুলো বুঝি মিনিটখানেকের ভিতরই পুড়ে খাক হয়ে যাবে। আগুনের জিভের মত লালের আঁচ উঠেছে, আকাশের দিকে, আর তারই রঙ গিয়ে লেগেছে দূর পাহাড়ের চূড়োয় সাদা বরফে। সেখানেও লেগে গেছে দাউ দাউ করে আগুন। পাহাড়ের কোলে বসা মেঘগুলোও সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে যাচ্ছে; ওদিকে আকাশের এখানে ওখানে যে সব মেঘের টুকরো সমস্ত দিন সাদা ভেড়ার মত আকাশের নীল মাঠে শুয়ে ছিল তারা দেখি পূর্ব-পশ্চিমের আগুনে তেতে গিয়ে গোলাপী হয়ে উঠেছে। সেই লাল

রঙের আওতায় পড়ে নীল পাহাড় আর হ্রদের নীল জল ঘন বেগুনী রঙ মেখে নিয়েছে।

চতুর্দিকে হুলস্থুল কাণ্ড ; কিন্তু নিঃশব্দে। মেঘেমেঘে, আকাশে-আকাশে পাহাড়পর্বতে, ঘরবাড়িতে এমন কি জলেবাতাসে এই যে বিরাট অগ্নিকাণ্ডটা হয়ে যাচ্ছে তাকে নেভাবার জন্য চেঁচামেচি-চিৎকার হচ্ছে না, আগুনের তাপে কাঠ-বাঁশ ফেটে যাওয়ার ফট্-ফাট্ দু-দ্দড়াম্ শব্দ হচ্ছে না, ঐ যে লেকের পাড়ে সোনালী বেঞ্চিতে বসে আছে মেয়েটি তার সাদা ফ্রকে আগুন লেগেছে, সেও তো চিৎকার করে কেঁদে উঠছে না। এ কী কাণ্ড!

এ আগুনের কি জ্বালা নেই, না, এদেশের জনমানব-পশুপক্ষীকে কোনো এক ভানুমতী ইন্দ্রজাল দিয়ে অসাড়-অচেতন করে দিয়েছেন? হাঁ, এ তো ইন্দ্রজালই বটে। এতখানি আগুন, লক্ষ লক্ষ কলসী থেকে উজাড় করে ঢেলে দেওয়া এতখানি গলানো সোনা, হাজার হাজার মণ গোলাপী পাপড়ির লোধ্র-রেণু, না জানি কত শত জ্বালা আবির-গুলাল এরকম অকৃপণ হাতে ঢেলে দিলে, ছড়িয়ে ফেললে স্বর্গপুরীকেও লাল বাতি জ্বালাতে হবে—হয়ত এই আগুন থেকেই পিদিম ধরিয়ে নিয়ে।

এ তো কনে-দেখার আলো নয় ; এ তো সতীদাহের বহ্নিকুণ্ড।

গ্রেটে আর ট্রুডের ব্লণ্ড্, চুল অদৃশ্য হেয়ার-ড্রেসারের হাতে সোনালি হয়ে গেল। পিট্ কথা বলবার সময় ঘন ঘন হাত নাড়ে ; মনে হচ্ছে যেন সোনালি জলে হাত দুখানি সাঁতার কাটছে।

সূর্য পাহাড়ের পিছনে অতি ধীরে ধীরে অস্তাচলে নেমে গিয়েছেন। আবার সেই ভানুমতী এসেছে। অদৃশ্যে তিনি ঘন ঘন এখানে ওখানে উড়ে গিয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে মেঘের গা থেকে আবির তুলে নিয়ে কাজল মাখিয়ে দিচ্ছেন, ফুঁ দিয়ে এক এক সার সাশী থেকে আগুন নিবিয়ে দিচ্ছেন, কখনো বা দেখি লেকের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি জলের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন—যেন গোবর দিয়ে আঙ্গিনা লেপে দেওয়া হল।

এ দৃশ্য সুইটজারল্যাণ্ডেও নিত্য নিত্য ঘটে না। জাহাজের ব্যাণ্ড তাই দুই নাচের মাঝখানে এখন অনেকখানি সময় নিচ্ছে। জাহাজের বহু নরনারী স্তব্ধ হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। এরকম সূর্যাস্ত কমই হয় যেখানে তুমি আমিও হিস্যেদার—স্পষ্ট দেখলুম তোমার কাপড়ের আগুন লেগে গিয়েছিল আমার কাপড়েও। আপন অজানাতে আমাদের দেহ, আমাদের বেশভূষা এ রসের সায়রে ছোট ছোট দ' সৃষ্টি করে তুলেছে।

ট্রুডে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দেশে এরকম সূর্যাস্ত হয়?'

আমি বললুম, 'কাশ্মীরে হয় ; সেখানে বরফ আছে, পাহাড় আছে, লেক আছে। কিন্তু হাজার হাজার চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে জানলার সাশী নেই বলে হয়ত এতখানি আগুন ধরে না। তবে যদি হিমালয়কে ভারত বলে গোনা হয় তবে নিশ্চয়ই এর চেয়েও বেশী আগুন-জ্বালা সূর্যাস্ত সেখানে হয়—সুইস পর্যটক-দেরই লেখাতে পড়েছি।'

ভানুমতী দিকে দিকে কাজলধারা বইয়ে দিয়েছে। চতুর্দিক অন্ধকার।

শুধু ফুটে উঠেছে অন্ধকার ঘাসের উপর লক্ষ লক্ষ বিজলি-বাতির ফুল। আকাশের ফরাশেও দেবতারা জ্বালিয়ে দিয়েছেন অগুণতি তারার মোমবাতি। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, পাহাড়ের উপরের দিকে যে আলোগুলো জ্বলছে সেগুলো মানুষের প্রদীপ না দেবতার তারা। মানুষ স্বর্গের দিকে ধাওয়া করে উঠেছে পাহাড়ে, আর দেবতারা নেমে এসেছেন পৃথিবীর দিকে ঐ পাহাড়ের চূড়ো পর্যন্ত —একে অন্যকে অন্ধকারের এপার ওপার থেকে সাঁঝের পিদিম দেখাবার জন্য।

"মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলো দেখবে ব'লে।
সেই আলোটি নিমেষহত প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মত দোলে ॥
সেই আলোটি নেবে জ্বলে শ্যামল ধারার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায় ব্যাথায় কাঁপে পলে পলে।
নামল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হতে আশিস আনি,
অমরশিখা আকুল হল মর্তশিখায় উঠতে জ্বলে ॥"

পিটু বললে, 'একটি প্রেমের গল্প বলুন।'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষে সত্যকার প্রেমের গল্প আছে একটি, যার সঙ্গে অন্য কোনো দেশের গল্প পাল্লা দিতে পারে না। সে কাহিনীতে মাটির মানুষ তার আপন বিরহবেদনার বর্ণনা শুনতে পায়, আবার ভগবদপ্রেমের জন্য ব্যাকুল জনও সেই কাহিনীতে আপন আকুলি-বিকুলির নিবিড়তম বর্ণনাও শুনতে পায়। কিন্তু রাধামাধবের সে কাহিনী বলবার মত ভাষা আমার নেই।'

ট্রুডে বললে, আমি একখানি ছবি দেখেছি, তাতে রাধা কৃষ্ণের গায়ে পিচকারি দিয়ে লাল রং মারছেন। চরৎকার ছবি!'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমি পিটুকে বললুম, 'তার চেয়ে বরঞ্চ আপনি আপনার প্রেমের কাহিনী বলুন না?'

পিটু তো বেশ খানিকটা ঠা ঠা করে হাসল—দু পাত্রের পর মানুষ অল্পেতেই হাসে কাঁদে—তারপর বললে, 'হারগট্ হ্যারগট্ (রামচন্দর!) এ যুগে কি আর সে রকম প্রেম কারো জীবনে আসে যা নিয়ে রসিয়ে গল্প জমানো যায়?'

ট্রুডে বললে, 'বলেই ফেল না ছাই তোমার সাদা-মাটা গল্পটা।'

গ্রেটে দেখি চুপ করে আছে।

পিটু বললে, 'আমার প্রেমে পড়ার কাহিনীতে মাত্র সামান্য একটু বিশেষত্ব আছে। সেইটুকুই বুঝিয়ে বলি।

' আমি তখন সবে কলেজে ঢুকেছি। ফার্স্ট পিরিয়েডে ক্লাস থাকত না বলে আমি বাড়ি থেকে বেরতুম ন'টার সময়। একদিন ন'টার কয়েক মিনিট পরে কলেজের কাছেই একটি মেয়ে আমার পাশ দিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল। হাবভাব দেখে মনে হল কলেজেরই ছাত্রী কিন্তু আসল কথা সেইটে নয়—আসল কথা হচ্ছে ওরকম সুন্দরী আমি আর কখনো দেখি নি।

'আমার বুকের রক্ত দুম্ করে জমে গেল ; আমার হার্টটা যেন লাফ দিয়ে গলার কাছে পেঁাছে গেল। আমি অনেকক্ষণ সেই রাস্তার উপর ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম। সেদিন আর ক্লাস করা হল না ; কলেজের বাগানে বসে বসে সমস্ত সকালটা কাটল।

'পরদিন ঠিক ঐ সময়ই মেয়েটি আমাকে রাস্তায় ক্রস্ করল। এবারে দুজনাতে চোখাচোখি হল—এক ঝলকের তরে। তারই ফলে আমাকে রাস্তার পাশের রেলিঙ ধরে সে নজরের ধাক্কা সামলাতে হল।

'তারপর রোজই ঐ সময় রাস্তায় দেখা হয়, এক লহমার চোখাচোখি হয়। বুঝলুম মেয়েটির সেকেন্ড পিরিয়েড ফ্রী তাই বোধ হয় বাড়ি কিংবা অন্য কোথাও যায়।

'আগেই বলেছি, মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। রোজ সকালে নটার পর তার সেই এক ঝলকের তরে আমার দিকে তাকিয়ে দেখা যেন আমার গলায় এক পাত্র সোনালি মদ ঢেলে দিত আর বাদবাকী দিন আমার কাছে আসমানজমীন গোলাপী রঙে রাঙা বলে মনে হত।

'করে করে তিন মাস কাটল।'

পিট্ মদের গেলাসে মুখ ঠেকাতে আমি শুধালুম, 'পরিচয় করবার সুযোগ হল না, তিন মাসের ভিতর ? কলেজ ডান্সে, কলেজ রেস্তোরাঁ—কোথাও ?'

পিট্ বলল, 'ভয়, ভয়, ভয়। আমার মনে হত এরকম সুন্দরী কখনোই, কোন অবস্থাতেই আমার মত সাদা-মাটাকে ভালোবাসবে না, বাসতে পারে না, অসম্ভব, অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশ্বাস করবেন না, পাছে আলাপচারি হয়ে যায় আর সে আমায় অবহেলা করে সেই ভয়ে কোনো নাচের মজলিসে দেখা হলে আমি তৎক্ষণাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে সে স্থল পরিত্যাগ করতুম। তার চেয়ে পরিচয় না হওয়াটাই ঢের ঢের ভালো।'

আমি বললুম, 'টেগোরেরও গান আছে—

'সেই ভালো সেই ভালো আমারে না হয় না জানো
দূরে গিয়ে নয় দুঃখ দেবে কাছে কেন লাজে লাজানো ?'

পিট্ বলল, 'আশ্চর্য, টেগোর তো অতি সুপুরুষ ছিলেন। তিনি এরকম মর্মান্তিক অনুভূতিটা পেলেন কোথায় ?'

আমি শুধালুম, 'কিন্তু মেয়েটিও তো আপনার দিকে তাকাত !'

'ঠিক বলেছেন, কিন্তু আমার মনে হত মেয়েটি শুধু দেখতে চায়, এই বেশরম বাঁদরটা কত দিন ধরে এ তামাশা চালায়।'

আমি শুধালুম, 'তার পর ?'

'তিন মাস হয়ে গিয়েছে। আমি প্রেমের পাখায় ভর করে চন্দ্রসূর্য ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্রেমের এ পাখা দানা-পানি অর্থাৎ প্রতিদানের তোয়াক্কা করে না বলে এর কখনো ক্লান্তি হয় না ; এ প্রেম আমার মনের বাগানে ফোটা জুঁই,—কারো অবহেলা-অনাদরের খরতাপে এ ফুল কখনো শুকোবে না।

'কলেজের বাগানে বসে একদিন চোখ বন্ধ করে আমি আমার প্রিয়াকে দেখছি এমন সময় কাঁধে হাত পড়ল। চোখ মেলে দেখি আমার গ্রামের একটি পরিচিত ছেলে আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আমার স্বপ্নের ফুল। পালাবার পথ ছিল না, পরিচয় হয়ে গেল।'

'তারপর ?'

'আমার একদম মনে নেই। যেটুকু মনে আছে বলছি। হঠাৎ দেখি ছেলেটি উধাও, আর আমার স্বপ্ন তখনো মূর্তি ধরে পাশে বসে আছে। কিন্তু আসল কথায় ফিরে যাই। সেই যে ভয়ের কথা বলেছিলুম। প্রথম আলাপেই আমি যে তার সঙ্গে পরিচয় করতে ডরাই সে কথা কি জানি কি করে বেরিয়ে গেল। মেয়েটি অবাক হয়ে শুধাল, "কিসের ভয় ?" আমি বললুম, "আপনি বড় বেশী সুন্দর।" তখন যা শুনলুম সে আমি তখনো বিশ্বাস করি নি এখনো করি নে—তার বিশ্বাস, আমি একটা আস্ত এ্যাডনিস্ এবং তাই আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে সে ভয় পেয়েছিল। শুনুন কথা !'

আমি বললুম, 'আপনারা দুজনাই দেখতে চমৎকার কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা আছে এক ফার্সী প্রবাদে, "লায়লীরা বায়দ্ ব্ চশ্‌মে মজনুন দীদ !" লায়লীকে দেখতে হয় মজনুর চোখ দিয়ে।'

জাহাজ পাড়ে এসে ভিড়ল। সবাই নেমে পড়লুম। আবার দেখা হবে, বলে পিট্, গ্রেটে, ট্রুডে বিদায় নিল।

আপন মনে বাড়ির দিকে চলতে চলতে একটা কথা ভাবতে লাগলুম ; এই যে ইয়োরোপীরা প্রাণ খুলে ফূর্তি করে, হৈ-হল্লা করে, আমরা এ-রকম ধারা আপন দেশে করতে পারি নে কেন ? সায়েবসুবোদের লেখাতে পড়েছি, আমরা নাকি বড্ড সিরিয়স, সংসারকে আমরা নাকি মায়াময় অনিত্য ঠাউরে নিয়ে মুখ গুমসো করে বসে আছি, ফুর্তি-ফার্তি করার দিকে আমাদের আদপেই মন নেই।

'জাতক' তো খ্রীষ্টের বহু পূর্বে লেখা। তাতে যে হরেক রকম পাল্‌ব পরবের বর্ণনা পাই তার থেকে তো মনে হয় না, আমরা সে যুগে বড্ড রাশভারি মেজাজ নিয়ে আত্মচিন্তা আর তত্ত্বালাপে দিন কাটাতুম। স্পষ্ট মনে পড়ছে কোন এক পরবের দিনে এক নাগর তার প্রিয়ার মনস্তুষ্টির জন্য রাজবাগানে ফুল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে শূলের উপর প্রাণ দেয়। মরার সময় সে আক্ষেপ করেছিল, 'প্রিয়া, আমি যে মরছি তাতে আমার কোনো ক্ষোভ নেই, কিন্তু তুমি যে পরবের দিনে ফুল পরে যেতে পারলে না সে দুঃখ আমার মরার সময়ও রইল।'

আমাদের কাব্যনাটক রাজরাজড়াদের নিয়ে—সেখানে হদিস মেলে না আমাদের সাধারণ পাঁচজন আনন্দ উৎসব করত কি না এবং করলে কি ধরনে করত। শুধু 'মৃৎশকটিকা' আর 'মালতীমাধবে' সাধারণ লোকের সবিস্তর বর্ণনা রয়েছে এবং এ দুটি পড়ে তো মনে হয় না এ সময়ের সাধারণ পাঁচজন আজকের দিনের ইয়োরোপীয়দের তুলনায় কিছু কম আয়েস করত। 'মৃৎশকটিকা'য় রান্নাঘরের

যে বর্ণনা পাই তার তুলনায় সুইটজারল্যাণ্ডের যে-কোনো রেস্তরাঁ নস্যাৎ। আর 'মালতীমাধবে'র নাগর মাধববাবু তো জাহাজের পিট্ সাহেবকে প্রেমের লীলাখেলায় দু কলম তালিম দিতে পারে।

তবে কি নিতান্ত এ যুগে এসেই আমরা হঠাৎ বুড়িয়ে গিয়েছি? তাও তো নয়। হুতোমের কেতাবখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিন—বাবুরা তো কিছু মাত্র কম ঢলাঢলি করেন নি। তবে কি এই বিংশ শতকে এসে হঠাৎ আমাদের ভীমরতি ধরল? তাও তো নয়। ফুটবল খেলা দেখতে এক কলকাতা শহরই যা পয়সা উড়োয় তার অর্ধেক বোধ হয় তামাম সুইটজারল্যাণ্ডও করে না।

ফুটবল সিনেমা লোকে দেখুক—আমার আপত্তি আছে কি নেই সে প্রশ্ন উঠছে না। আমি শুধু ভাবি এসব আনন্দে উত্তেজনার ভাগটা এতই বেশী যে মানুষ যেন সেখানে স্থায়ী কোনো কিছু সন্ধান পায় না। আমার মনে হয়, স্টীমারে বা ট্রেনে, সত্যযুগে, যখন ভিড় বেশী হত না তখন ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করাতেও আনন্দ ছিল অনেক বেশী। বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে তবু এখনো মনে পড়ছে দু'একজন যথার্থ সুরসিককে। এঁরা কামরায় উঠেই পাঞ্জাবির বোতাম খুলে দিয়ে কোঁচা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে যা গল্প জুড়তেন তার আর তুলনা হয় না। আমরা গুটিকয়েক প্রাণী রোজই এক কামরায় উঠতুম আর এঁরা কামরাখানিকে গালগল্প দিয়ে প্রতিদিন রঙীন করে দিতেন। অসুখ করে আমাদের কেউ দু'দিন কামাই দিলে এঁরা রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, কোনো কৌশলে দুটো ডাব কিংবা চারটি ডালিম পাঠানো যায় কি না তার আন্দেশা করতেন কিন্তু যাক্, এ বাবতে 'রূপদর্শী' আমার চেয়ে ঢের বেশী ওকীব-হাল।

আমি ভাবছি, সেই সব আনন্দের কথা যেখানে অজানা জনকে চেনবার সুযোগ হয়। উদয়াস্ত তো আমরা বসে আছি সাংসারিকতার মুখোশ পরে। আপিসে যারা আমার কাছে আসে তারা আসে স্বার্থের খাতিরে, বাড়িতে যাঁরা আসেন তাঁরা বন্ধুজন, তাঁদের আমি চিনি, তাঁরা আমায় চেনেন কিন্তু নূতন পরিচয় হবে কি প্রকারে?

তাই ট্রেনের স্বল্পক্ষণের পরিচয় অনেক সময় গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ট্রেনে তুমি আমাকে চেন না, আমি তোমাকে চিনি নে। আলাপচারিটা কোনো স্বার্থের খাতিরে আরম্ভ হয় না বলে শেষ পর্যন্ত সে যে কত অন্তরঙ্গতায় দুজনকে নিয়ে যেতে পারবে তার কোনো স্থিরতা নেই।

অবশ্য এখন আমরা সব মেকি সায়েব হয়ে গিয়েছি। আগের আমলের মত কেউ যদি শুধান, 'বাবাজীর আসা হচ্ছে কোন্ থেকে' কিংবা 'বাবাজীরা—?' অর্থাৎ 'বাবাজী বামুন, কায়েত, না বদ্যি?' তাহলে আমরা বিরক্ত হই। কেন হই, তা এখনো আমি বুঝে উঠতে পারি নে।

ইংরেজ শুনেছি হয়। আমি বলতে পারব না। কারণ আমি পারতপক্ষে কোনো ইংরেজের সঙ্গে আলাপ জমাতে চাই নে। অবশ্য কোনো ইংরেজ আলাপ করতে চাইলে আমি খেঁকিয়ে উঠে তাকে স্নাবও করি নে। কিন্তু ফরাসী জর্মন সুইস অন্য ধরনের। তারা অনেক বেশী মিশুকে। কাফে বা মদের দোকানে

তারা যে রোজ সন্ধ্যায় আড্ডা জমায় সেখানে কোনো সদস্য যদি কোনো নূতন লোক নিয়ে উপস্থিত হয় তবে আর পাঁচজন আনন্দিত হয়। ইংরেজের ক্লাবে যদি কোনো সদস্য আপন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে তবে আর পাঁচজন তার দিকে আড়নয়নে তাকায়। কোনো কোনো ক্লাবে তো কড়া আইন, আপনি মাসে ক'দিন ক'জন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করতে পারেন।

জর্মন, ফরাসী, সুইসদের ভিন্ন রীতি। 'পাবে', কাফেতে ইয়ারদোস্ত যোগাড় করার পরও তাদের প্রাণ ভরে ওঠে না বলে তারা যায় ফুর্তির জাহাজ চড়তে। সেখানে কত দেশের কত লোকের সঙ্গে আলাপ হবে—

কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।